শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

[নবম ভাগ]

ঃ এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম ভাগ

(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

(৩) শ্রীম দর্শন (ইংরাজী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ —Entitled "M. The Apostle and the Evangelist"

সমস্ত গ্রন্থই পনের ভাগে সমাপ্ত

ক্রমশঃ বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে

ঃ এই সকল গ্রন্থে আছে ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতি—আধ্যাত্মিকতা—আত্ম-দর্শন, ঈশ্বর-দর্শন আর যোগ-সাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে—বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ—যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

প্রাপ্তিস্থান

1. Sri Ramakrishna Sri Ma Prakashan Trust (Sri Ma Trust)
   579, Sector 18B, Chandigarh.
2. M/s. General Printers & Publishers Private Ltd.
   119, Dharmatala Street, Calcutta-13
3. General Books
   A-66, College Street Market, Calcutta-12
4. Sri Ramakrishna Sri Ma Prakashan Trust
   4, Jadunath Sanyal Street, Lucknow (U.P.)
5. Sri Ramakrishna Sri Ma Prakashan Trust
   C/o. Srimati Vijaya Prabhakar, Soni House, Khaliar, Mandi (Himachal).
6. Mrs. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi-60.
7. Sri S. N. Sen,
   4C, Jawahar Nagar Kampoo, Laskar, Gwallior (M.P.)
8. Dr. Indra Sanghi
   400N, First Block
   Rajaji Nagar, Bangalore-10.

শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

নবম ভাগ
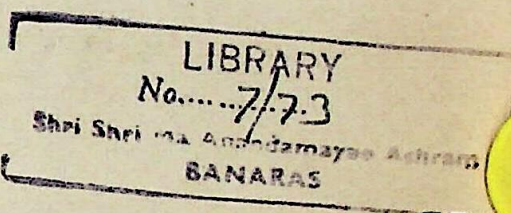
স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

পরিবেশক ঃ

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

———

কাঁচের ঘরে শ্রীম

ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই শ্রীমকে দেখিয়া চিনিয়াছিলেন, তিনি অবতার-লীলার একজন প্রধান সেবক। আর জগদম্বার আদেশে স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিবেন, সংসারতপ্ত লোকদিগকে 'ভাগবত' শুনাইবার জন্য। তাই দ্বিতীয় দর্শনে কি করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হয় তাহার শিক্ষা দিতেছেন।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রথম দর্শন হয়। দ্বিতীয় দর্শনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী-পুত্র, বাপ-মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে, যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়, তুমিও তাদের কেউ নও। ঈশ্বরই তাদের ও তোমার সত্যিকার আপনার।

বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু মন পড়ে আছে দেশে—নিজের বাড়ীতে যেখানে তার ছেলেপুলে থাকে।

কচ্ছপ জলে থাকে। কিন্তু তার মন পড়ে আছে কোথায় জান? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে।

ভক্তি লাভ করে সংসারে থাকবে। ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জনে সাধন চাই।

শ্রীগুরুদেবের এই আদেশ শ্রীম শিরোধার্য করিয়া সংসারে দাসীর মত থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ঠাকুরও সর্বদা তাঁহাকে সহায়তা করিতেছেন। কখনো নিজের কাছে রাখিয়া দিতেছেন। এবং সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভের পথে কি করিয়া অগ্রসর হইতে হয় তাহা শিখাইতেছেন। আর অভয় দিয়া সর্বদা বলিতেছেন, এখানে এলে-গেলেই হবে—ভক্তি লাভ হবে। ঈশ্বরে ভালবাসা হবে।

ঠাকুর নিজে জানেন, তিনি নিজে ঈশ্বর এবং ইহাও জানেন যে, তাঁহাকে ভালবাসিলেই ঈশ্বরকেই ভালবাসা হইল। আর ঈশ্বরকে ভালবাসার নামই ভক্তি।

শ্রীমর শিক্ষা চলিতে লাগিল। ঠাকুরের আদেশে শ্রীম দীর্ঘকাল স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। আর তাঁহারই আদেশে বাড়ীর বাহিরে মাঝে মাঝে থাকিতে লাগিলেন—কোন মেসে বা হোস্টেলে। আর নিজের দেহধারণের যাবতীয় কাজ নিজ হস্তে সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বাহিরে থাকিয়া জীবিকার্জনের জন্য হেড্‌মাস্টারের কাজ করিতেন। কখনো বা এক সঙ্গে তিনটা স্কুলের হেড্‌মাস্টার, এক এক ঘণ্টা করিয়া। কখনো সিটি রিপনাদি কলেজে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

বাহিরে থাকিয়া বাড়ীর সব কাজ করিয়া দিতেন। কিন্তু বাড়ীর সেবা লইতেন না। কেন? ঠাকুর যে তাঁহাকে দাসীর মত সংসারে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাই দাসীর মত থাকিবার এই চেষ্টা। অবসর সময়ে অবশ্য ঠাকুরের কাছে যাইতেন।

ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর কখনো তাঁহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কখনো দুই-তৃতীয়াংশ সাধু গুরুভাইগণ ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অসুখের সময়ও কাশীপুরে এইরূপ সাধ্যাতীত অথচ প্রীতিপূর্ণ অর্থ সাহায্য করিতেন।

কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল ততই তিনি উত্তমরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন ঠাকুরের মহাবাক্য—সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।

ঠাকুরের কাছে আসিবার পূর্বেই শ্রীম এই অগ্নিকুণ্ডে ঝলসিত হইয়াছেন। তাই জীবন-বিসর্জনের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে গিয়া লাভ হইল ঈশ্বর—সাক্ষাৎ নররূপধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে।

দিনে দিনে প্রাণে প্রাণে খুব ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলেন—সংসার সত্যই জ্বলন্ত অনল। তাই মনের কোণে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছারূপী বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। চোখের

সামনে দেখিতে লাগিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে দিয়া একটি সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গঠন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

রাখাল, যোগেন, তারক বিবাহিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। শ্রীমরও সঙ্কল্প হইল, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসারের এই জ্বালা হইতে—জলন্ত অনল হইতে, আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। তাই মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা প্রথমে ইঙ্গিতে, পরে প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ভাবিত হইলেন। কারণ জগদম্বার আদেশে অবতার-লীলার প্রচার ও প্রসারের জন্য শ্রীমকে সংসারে রাখার প্ল্যান ঠাকুরের।

বার বার সন্ন্যাসের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিলে তিনি বিরক্ত হইলেন। তাই একদিন সন্ধ্যার পর সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ঠাকুরের গৃহে একান্তে শ্রীমকে ধমক দিলেন। তখনো ঠাকুরের মন সম্পূর্ণ নিম্নে অবতরণ করে নাই। সেই অর্ধ-বাহ্যাবস্থায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কেউ মনে না করে, আমি কাজ না করলে জগদম্বার—অবতার-লীলার কার্য অসম্পূর্ণ থাকবে। তিনি খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন। গুরুর আজ্ঞায় সংসারেই থাকিতে লাগিলেন।

শ্রীমর এই ব্যাকুল প্রার্থনায় পাছে জগদম্বা তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হন, এইজন্য মায়ের কাছে ঠাকুর বলিলেন, মা এর সব ত্যাগ করিও না। এ সংসারে থেকেও তোমার কাজ করবে।

ঠাকুর মাকে বলিলেন, মা, তুমি মাঝে মাঝে একে দর্শন দিও। নইলে কি করে থাকবে এই দুঃখময় সংসারে? আর মায়ের পায়ে শ্রীমকে সমর্পণ করিয়া দিলেন একাধিকবার এই গানটি গাহিয়া—"ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার। তার তার, না তার তারিণী।"

শ্রীমকে মাঝে মাঝে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিবিধ সাধনের সহিত সংসারাশ্রমে থাকার শিক্ষাও দিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রি তিনটা, ঠাকুর বাবুরামাদিকে বলিতে লাগিলেন, উঠ্, হাতমুখ ধো, মায়ের নাম কর। শ্রীম এইকথা শুনিলেন। ঠাকুর শ্রীমকে

বলিলেন, দেখ দেখিন্, এটা আমার কি হলো! যারা আপনার—যেমন রামলালাদি, তারা হলো পর। আর যারা পর তারা হলো আপনার। এই দেখ না, বাবুরামকে বলছি, উঠ্, হাতমুখ ধো, মায়ের নাম কর।

শ্রীম ভক্তদের বলিতেন, এইটি আমাকে শোনাবার জন্য বললেন। দাসীবৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকার এইটি একটি জীবন্ত উদাহরণ। শ্রীমর জীবনে এই উপদেশটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

শ্রীম দিবানিশি সাধু ও ভক্তগণে পরিবৃত থাকিতেন, একান্তে বাড়ীর বাহিরে। কখনো মধ্যাহ্ন ভোজন বাড়ীতে গিয়া করিতেন।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পূর্বে শ্রীমকে পুনরায় সংসারী জ্ঞানীর লক্ষণ শুনাইতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, সংসারী জ্ঞানী কেমন জান? যেমন সার্সীর ঘরে একজন আছে। সে ভিতর বাহির দুই-ই দেখতে পায়।

শ্রীমর জীবনটি ছিল এইরূপ। তিনি কাঁচের ঘরে ছিলেন। সংসারের খুঁটিনাটি সব জ্ঞান তাঁহার ছিল। আবার পরমার্থ জ্ঞানেও তিনি বিশারদ।

তাঁহার উপদেশে ও আচরণে সহস্র সহস্র সংসারাশ্রমী ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আর তৎকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হইয়াছিল তাঁহার উপদেশে ও উদ্দীপনায়, ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই কথা বলিতেছেন।

দাসীবৎ সংসারে থাকার দিক্‌দর্শন শ্রীম-দর্শন। ইহা শ্রীমর জীবনবেদ। নবমভাগ এইসব কথা বহন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসীমঠ) বিনীত
ঋষিকেশ, হিমালয়। গঙ্গা দশহরা, গ্রন্থকার
১৩৭৬ সাল, ১৯৬৯ খ্রীঃ

প্রথম অধ্যায়
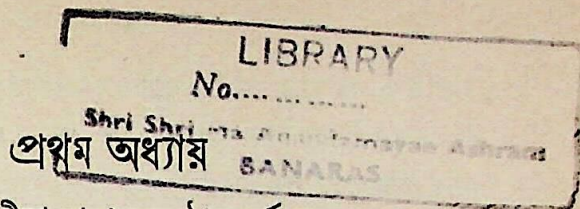
ঠাকুরের লীলা মায়ার কঠোর বর্মাবৃত

১

কলিকাতা। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। মর্টন স্কুল। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। পাশে বসা অন্তেবাসী। তিনি তাঁহাকে একটি বিশেষ কার্যে পাঠাইতেছেন। সেই সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) আপনি আজই যান। গিয়ে warn (সাবধান) করে দিন শুকলালবাবুকে। বলবেন, এখানকার (শ্রীমর) দরুণ যাদের সঙ্গে আলাপ তাদের টাকা পয়সা ধার দিতে হলে যেন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন। যান, আজই যান বেলেঘাটা। বলে আসুন এই কথা।

ছি ছি। তাও করতে হয়! টাকা এমন জিনিস, তা'তে আপনাকে পর করে দেয়। তাই তো ঠাকুর এর কথা এতো বলতেন। টাকার সম্পর্ক রাখতে নাই কারুর সঙ্গে।

টাকা ধার দিতেও নাই। পার তো পাঁচ টাকা দান করে দাও। ধার দিলেই আবার আনতে হবে। কত হাঙ্গামা, না দিলে মোকদ্দমা।

দেখ না, কত কষ্ট করে লোক রোজগার করছে টাকা—গায়ের রক্ত জল করে। সেই টাকা।

আবার অন্যের জন্য ধারও করতে নেই। এ নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, মনে অশান্তি হয়।

তাই ঠাকুর বলতেন, এখানে পেলা নাই। 'পেলা' মানে দর্শনী। আর একবার বলেছিলেন, আমি যে অমুকের সঙ্গে কথা কই না, কেন জান? সে কাজ করবে না। এখানে এসে থাকবে। ইচ্ছা, আমি কাউকে বলে দিই। এইজন্য এর সঙ্গে কথা কই না।

মন তো সকলের তৈরী নয়। Insight (অন্তর্দৃষ্টি) নাই যাদের

তারাই এ সব করে। কি করে যে মন তৈরী হয় তা' তো তারা জানে না। মন তৈরী হলে আপনি সব ছেড়ে দিবে। যখন মিথ্যা বলে বোধ হবে তখন সব ছাড়বে।

যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে—কিসে ভাল থাকা যায়, কিসে দেহের সুবিধা হয়—এ ভাবনা আছে, ততক্ষণ টাকার দরকার।

মন তৈরী হলে টাকা আপনিই ছাড়বে, আপনিই দিবে। এর আগে বললেও দিবে না। গুরু বললেও দেয় না।

বরেনবাবু ওখানে বেশী যেতেন না। বলতেন, গেলেই বলবে, অমুক ভাল কাজটা হচ্ছে, তোমাকে পাঁচশ' টাকা দিতে হবে। তাই যেতেন না।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—এখানে দু'জন সাধু এসেছিলেন বম্বের একজন ভক্তকে নিয়ে—বড় merchant (ব্যবসায়ী)। একজন বললে আমাকে বলে দিন, কি করে টাকা ব্যয় করব (হাস্য)। আমরা বললাম, বটে, দাঁড়াও বলছি। বললাম, ঠাকুর মোটেই ও-পথ মাড়াতেন না। কি আহাম্মকি ! আমায় বলে, কি করে টাকা খরচ করবে সেই কথা বলে দাও !

আসা যাওয়া করুক। ভগবানে ভক্তি হলে আপনি করবে। যখন বুঝবে এ টাকার মালিক ঈশ্বর। তা' না হলে কে শুনে তোমার কথা ? হয়তো বলবে, এদের এটা ব্যবসা। নিয়ে আসে আর ইনি বলেন, সাধু সেবায় খরচ কর (হাস্য)।

ঠাকুর একবার মথুরবাবুকে বলেছিলেন, তালুক বেচে দান কর, টাকা না থাকলে। এ কথা বলেই আবার বললেন, মা, আমার মুখ দিয়ে এ সব কথা কেন বলাও ?

একজন ভক্ত—একজন সাধু আমাকে বলেছিলেন, অমুককে গিয়ে বলে এস, তার একখানা বাড়ী যেন দান করে—দেবসেবা, সাধুসেবায় লাগবে। আমি গিয়ে বললুম। কিন্তু দান করলেন না।

শ্রীম—বলবে না তারা, তাদের যে insight (অন্তর্দৃষ্টি) নাই। Insight (অন্তর্দৃষ্টি) থাকলে এ কথা বলে না। কত কষ্ট করে টাকা

করে লোক, দেখ না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। সেই টাকা তুমি বললেই দিবে!

আগে ভালবাসা দিয়ে মন তৈরী কর। ঈশ্বরে ভক্তি হোক। তখন সব অনিত্য, এ বুদ্ধি আসবে। নিত্যানিত্য বিবেক হবে। তখন আপনিই দিবে। এর আগে বললে, হয় তো আসাই বন্ধ করে দিবে। তাই তো ঠাকুর বলতেন না কিছু দিতে। বলতেন, চাইলে কেউ আসবে না। মাকে বলেছিলেন, মা টাকা ওদের অত প্রিয়, তা' তাদেরই থাকতে দাও। আমায় তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—টাকা সাধলেও নিতে নাই। তা'হলে obligation-এর (বাধ্যবাধকতার) তলে থাকতে হয়। সেইজন্যই তো সাধুরা ভিক্ষা করে খায়। তা'তে obligation (বাধ্যবাধকতা) নাই। তোমার ইচ্ছা হয় দাও, না হয় না দাও। তা-ও আবার একখানা রুটি নিতে হয়, বা একমুঠো চাল, বা একটা পয়সা।

শ্রীমর কাছে দুইজন ভক্ত আসেন। একজন মনিব আর একজন তাঁহার কর্মচারী। মনিব কর্মচারীকে বেলেঘাটায় শুকলাল বাবুর কাছে পাঠাইয়াছিলেন একশত টাকা ধার আনিতে। কর্মচারী অন্তেবাসীকে কাল রাত্রে এ কথা জানান। অন্তেবাসী শ্রীমকে বলেন।

শ্রীম কর্মচারীকে সাবধান করিলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, অন্যের জন্য ধারও করতে নেই। ছি! ছি! উনি নিজে চেয়ে নিন্ না।

এই ব্যাপারে শ্রীম চিন্তিত হইয়াছেন। তাই অন্তেবাসীকে পুনরায় বলিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—যান আপনি আজই যান, বলে আসুন। Warn (সাবধান) করে দিবেন। বলবেন, ওঁর সঙ্গে যাদের আলাপ আছে উনি যেমন বোঝেন করবেন। এখানকার জন্য যাদের সঙ্গে আলাপ, তাদের যেন আমায় জিজ্ঞাসা না করে কিছু না দেন। মনে কর, এখানকার কথা বললে, তক্ষুণি দিয়ে দিবে। ছি, এ advantage (সুবিধা) নিতে আছে?

অন্তেবাসী—হয়তো ধার-কর্জ করে দিবে, চুরি করে দিবে, এখানকার নাম করলে।

শ্রীম—একজন সাধুকে পঁচিশ টাকা মাসে মাসে দিতেন। কাশীতে থাকেন সাধু। তাই বন্ধ করার জন্য কত চেষ্টা চলছে। তারপর বড়লোক হলেই বা খরচ কত। কত দিক দেখতে হয়। কত রকম খরচা।

অপরাহ্ন দুইটা। শ্রীম ছাদে অন্তেবাসীর কুটীরে দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে কথামৃত আর স্বামীজীর গ্রন্থ। অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—কথামৃতে যেখানে যেখানে স্বামীজীর মহত্ব ঠাকুর বর্ণনা করেছেন সেই স্থানগুলি কপি করতে হয়। আর স্বামীজীর বক্তৃতার কিছু কিছু কপি করতে হবে। তারপর এইগুলি বসুমতীতে দিতে হবে। মঠের অনেক সাধুর ইচ্ছা আমি কিছু স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখি। শ্রীমতী মেকলাউডও এই কথাই বলে পাঠিয়েছেন।

অন্তেবাসী—আমাকেও শ্রীমতী মেকলাউড বলেছিলেন আপনাকে বলতে এই কথা। বলেছিলেন, মিস্টার এম. যেন কলম দিয়ে জীবন্ত ছবি আঁকেন। আমার আন্তরিক অনুরোধ তাঁকে জানাবে স্বামীজীর বিষয় কিছু লেখেন। প্রাচীন ও নবীন সাধুরাও অনেকে এই কথা বলেছেন।

শ্রীম—হাঁ, কিন্তু মা শক্তি দিলেই লেখা সম্ভব। তাঁর কৃপা ছাড়া লেখাতে ভক্তিজ্ঞান সঞ্চারিত হয় না। কতকগুলি ঘটনা অথবা সমালোচনামূলক লেখায় বিশেষ কিছু হয় না। হদ্দ, বুদ্ধিটা একটু মার্জিত হয়। কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। এতে চরিত্র উন্নত হয় না। লেখা এমন হবে, যে পড়বে তার মন টেনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবিষ্ট করে দিবে। পাঠক বুঝবে, ভগবানদর্শনই মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। অতএব তার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য—আগে ভগবানে মন রেখে তারপর অন্য সব করা। তা' সাধুই হোক আর সংসারীই হোক। বাহ্য ত্যাগ সাধুকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। কিন্তু উদ্দেশ্যটি ভুলে গেলে

আর সোনা গালান হলো না এ জন্মে। যারা গৃহে আছে তাদের তো পদে পদে বিপদ। মায়া মোহ দিন রাত হাতে জাল নিয়ে ঘুরছে। জগদম্বার কৃপায় যদি ভক্তিলাভ হয় তবেই খানিকটা রক্ষা।

তাই কাউকে কিছু বলা, বা কিছু লেখা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অধিক স্থানেই উল্টো উৎপত্তি হয়। ঠাকুর যেমন বলতেন, যদি ছিল রোগী বসে বৈদ্যতে শোয়ালে এসে, হয়ে পড়ে। অথবা, আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া, এইরূপ বিপরীত জ্ঞান এসে যায়। আচ্ছা আপনি এইগুলি কপি করে ফেলুন।

কথামৃত শ্রীম বলেন, অন্তেবাসী লিখেন। যেখানে উদ্ধৃতির প্রয়োজন সেখানটা চিহ্নিত করিয়া দেন, অন্তেবাসী তাহা কপি করেন।

এখন নরেন্দ্রের মহত্বসূচক ঠাকুরের দেববাণীর অনুলিপি লিখিতেছেন। বলরাম মন্দির। ১৮৮৫ খ্রীঃ। রথযাত্রার পরদিন।

নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম। বৃহৎ জলাশয়। রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই। নিরাকারের উপাসক। পুরুষসিংহ। জিতেন্দ্রিয়।

নরেন্দ্রকে ঠাকুর পঞ্চবটীতে বলেছিলেন ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। সকালবেলা। মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান চিন্তা করতে হয়; কেঁদে কেঁদে বলতে হয়, ঈশ্বর আমায় দেখা দিয়ে কৃতার্থ কর। ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। এই উভয় রূপ দর্শন করে তাঁর আদেশ লাভ করে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়।

একদিন কাশীপুরে ঠাকুর কাগজে লিখেছিলেন, নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন বলেছিলেন, নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধের থাক। অখণ্ডের ঘর। হোমাপাখীর জাত। সংসারে আবদ্ধ হবে না। লোক-শিক্ষার জন্য সংসারে এসেছে। নরেন্দ্র ভগবানাদিষ্ট জগৎগুরু। গুরুদেবের কাছে যা শুনেছিলেন, সেই সকল কথা নিজ জীবনে তপস্যা দ্বারা প্রস্ফুটিত করেছিলেন। আর ঐ কথা জগৎ সমক্ষে ব্যক্ত করেন। তিনি সাধারণ লোকের মত শোনা কথার উদ্গার করেন নাই। নিজে না বুঝে একটি কথাও বলেন নাই। একদিন ঠাকুর বলেছিলেন নরেন্দ্রকে, কেহ কেহ আমাকে অবতার বলেন, তোর কি মত? স্বামীজী

উত্তর করলেন, অন্যদের বিশ্বাস হয় ভাল কথা। কিন্তু আমি না বুঝে অপরের কথা নিব না। যখন বুঝলেন, তখন উদাত্ত কণ্ঠে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার। বললেন, আমি কিম্বা আমার গুরুভাইগণ যদি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার চেষ্টা করে তা' হলেও তিনি স্বরূপতঃ যা ছিলেন (ঈশ্বর), তার লক্ষ লক্ষাংশের এক অংশও বুঝতে পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, মহম্মদ, শংকর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের সকল ধর্মাচার্যগণের সমষ্টিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ম্লান ধর্মকে পুনর্জীবন দান করতে এসেছেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মিলন-মন্দিরে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ ও প্রচার-বিগ্রহ।

আমেরিকার চিকাগো মহানগরীর বিশ্বধর্ম সম্মিলনমঞ্চে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রচার-বিগ্রহের কণ্ঠে বসে সমগ্র জগৎকে শুনিয়েছিলেন সনাতন বৈদিক ধর্মের অনন্ত শান্তি সুখ ও আনন্দের মহাবাণী।

এখন অপরাহ্ন প্রায় চারিটা। স্বামীজীর কনিষ্ঠ মধ্যমভ্রাতা মহিমবাবু আসিয়াছেন, সঙ্গে ছয়জন ভক্ত। তাঁহারা দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের ঘরে বসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীম চারতলা হইতে নামিয়া আসিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর মহিমবাবু বলিলেন, আপনার হাত দিয়ে স্বামীজীর কথা বসুমতীতে বের হচ্ছে জেনে খুব আনন্দ হচ্ছে। এ খুব ভাল হলো; 'কথামৃতে' স্থান পাবে ও-সব কথা। শ্রীমর ইচ্ছায়, মহিমবাবুর একজন সঙ্গী স্বামীজীর কথার প্রথমাংশ পড়িয়া সকলকে শুনাইতেছেন।

ইতিমধ্যে ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বড় ও ছোট অমূল্য আসিয়াছেন। তারপর আসিলেন, হাইকোর্টের উকীল পঞ্চাননবাবু।

আজ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব। পরম ভক্ত মহাত্মা রাম দত্ত উহা আরম্ভ করেন। আজও উহা চলিয়া আসিতেছে জন্মাষ্টমীর দিনে। ভোলানাথ মুখার্জী ও লক্ষ্মণ ঐ উৎসব দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রসাদ আনিয়াছেন। উহা সকলে গ্রহণ করিলেন।

পাঁচটার সময় শ্রীম বলিতেছেন, একবার গেলে হয় ওখানে। গিরিজা মহারাজ অত করে বলে গেছেন। দর্শন হবে আবার ঐ তীর্থ। সুরেশবাবুর বাগানও দর্শন হবে। ও-টিও তীর্থ। ঠাকুর ওখানেও গিয়েছিলেন। কপালে না থাকলে কি হয়? বৃদ্ধ শরীর কিনা, বেশী নড়াচড়া চলে না। ঠাকুর রামবাবুর বাগানে গিয়েছিলেন ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। উনি তখন সবে ও-টা কিনেছেন।

যাওয়া স্থির। ডাক্তারের মোটরে শ্রীম উঠিলেন। সঙ্গে জগবন্ধু, ডাক্তার, বিনয় ও দুই অমূল্য। গাড়ী মাণিকতলা দিয়া বাগানের সম্মুখে থামিল। খুব ভীড়। দলের পর দল বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে, খিচুড়ী তরকারী ইত্যাদি। দুই শত নয় উপচারে শ্রীভগবানের ভোগ হয় এখানে। কয়েক স্থানে কীর্তন হইতেছে। আনন্দ ধাম।

শ্রীম মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া ঠাকুরদর্শন করিতেছেন। একজন আসিয়া তাঁহার হাতে চরণামৃত দিলেন। স্বামী গিরিজানন্দ ভীড় সরাইয়া শ্রীমকে অগ্রে করিয়া ঠাকুরঘরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করাইতেছেন। বেদীর উত্তর দিকের দরজার কাছে শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বাহিরে আসিয়া রামবাবুর সমাধিতেও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে বাড়ীর ভিতর বসিয়া প্রসাদ পাইলেন।

তারপর ভিতর বাড়ীতে ঢুকিবার পথে তুলসী কুঞ্জে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। বলিলেন, এখানে ঠাকুর এসে বসেছিলেন। বলেছিলেন, স্থানটি বেশ নির্জন। এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়।

এবার শ্রীম প্রবেশ করিলেন পুষ্করিণীর দক্ষিণের ঘরে। একটি তক্তাপোষ আছে ঘরে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তক্তাপোষে বসিয়াছেন। বলিলেন, যেদিন ঠাকুর এ বাগানে পদার্পণ করেন সেইদিন এ ঘরে তিনি বিশ্রাম করেন। আর ভক্তসঙ্গে আনন্দে ফল মিষ্টি গ্রহণ করেন। একচল্লিশ বছর হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, কাল হয়ে গেছে এ সব। কি impression (অনুভূতি) লাগিয়ে দিয়েছেন মনে! অন্য কত স্থানে গিয়েছি সে সব কথা মনে থাকে না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে

যেখানে যেখানে গিয়েছি ঐ-সব স্থানের চিত্র মনে যেন পাথরের উপর কাটা দাগের মত সব চিত্রিত হয়ে আছে।

ফিরিবার পথে শ্রীম ঠাকুরবাড়ী হইয়া মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। এখন প্রায় ছয়টা। ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। শ্রীমর আদেশে জগবন্ধু ভাগবত পাঠ করিতেছেন প্রথম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়, কুন্তীদেবীর স্তব।

কুন্তীদেবী বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আদি পুরুষ। তুমি পূর্ণরূপে সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছ। কিন্তু মায়া-যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে তোমার এই অবস্থান। তাই কেহ তোমায় বুঝিতে পারে না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অবতারকে কেহ চিনতে পারে না। তিনি যাদের জানান কেবল সেই জানতে পারে। আহা কি কৃপা কুন্তীদেবীর উপর! এতে বোঝা যাচ্ছে কেন তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া। কত ভক্তি ভিতরে থাকলে তবে অবতারকে চেনার সৌভাগ্যলাভ হয়। 'কৃষ্ণ আমার ভাইয়ের ছেলে' স্নেহের এই কঠিন আবরণ ভেদ করে, 'আমি তোমার পূজনীয়া' এই লৌকিক আচরণ ছিন্ন করে, কৃষ্ণকে তিনি জেনেছিলেন পূর্ণব্রহ্মরূপে।

আমরা ঠাকুরের লীলা না দেখলে এ রহস্য বুঝতে পারতাম না। ঠাকুর কৃপা করে তাঁর স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তাই কৃষ্ণলীলা বুঝা যাচ্ছে। তাক্ লাগিয়ে দিতেন ভক্তদের নিজের স্বরূপ দেখিয়ে। কোনটা সত্য, এটা কি ওটা—এই ধাঁধাঁ লেগে যেতো। কৃষ্ণের তবুও বাহ্য ঐশ্বর্য ছিল। ছেলেবেলা থেকেই অমানুষিক কত কাজ করেছেন। সম্প্রতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কত যে যোগৈশ্বর্য প্রকাশ করলেন! এই কুন্তীদেবীর স্তবটিও, এইমাত্র যে ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন, তার ঠিক পরেই হয়। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র মেরেছিল পাণ্ডবদের মারবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রওনা হবার সময়। এই নিশ্চয় মৃত্যুর হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ তাঁর ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা সংহার করলেন।

কিন্তু ঠাকুরের লীলা আগাগোড়া কঠোর মায়ার বর্মাবৃত। প্রায় নিরক্ষর, দরিদ্র, সাত টাকা মাইনের পূজারী, আত্মীয় কুটুম্বও এইরূপ—

দশ টাকার বেশী মাইনে কারো নাই; এদিকে আবার প্রচার হয়েছে পাগল বলে। কখনো ন্যাংটা হয়ে ঘুরছেন, কখনো কাঁধে একটা বাঁশ, পেছনে একটা ল্যাজ বাঁধা কাপড়ের, আর লম্বা লম্বা ধাপে চলছেন।

এই আবরণ ও আচরণের ভিতর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্যমনের অতীত। ভক্তদের এক একবার এইরূপ দেখিয়ে ধাঁধায় ফেলে দিতেন। প্রথম প্রথম কারোকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আমায় তোমার কিরূপ বোধ হয়'? 'অচেনা গাছের কথা শুনেছো? দিগন্তব্যাপী একটা মাঠ তা'তে দেয়াল, তা'তে একটা ফুটো?' একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন 'বল দেখি এটা কি।' ভক্তটি উত্তর করলেন, ওটা আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যাচ্ছে। খুশী হয়ে বললেন, 'হাঁ একেবারে দু'তিন ক্রোশ—অনেকটা দেখা যাচ্ছে।'

অজ্ঞানের পর্দাটা না থাকলে কারো সাধ্য নাই অবতারকে বোঝে।

দ্রৌপদীকেও মাঝে মাঝে বুঝিয়েছিলেন কৃষ্ণ—আপনার স্বরূপ। তাই তো যখনই বিপদ আসছে তখনই দৌড়ে গেছেন কৃষ্ণের কাছে। আহা, কত কৃপা থাকলে এ-টি হয়! যোগীশ্বরগণ যাঁকে ধরতে পারে না, তাঁকে ধরবার শক্তি লাভ করা। কত ভক্তি ছিল দ্রৌপদীর! যখনই তাঁর চক্ষে জল এসেছে অমনি কৃষ্ণ হাজির। উত্তরাকে পরিচয় দিয়েছিলেন। 'রক্ষ রক্ষ মহাযোগীন্'—বলে কৃষ্ণের কাছে আশ্রয় চাইলেন, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র তাঁর পেটের ছেলে পরীক্ষিৎকে যখন বিনাশ করতে আসে। অবতারকে আত্মীয় কুটুম্বরা প্রায়ই চিনতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এক একজনকে পরিচয় দিয়েছিলেন। তা' নইলে যে লীলাটি পূর্ণ হয় না! যদি কেবল তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করা, রাজ্য পাইয়ে দেওয়া—এ সব দেখে, তবে তো লীলা পূর্ণ হবে না। তা'তে ওদের অহঙ্কার বাড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কারো কারোকে তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দিতেন। তা' হলে অহংকৃত হবে না ঐশ্বর্যের ভিতর থেকেও।

ঠাকুরের বাবা জানতেন ঠাকুর অবতার, রঘুবীর নব কলেবরে। তোতাপুরীও চিনেছিলেন। ব্রাহ্মণীও জানতেন। ঠাকুরের দিদিও

(হৃদয়ের মা) জানতেন। তাই ঠাকুরের পূজা করেছিলেন। ঠাকুর ভাবে বলেছিলেন, তোমার মৃত্যু কাশীতে হবে—তাই হয়েছিল।

Contemporaryরা (সমসাময়িক লোকেরাও) কেহ কেহ তাঁর কৃপায় চিনতে পেরেছিলেন অবতার বলে—কে ঠাকুরের পা পূজো করেছিলেন ফুলচন্দন দিয়ে তাঁর উপরের ঠাকুরঘরে। ঠাকুর বিজয় গোস্বামীকে বলেছিলেন এই কথা। আমরা তখন উপস্থিত ছিলাম।

অন্তরঙ্গরা কেহ কেহ (শ্রীম) প্রথম যাতায়াতেই ধরতে পেরেছিলেন। একজনকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাকে তোমার কেমন মনে হয়? সাধারণ মানুষের চাইতে কিছু বিশেষ আছে কি কিছু? ভক্তটি বললেন, আপনাকে ভগবান নিজের হাতে গড়েছেন। অপরদের গড়েছেন (কর্মফলের) মেসিনে ফেলে।

গিরিশবাবুও প্রথম প্রথম যাতায়াতেই বলেছিলেন, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম। ঠাকুর এ কথা মেনে নিয়েছেন। তাই নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কি মনে হয়—গিরিশ যা (অবতার) বলে?

বড় কঠিন ব্যাপার অবতারকে চেনা। ঋষিরা পর্যন্ত রামকে, কৃষ্ণকে চিনতে পারেন নাই। মাত্র কয়েকজন—a very few, চিনেছিলেন।

পাঠ চলিতে লাগিল। কুন্তীদেবী একটি অদ্ভুত প্রার্থনা করিয়া বসিলেন।

কুন্তী (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)—হে জগদ্‌গুরো, যে বিপদে তোমার দর্শনলাভ হইয়া থাকে ও যাহা হইতে সংসার-দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, সেই বিপদ যেন আমার সর্বদাই বর্তমান থাকে।

শ্রীম—বিপদ সম্পদ দুটোই ত্যাজ্য। তবে ভগবানদর্শন হয়। কারণ আদর্শ মানুষ, 'স্থিতপ্রজ্ঞ' তিনি, যিনি দুঃখেতে 'অনুদ্বিগ্নমনা' আর সুখেতে 'বিগতস্পৃহঃ'। সংসারের সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়িত। 'পরিবর্ত্তন্তে চক্রবৎ সুখানি চ দুঃখানি চ'—চাকার মত ঘোরে সুখ দুঃখ। আজ সুখ কাল দুঃখ, কাল দুঃখ আজ সুখ—এই জগতের রীতি। এর ওপর একটা একটানা সুখ আছে। সেটি ব্রহ্মানন্দ। সমাধিতে সুখদুঃখ বোধ থাকে না—অনাদি অনন্ত সুখে মন বিলীন। নিচে মন এলেই

সংসারের সুখদুঃখের অধীন—তত্ত্ববেত্তা ও অতত্ত্বজ্ঞ উভয়েই। প্রবল ঝড়ে বট অশ্বত্থও বিকম্পিত হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞের মনের সাম্য শীঘ্রই ফিরে আসে। সুখও ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, দুঃখও ভুলিয়ে দেয়। পাণ্ডবরা দুঃখে, অতি কঠোর দুঃখেও ভগবানকে স্মরণ রেখেছিলেন। তার কারণ তাঁরা যে সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য বনবাসী। সত্য ধর্ম—ভগবানের মন্দিরের চার দেয়াল। কুন্তীদেবী তাই সেই দুঃখ চাইলেন যাতে ভগবানে মন থাকে। তা'হলেই তাঁর দর্শন হবে। সেই দর্শনে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হবে। অর্থাৎ জন্ম-মরণ চক্র থেকে রেহাই পাবে।

ভগবান যতটা দুঃখ সইতে পারে ততটা দুঃখই দেন ভক্তগণকে। এতে দু'টি কাজ হয়, নিজের অহংকার চূর্ণ হয়। এর পরই মন উঠে যায় magestic height-এ (মহিমময় উর্দ্ধে)। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শিক্ষা। সারা ভারত আজ পর্যন্ত পাণ্ডবদের দুঃখের শিক্ষা নিয়ে বেঁচে লোকআছে। রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাই এই।

ঠাকুরের ভক্তদেরও দুঃখ হয়েছিল। স্বামীজী মা ভাইদের দুঃখে অধীর হয়ে পড়েছিলেন। অত বড় আধার হয়েও। প্রায় নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন একটা সময়। নিজের শক্তিতে কুলায় নাই এই দুঃখ দূর করা। তাই ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জগদম্বাকে বলে এদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

কুন্তীদেবী তাই প্রার্থনা করলেন, যে দুঃখে তুমি সঙ্গে থাক সেই দুঃখ দাও।

পাঠ চলিতেছে। কুন্তীদেবী ধাঁধাঁয় পড়িয়াছেন।

কুন্তী—হে নারায়ণ, তুমি যখন যে শরীর নিয়ে অবতীর্ণ হও, সেই শরীরের জাতিগত স্বভাব এরূপ অনুকরণ কর যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও তোমাকে কর্মাধীন মনে করিয়া মহাভ্রমে পতিত হয়।

শ্রীম—আহা, কি সত্য কথা। মানুষ শরীর নিয়েছেন তো মানুষের মত পূর্ণ ব্যবহার। পূর্ণ মানুষ ও পূর্ণ ঈশ্বর অবতার। আহা ঠাকুরের সঙ্গে ঘর করেছিলাম বলে শাস্ত্রের এ সব কথা বোঝা যাচ্ছে। চৈতন্যদেবের ভক্তরা বলেছিলেন, 'আমরা গোরার সঙ্গে থেকে গোরার

ভাব বুঝতে নারলাম গো।' ঠাকুরের সঙ্গে ছিলাম বলে, এই কথায় আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। শোক তাপ দুঃখ কাম ক্রোধ লোভাদি সব মানুষের মত। এক, পয়েন্ট ওয়ান—মানুষভাব, আর নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন—দেবভাব। মহিমাচরণের এই ভ্রম।

পাঠ চলিতেছে। কুন্তী—হে কৃষ্ণ, মানুষ সংসার জ্বালায় জর্জরিত হইয়া তোমার লীলা শ্রবণ ও স্মরণ করিবে আর সংসার যাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে—এই অভিপ্রায়ে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

শ্রীম—এটিও আমরা বুঝতে পেরেছি তাঁর সঙ্গে থেকে! এটি সহজ সাধন। জ্ঞানযোগ রাজযোগ কঠিন সাধন। এটি মানুষের মত তাঁকে ভালবাসা, খাওয়ান, শোয়ান, মান অভিমান সব করা গেছে। গোপীরা কেবল এই মানুষভাবে তাঁকে ভালবেসে সর্বদুঃখ বিমুক্ত। একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) সবটা মন যদি এখানে মানে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলো তা'হলে আর বাকী রইল কি। একটি ভক্ত খালি ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকতো। তা'তেই বলেছিলেন এই কথা।

পাঠ চলিতেছে। কুন্তী স্নেহ বন্ধন থেকে মুক্তি চাইছেন।

কুন্তী—হে বিশ্বেশ্বর, তুমি গমন করিলে পাণ্ডবদিগের অকুশল, আর এখানে থাকিলে যদুগণের অকুশল হইবার সম্ভাবনা। এই উভয়কুলের প্রতি আমার যে স্নেহ আছে তাহা ছেদন কর। আমার মতি যেন অন্য বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তর তোমার চরণে নিবদ্ধ থাকে।

শ্রীম—সংসারের যে কোন বস্তুতে মন থাকলেই অশান্তি। অথচ মন যতদিন আছে ততদিন কোন বস্তুর আশ্রয় ভিন্ন থাকতে পারে না। মনকে বহির্মুখ করে ভগবান সৃষ্টি করেছেন। কুন্তীদেবীর এখন এই জ্ঞান দৃঢ় হয়েছে। কত যুদ্ধ বিগ্রহ বিপদ বনবাস শোকতাপ তিনি দেখেছেন। তাই একমাত্র শান্তির স্থান শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয় চাইছেন। তাঁর ভিতরে সন্ন্যাস হয়েছে। বাসনা ত্যাগই সত্যিকার সন্ন্যাস।

তাই ঠাকুর ভক্তদের অল্পবয়সেই শিখিয়েছিলেন, সংসারে থাকবে বড় ঘরের ঝিয়ের মত। বাইরে ভালবাসা দেখাবে, সব কর্তব্য করবে,

কিন্তু ভিতরে বিচার করবে, আত্মীয়স্বজন আমার কেউ নয়। আমিও তাদের কেউ নই। একমাত্র ভগবানই তাদের ও আমার অনন্তকালের বন্ধু।

দেখ না, জন্মের পূর্বেও তিনি ছিলেন। কুটুম্বরা কেউ ছিল না—পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদি। মৃত্যুর পর কেউ সঙ্গে যাবে না। ঈশ্বরই জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পর সঙ্গে থাকেন, যাবৎ না ঘরের ছেলে ঘরে পৌঁছায়। যদি তাই সত্য তবে তাঁকে কেন জন্মের পর ভুলে যায় মানুষ? তাঁর মায়ার কাজ এ-টি। সত্য বস্তু তাঁকে ভুলে গিয়ে অসত্য বস্তু সংসারে মনোনিবেশ করানো মায়ার কাজ। তাই ভক্তদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

পাঠ চলিতেছে। কৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার জন্য প্রস্তুত। কুন্তীকে কোন রকমে বুঝাইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন শোকে-মোহে বিক্ষিপ্ত—যুদ্ধে অত লোকক্ষয়জনিত শোকে। বলিতেছেন, তিনটা অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই পাপনিরোধ হবে না। গৃহস্থাশ্রমে থেকে কোন ধর্মাচরণে সে পাপ অপনোদন হয় না।

শ্রীম—ঠাকুর বলেছিলেন, যদি সন্ন্যাস নেয় কেহ, তবে মনের যে বাজে খরচ হয় সংসারে, তা' পূর্ণ হতে পারে। যুধিষ্ঠিরের ভিতরে সন্ন্যাস হয়েছে। ব্যাসাদি ঋষিগণ, ভীষ্ম পিতামহ কত বুঝালেন, কিন্তু মন অশান্ত। তারপর কৃষ্ণের কথায় প্রবোধ মেনে ঘরে ছিলেন। তখন বস্তুতঃ সন্ন্যাসীর মতই ছিলেন। পরীক্ষিৎকে রাজা বানিয়ে, রাজকার্য শিক্ষা দিতেন খানিকটা সময়। বাকী সময় বৈরাগ্যাবলম্বন করে ঈশ্বরচিন্তা করতেন। আহার স্বল্প, কেশাদি ধারণ করলেন। সামান্য আহার, বস্ত্রাদিও অল্প। সারাদিন ঈশ্বরচিন্তা করতেন। কৃষ্ণের শরীরত্যাগের সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ মহাপ্রস্থান করলেন। ঠাকুরের ভক্তরাও তাঁর আদেশে এইভাবে ঘরে ছিলেন। পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম—আজ সারারাত স্টার থিয়েটারে অভিনয় হবে। আপনারাও যান। সুখেন্দু, মনোরঞ্জন ও বলাই গিয়েছেন। এ-সব দেখতে হয়, বড্ড

impression (প্রতীতি) হয় মনে। আমাদের যখন জোর ছিল গায়ে প্রায়ই দেখতাম। জগবন্ধু, ডাক্তার, অমূল্য সারারাত জেগে ছয়টি নাটকের অভিনয় দেখলেন—জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, নন্দবিদায়, সুদামা, অর্জুনের পরীক্ষা ও জয়দেব। সকাল সাড়ে পাঁচটায় শেষ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২২শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ,
৬ই ভাদ্র ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, জন্মাষ্টমী ৫৬।৫৬ পল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

১

মর্টন স্কুল। শ্রীমর চারতলার কক্ষ। অপরাহ্ণ তিনটা। কাছে অন্তেবাসী বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে উত্তরাস্য। শ্রীম বিছানায় বসা পশ্চিমাস্য। শ্রীমর নিকট লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্র পড়িয়া শ্রীম শুনাইতেছেন। তারপর পড়িলেন স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—স্বামীজী লিখছেন, কেউ curse (অভিশাপ) দিবে, কেউ reward (পুরস্কার) দিবে—'কথামৃত' পড়ে। যাদের, মনে কর, interest-এ (স্বার্থে) হাত পড়বে, তারাই curse (অভিশাপ) দিবে। ত্যাগের কথা আছে কিনা এতে। যাদের ভোগে মন আছে তারাই রেগে যাবে। মা হয়তো বলবে, হায় আমার ছেলেটা সাধু হয়ে বের হয়ে গেল! ঐ লোকটাই তো তার মাথা খারাপ করে দিল বইটা (কথামৃত) লিখে। কোন স্ত্রী হয়তো বলবে, আমার সাজান বাগান নষ্ট করে দিল ঐ লোকটা। পতিও বলতে পারে, ঐ বইটা পড়েই আমার স্ত্রী বিগড়ে গেল।

যাদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে, কিম্বা অল্প বাকী আছে, তারা ঠিক এর উল্টো কথা বলবে। তারা বলবে, 'কথামৃত' অমৃতই বটে—জীবনামৃত। ঐ-টি আমাদের শান্তি দিল, জ্বলে যাচ্ছিলাম। এরা

এখন কেবল ভগবানে মন দিবে। এদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে। অন্য কিছুতে রুচি নাই।

স্বামীজীরও ঐ দশা (অভিশাপপ্রাপ্তি) হয়েছে কিনা। তাই পূর্ব থেকেই আমাদের warn (সাবধান) করে দিলেন, তোমারও হবে।

'কথামৃত' বের হওয়ার পর কত চিঠি লিখেছে লোক curse (অভিশাপ) দিয়ে।

সৎকাজ করবে, নিষ্কাম সেবা করবে, এ সব ভাল কাজ হলেও, এ সব রয়েছে। এ সব সহ্য করার শক্তি অর্জন করে, তবে কাজে যাও। দেখ না, ক্রাইস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে দিল। চারটি খানিক কথা সৎকাজ করা, ঈশ্বরের সেবা করা! জগৎ রুখে দাঁড়াবে। এই সব সহ্য করতে পার তো ঈশ্বরের সেবা। মন প্রাণ দেহ ঈশ্বরে সমর্পণ করতে পারলে তবে হয়।

(সহাস্যে) তাই স্বামীজী সাবধান করে দিয়েছেন। Cet Bon, মানে that's good—'এ্যাসাহি সৎকাল বান্‌তা জাতা হে সাহেব'।

অপরাহ্ণ চারিটা। শনিবারের ভক্তগণ ছাদে একত্রিত হইয়াছেন—ভাটপাড়ার ললিত, ভবানী, বসন্ত ও একটি নূতন লোক। একটু পরে আসেন রামপুরহাটের ভক্তবীর মুকুন্দ। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর শ্রীম কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ললিতের প্রতি)—কাল আমরা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গিছলাম। বেশ উৎসব হলো। অনেক লোক প্রসাদ পেল। কালে এ-সব খুব বড় স্থান হয়ে উঠবে—মহাতীর্থ সব হবে। যেমন বৃন্দাবন অযোধ্যা দ্বারকা, তেমনি এ সব হবে। ভগবান এসেছেন কিনা নরকলেবরে। এ সবই মোক্ষক্ষেত্র। এমন স্থানে এলে মোক্ষের কথা মনে হবে, ভগবানের কথা মনে হবে। তা' হলেই আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্তি। নূতন মহাতীর্থ এ সব।

নূতন লোক—আমি একটি আশ্রম খুলেছি, ঠাকুরের নামে। লোকসেবা হবে।

শ্রীম—আগে সাধুদের কাছে আনাগোনা করতে হয়। তাদের

সঙ্গে আলাপ হবে তবে ঐ সব শুভকর্ম করা যায়, তাদের উপদেশ নিয়ে। তা' না করলে যেমন লোক হুজুগে পড়ে করে তেমনি হয়ে যায়। শেষ অবধি টিকে না।

আগে ঋষিদের কাছে যেতো কিনা রাজারা, কিংবা কম বয়সের ঋষিরা। (অঞ্জলিবদ্ধ হাত দেখাইয়া) এমন করে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। হাতে সমিধ অর্থাৎ পূজার দ্রব্য। বড় ঋষি বলতেন, হাঁ, বুঝেছি বাবা, তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তা' বেশ জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু আগে এক বছর তপস্যা করে এসো, সত্য ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা অবলম্বন করে।

তিনি কি তাদের অপমান করলেন ? না, তা' নয়। তাদের ভালর জন্যই ঐরূপ আচরণ করলেন। তপস্যা না করলে প্রশ্নই ঠিক হয় না। কি বলতে কি বলে বসবে, তার নাই ঠিক।

একাগ্র মনে ঈশ্বরচিন্তা করবার চেষ্টা করলে তখন সংশয় কি তা' বোঝা যায়। নইলে চঞ্চল মনে আজ এই স্থির হলো, কাল অন্যরূপ।

সাধুসঙ্গ করা। তারপর তপস্যা করা। তারপর সাধুদের আদেশ নিয়ে কাজটাজ করা।

'সরষে'তে একটি আশ্রম হয়েছে। একটি ব্রহ্মচারী করেছে। অনেক তপস্যা করেছে। তাই সেদিন মঠের সাধুরা গিয়ে সেখানে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে এলেন।

আপনিও তপস্যা করুন। রাজী আছেন, কি বলেন ? এক বছর তপস্যা করুন তো আগে। তারপর যা দাঁড়ায়।

এই কঠিন পরামর্শ শুনিয়া নূতন লোক নির্বাক।

কিছুক্ষণ সকলে চুপ হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ কেহ অন্তরে ভাবিতে লাগিল গীতার কথা—কর্মের গতি গহন। এই মহর্ষি কৃপা করিয়া এই লোকটিকে যাহাতে কর্মে বদ্ধ না হয় সেই ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু লোকটির হাবভাব দেখিয়া মনে হইতেছে সে, সাধুসঙ্গ তপস্যা ও সাধুদের আদেশ লইয়া কর্মারম্ভ করিতে প্রস্তুত নয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য

এ লোকটির ভাবনা নাই। যে কর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের কৃপা লাভ নহে, ভক্তদের সে কর্ম কেন করা ?

ভারত-বিখ্যাত ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা উঠিল। তিনি সম্প্রতি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভে ব্রতী হইয়াছেন। আহার-বিহারে, চাল-চলনে পূর্বের বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া তপস্বীর কঠোরতা গ্রহণ করিয়াছেন মধ্যজীবনে। ইহাতে শরীরের উপর আঘাত লাগিয়া অসময়ে শরীরের অনাবশ্যক ক্ষতির আশঙ্কার কথা ভাবিয়া শ্রীম চিন্তিত। চিত্তরঞ্জন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন ধুরন্ধর সৈনিক। তাঁহার অমূল্য জীবনটি রক্ষার কথা ভাবিয়া শ্রীম সর্বদা ভাবিত।

আজের ভক্ত-মজলিশে চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ-তপস্যার কথা উঠিয়াছে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কথা ভক্তগণ নানাভাবে আলোচনা করিতেছেন। এ সকল আলোচনার ভিতর পুনঃপুনঃ তাঁহার ত্যাগের কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শ্রীম এতক্ষণ নির্বাক এই সকল প্রসঙ্গ শুনিতেছিলেন। শ্রীম এখন নিজের অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বুদ্ধদেবের মত ত্যাগ তাঁর। কিন্তু এ বয়সে হঠাৎ অত কঠোরতা সইবে কি ? একদিকে জীবনধারণের কঠোরতা অপর দিকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অবিরাম স্বাধীনতা সংগ্রাম। অত চাপে শরীরটা পড়ে না যায়। এই ভাবনা হচ্ছে আমাদের। এমন সুহৃদ কেউ নাই, যে তাঁকে জোর করে, কিছুদিনের জন্য retirement-এ (বিশ্রামলাভে) নিয়ে যায়। এটি হলে ভাল হয়। কই, নাই বুঝি এমন কেউ ! এ সব লোকের শরীর যত দীর্ঘস্থায়ী হয় ততই ভাল। Human calculation-এ (মানুষবুদ্ধিতে) এ কথাই এসে পড়ে। দেখুন না আশুবাবু, কতবড় genius (প্রতিভা)। কিন্তু কি করে বেঘোরে দেহটা গেল। দু'লাখ টাকার জন্য পাটনায় গেলেন। তারপর এই বিপদ। এ সব লোক দিয়ে কত কাজ হতো। কিন্তু টাকাই যত গোল বাধালো।

শ্রীম কিছুক্ষণ নির্বাক। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—worldly (সাংসারিক) লোকের কাছে বড় কে? তা, যাদের অনেক টাকা সম্পত্তি আছে। বাড়ীঘর লোকজন গাড়ীঘোড়া মানসম্ভ্রম আছে। আর ঠাকুরের কাছে বড় কে? যে ঈশ্বর বই কিছুই জানে না, যেমন নারদ, শুকদেব।

যে টাকা-কড়ি মানের জন্য অন্য লোকের জিভের লাল পড়ে ঠাকুর তা' পরিত্যাগ করলেন। লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বলেছিলেন, 'ঝঁ্যাটা মারি লোকমান্যে।' মাড়োয়ারীর দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাবের কথা শুনে, একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। শুনেছে কেউ কখনও এমন কথা—একেবারে মূর্চ্ছা! এমনি deep-seated aversion (এত গভীর বিতৃষ্ণা)!

অপর লোকের টাকা না পেলে মূর্চ্ছা হয়। আর এঁর টাকা গ্রহণের কথায় মূর্চ্ছা। কি বিচিত্র চরিত্র!

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে বললেন, মা শেষকালে আমায় টাকা দিয়ে ভুলাতে চাও? মা, তোমার শ্রীচরণে যাতে মন থাকে কেবল এই করো।

বলেছিলেন, টাকা দেওয়ার কথা শুনে মাথায় যেন কুড়োলের আঘাত পড়লো। তা'তেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

মেয়েমানুষের গায়ের হাওয়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। তাই বলেছিলেন, সন্ন্যাসীদের স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখতে নেই। হাজার ভক্ত হলেও তাদের কাছে থাকতে নেই।

"কৃপা করে একটিবার দর্শন দিন প্রভু রাজাকে" (প্রতাপরুদ্রকে)—চৈতন্যদেবকে এই অনুরোধ করলেন রাজমন্ত্রী মহাভক্ত রায় রামানন্দ আর বাসুদেব সার্বভৌম। শুনে চৈতন্যদেব বিস্ময়ে বললেন, বল কি তোমরা! রাজা বিষয়ীর শ্রেষ্ঠ। তাকে দেখা আর বিষয় ভোগ করা সমান। আমি কি শেষে এই করতে এলাম সব ছেড়ে? ভক্তরা আর একদিন অনুরোধ করেন। তখন তিনি উত্তর করলেন, তা' হলে আমি আলালনাথে চললাম। এই বলেই একেবারে রওনা। তারপর সকলে গিয়ে মিনতি করে ফিরিয়ে আনে। এমনি কাণ্ড। চারটিখানি কথা?

আলালনাথ বেশ স্থান, বন আর নির্জন। আমি গিছলাম দেখতে। পাঁচ ক্রোশ দূর মন্দির থেকে।

২

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কেশব সেনকে কত ভালবাসতেন ঠাকুর। কতবড় লোক! বলেছিলেন, ও দৈবী লোক। এমন যে ব্যক্তি তাকেই মুখের উপর শুনিয়ে দিলেন, 'ল'তে (নিতে) পারলুম না তোমার কথা। তুমি টাকাকড়ি, মান সম্ভ্রম নিয়ে রয়েছ।' কেশববাবু ঠাকুরকে বলেছিলেন কিনা—আপনার ষোল আনা জ্ঞান হয়েছে।

শ্রীম (নূতন লোকের প্রতি)—সাধুসঙ্গ ছাড়া কি আমাদের আর উপায় আছে?

একটি কথা মনে হচ্ছে। একজন নানকপন্থী সাধু বলেছিলেন। তখন ঠাকুরের ওখানে খুব আনাগোনা করছি। বিয়াল্লিশ বছর হয়ে গেছে। দু'টি কথার একটি মনে ছিল আর একটি ভুলে গিছলাম। সে-টি এই ক'দিন মনে হচ্ছে। সে-টি এই। একজন মানস সরোবরে পক্ষীযজ্ঞ করতো। তা'তে সব রকম পক্ষীই আসবে এই আশা। তা' হলে হাঁসও আসবে। তার সঙ্গে পরমহংসও আসবে নিশ্চয়। পরমহংস মানে নারায়ণ কিনা। তার মানে এই, সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যেতে পারে।

আর একটি এই। দু'জন partner (শরিক) ছিল। একজন মরে গেল। তার ছিল একটি পুত্র ও পত্নী। পত্নী পুত্রকে নিয়ে শরিকের বাড়ী গেল। ঘরে একটা হীরা ছিল, লাখ টাকা দাম। ওটাও সঙ্গে নিয়ে গেল। শরিককে বললো, এখন আমাদের কে আর আছে আপনি ছাড়া? উনি যাওয়ার আগে এই হীরাটা রেখে গিছলেন ঘরে। শুনেছি এর দাম লাখ টাকা। শরিক দেখে বুঝলো এর দাম পাঁচ হাজার হদ্দ দশ হাজার টাকা হতে পারে। লাখ টাকা কিছুতেই নয়।

সে বললে, ওটা বরং আপনার কাছেই রেখে দিন। ছেলে আফিসে বেরুক। চার পাঁচ বছর হয়ে গেল। ছেলে কাজ শিখেছে বেশ। একদিন মাকে বললে, কই মা, হীরেটা দাও দিকিন পরখ করি। আমি পরখ করতে শিখেছি। দেখে বললে, এর দাম হদ্দ দশ হাজার টাকা, লাখ টাকা নয়।

এর মানে এই, গুরু যিনি তিনি হঠাৎ সব কথা শিষ্যকে বলেন না। শিষ্য ভয় পাবে বলে। তাই ধীরে ধীরে lead করেন।

শরিক যদি বলতো, এর দাম দশ হাজার টাকা, বিশ্বাস হতো না শরিক-পত্নীর। ভাবতো, আমাকে ঠকাতে চাইছে। ছেলের মুখ দিয়ে বলানোতে বিশ্বাস হলো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর তাই বলতেন কলকাতার লোককে, সব ত্যাগ কর, এ কথা বলবার যো নাই। তা' হলে আর আসবেই না। তাই বলি, তোমরা এ-ও কর ও-ও কর। এক হাতে ঈশ্বরকে ধর, এক হাতে সংসার কর। বলি, তোমরা মনে ত্যাগ কর। তারপর আনা-গোনাতে যখন বুঝতে পারবে নিজে, এ সব কিছু নয়—স্ত্রীপুত্র পরিজন, তখন আপনিই ছেড়ে দিবে।

এখন সন্ধ্যা সাতটা। ভক্তগণ কেহ কেহ চলিয়া যাইতেছেন। আবার কেহ আসিতেছেন। শ্রীম উঠিয়া গিয়া একটু দূরে অন্তেবাসীকে বলিতেছেন, ছাপার কাগজ আসছে না এখনও। ঠাকুরবাড়ীতে রয়েছে। ছাপাখানায় বলেছিলাম, বিকালে পাঠাব। পাঠাতে পারলে কথাটা থাকতো। অন্তেবাসী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া কাগজ লইয়া আসিলেন। তারপর উহা ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

ভক্তসভা চারতলার ছাদে বসিয়াছে। এখন রাত্রি আটটা। ডাক্তার, বিনয়, বড় জিতেন, ছোট অমূল্য, মনোরঞ্জন, শুকলাল, শান্তি, বলাই, অমৃত, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীমর তিন দিকে বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য। কিছুকাল সকলে ধ্যান করিলেন। তারপর শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—যার যা প্রকৃতিতে আছে, তাইতো

হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যুদ্ধ করবো না বললেই হবে ? তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ রয়েছে যে ! প্রকৃতি জোর করে যুদ্ধ করাবে—'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'।

না করে উপায় নেই। তবে ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে কর। এই পথ। তিনি সঙ্গে থাকলে, সর্বদা এ কথাটা মনে থাকে, প্রকৃতি করাচ্ছে। তা' হলেই নিজেকে আলাদা রাখা যাবে এই ভেবে,—আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর দাস। তা' হলে, কর্ম তাকে বাঁধতে পারে না।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—কই প্রোগ্রাম সব, কালের থিয়েটারের ? আচ্ছা, এই দুটো পড়ে শোনান্—'সুদামা' ও 'নন্দবিদায়'—সিনের পর সিন।

জগবন্ধু পড়িতেছেন—'সুদামা'। প্রথম দৃশ্য—সুদামার কুটীর। দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী ও নারদ। তৃতীয় দৃশ্য—বালক-মাঝিবেশে শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা। চতুর্থ দৃশ্য, দ্বারকার রাজপ্রাসাদ—দ্বারপালগণ ও সুদামা। পঞ্চম দৃশ্য, দ্বারকার রাজসভা—শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী, নারদ, রাজন্যবর্গ ও সুদামা। ইত্যাদি।

'নন্দ বিদায়'। প্রথম দৃশ্য, রাজ-অন্তঃপুর—অস্তি, প্রাপ্তি, কংস ও অক্রুর। দ্বিতীয় দৃশ্য, নন্দালয়—শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, যশোদা ও রোহিনী। তৃতীয় দৃশ্য, গোষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম অক্রুর ও রাখালগণ। ইত্যাদি।

শ্রীম—আমাদেরও হয়ে গেল সব দেখা। এঁরা দেখে এসেছেন। তার benefit (সুবিধা) নিতে হবে তো ! শুনলেও হয়। যাদের imagination (কল্পনা শক্তি) আছে তাদের চৌদ্দ আনা পর্যন্ত হয় শুনলে। দু'আনা মাত্র বাকী থাকে।

তাই ঠাকুর বলতেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল, শোনার চাইতে দেখা ভাল। এরা দেখে এসেছেন। আর আমরা শুনছি। আমাদেরও হয়ে গেল এতেই। দেখা শোনা আর পড়া। শোনা next best (মধ্যম)। আমাদেরও তাই হলো।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—একটু কথামৃত পাঠ হোক।

শ্রীম কথামৃতের তৃতীয় ভাগের দশম খণ্ডের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়

পড়িতে বলিলেন। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, যখন অমাবস্যা পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণ জ্ঞান হয়।

শ্রীম—ঠাকুর বললেন পূর্ণ জ্ঞান হয়। কিন্তু হলধারী বললেন, অব্যবস্থিতচিত্ত হয়। হলধারীর মতটি বিষয়াসক্ত সংসারী লোকের মত। যাদের উদ্দেশ্য ভগবানদর্শন, জীবের শিবত্বলাভ, তারা ঠাকুরের মত-ই নেবে। মন যখন সমাধিস্থ হয়, নুনের পুতুল যখন সমুদ্রে গলে যায় তখন সংসারজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এটাকেই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলেছেন বেদ। ঠাকুরও তাই নিজের জীবনের অনুভূতি থেকে বলেছেন। এই সমাধিস্থ মন যখন নিচে নেমে আসে তখন দেখে যেন ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। আরও নিচে যখন নামে তখনকারই এই অবস্থা, যা বললেন—অমাবস্যা পূর্ণিমা এক হয়ে যায়। মানে মনটা টেনে রেখেছে। বাইরের ব্যবহার কোন রকমে চলছে। হনুমানেরও এই অবস্থা হতো—দিন তারিখ তিথি নক্ষত্রের কথা মনে থাকতো না, কেবল রাম চিন্তা করতেন। অবতারদের মন এরও নিচে নামে। রাম রাজত্ব করছেন। কৃষ্ণ যুদ্ধ-বিগ্রহ করছেন।

কিন্তু ঠাকুরকে মা রেখেছিলেন ঐ অবস্থায়। এর নিচে নামতে দিতেন না। তাঁর অবস্থা সব নজিরের জন্য। সমস্ত জগৎ জড়বাদের গাঢ় কুয়াসায় আচ্ছন্ন। এই সময় ঈশ্বরদর্শন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, এই সনাতন সত্যের আদর্শটি জগতে দেখাবার জন্যই ঠাকুরের এই অবস্থা। ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এই দৈবী চরিত্র যেন life belt (জীবনতরী) সংসারসমুদ্রে।

এই সব অবস্থা লোকের বিশ্বাস হয় না। বুঝতে হলে গুরুবাক্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন। গুরু মানে ঈশ্বর, অবতার, যেমন ঠাকুর। যারা কাশী গেছে তাদের কথাই কাশীর সম্বন্ধে শেষ কথা। তাদের মুখেই শুনতে হয় কাশীর কথা। কাশী মানে ঈশ্বরদর্শন।

মহিমাচরণ গুরু মানেন না। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই এই কথা বললেন। তিনি জ্ঞান বিচার করেন—অহংকারী লোক। সেইজন্য জ্ঞানীর লক্ষণও শোনালেন।

কিন্তু শঙ্করাচার্য গুরুকে ঈশ্বর বলে মানতেন। বলেছিলেন, 'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু। নাদ্বৈতম্ গুরুণাসহ।' বেদেও আছে 'যস্য দেবে পরাভক্তি যথাদেবে তথা গুরৌ।' ঠাকুর বলছেন, যার ঠিক, তার সবী তা'তে বিশ্বাস হয়।

কলিকাতা, ২৩শে আগস্ট ১৯৪২ খ্রী:,
৭ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, শনিবার, কৃষ্ণা নবমী, ৬০ দং।

তৃতীয় অধ্যায়

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসবে শ্রীম

১

কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। আজ এখানে সমস্ত দিনব্যাপী মহোৎসব। শ্রীম প্রাতঃকাল হইতেই একবার ঐ স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার অতি প্রিয় কেশবের আমন্ত্রণে এই মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছেন। তাই শ্রীমর নিকট এই স্থান অতি পবিত্র। তিনি সর্বদাই এখানে আসিয়া থাকেন আর বক্তৃতা শোনেন। আচার্যগণ প্রমথ সেন, নন্দলাল সেন প্রভৃতি বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন আর তাঁহার স্নেহ ভালবাসা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদরজে এই মন্দির শ্রীমর নিকট মহাতীর্থ। তাই দর্শন করিতে আসেন। আর বক্তৃতা শোনেন যদি বা শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত বক্তৃতার ভিতর দিয়া শ্রীমর তৃষিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, এই আশা। শ্রীম বলেন, ঠাকুরের একটি কথার জন্য তৃষ্ণার্ত চাতকের মত বসে থাকতাম তাঁর মুখপানে চেয়ে।

গত রাত্রিতেই শ্রীম ভক্তগণকে ঐ উৎসবে সকালে যোগদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাই জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন প্রভৃতিকে লইয়া অতি প্রত্যুষেই সমাজ-মন্দিরে গমন করিয়াছেন। মন্দিরে অবিরত কীর্তন ও বক্তৃতা হইতেছে। ভক্তগণ শুনিতেছেন।

তাঁহারাও শ্রীমর শিক্ষায় বক্তৃতার অনন্ত শব্দরাশির ভিতর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করেন—তাঁহার ভাব ভাষা ও বাক্য।

মন্দিরে আজ খুব ভীড় হইয়াছে। অভ্যন্তর ও বাহির লোকে লোকারণ্য। এখন সকাল প্রায় আটটা। শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীড়ে শ্রীমর খুব কষ্ট হয়। তাই পশ্চিমের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ষণ বসিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণও বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা শ্রীমর উপর। সমাজ-মন্দির পবিত্র হইলেও তাহার স্থান দ্বিতীয়। তিনি আসিতে বলেন, তাই তাঁহারা আসেন। এক্ষণে শ্রীমকে পাইয়াছেন, তাই মন্দির ত্যাগ করিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহাদের যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাহাও শ্রীমর মাধ্যমে।

শ্রীম বুকস্টলে দাঁড়াইয়া পুস্তকের নামসকল দেখিতেছেন। 'কেশব-বক্তৃতার ক্রম-সূচী' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখিয়া অন্তেবাসীকে উহা খরিদ করিতে বলিলেন। মূল্য তুই আনা। উদ্দেশ্য, যে সকল বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ রহিয়াছে সেইগুলি ভক্তদের বলিবেন পড়িতে। শ্রীম ভক্তদিগকে সর্বদা পূজা পাঠ জপ ধ্যান সেবা দ্বারা যুক্ত রাখেন ঠাকুরের সহিত।

বেলা এগারটা। শ্রীম নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট এখন কেহ নাই। তিনি একাকী। অন্তেবাসী ছাদে তাঁহার কুটীরে। শ্রীম তাঁহাকে ডাকিতেছেন, জগবন্ধু বাবু আছেন? একবার আসুন। ডাক শুনিয়া অন্তেবাসী তাঁহার ঘরে আসিয়াছেন। শ্রীম বলিতেছেন, ঠাকুরবাড়ী হইতে অনেক ফল মিষ্টি প্রসাদ আসিয়াছে। সকলকেই দেওয়া হইয়াছে। বাকী আছেন রজনী ও আপনি। এই ভাগটা আপনি এক্ষুনি মুখে দিয়ে ফেলুন। আর এটা রজনীবাবুকে দিবেন। বাড়ীর উপর-নিচ খুঁজিয়া রজনীকে পাওয়া গেল না। শ্রীম বলিলেন, তা' হলে, সোঽহং করে আপনিই খেয়ে ফেলুন। ঠাকুর করতেন এমন। কোনও ভক্তের জন্য প্রসাদ রেখে দিলেন। তিনি আর এলেন না। তখন সোঽহং করে নিজেই খেয়ে ফেললেন। (সকলের হাস্য)।

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে। পার্বতীচরণ মিত্রের প্রবেশ। সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গা। পার্বতীবাবুর ধর্মপত্নী নাগ মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। পতিপত্নী উভয়েই নাগমহাশয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। বাড়ীতে তাঁহারা সর্বদা নাগমহাশয়ের পূজা পাঠে নিরত থাকেন। যাহা নাগমহাশয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তাহা তাঁহারা খান। বাড়ীটি একটি আশ্রম। পার্বতীবাবুর দুই পুত্র ও পত্নী। ইনি অশ্বব্যবসায়ী হার্ট (Hart) কোম্পানীর ম্যানেজার। শ্রীম কয়েকবার অন্তেবাসীকে মিত্রগৃহে পাঠাইয়াছিলেন। একবার সংবাদ দিলেন, মঠে গিয়া মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গ করিতে। অন্তেবাসীকে মিত্রমহাশয় বলিয়াছিলেন, নাগমহাশয়ই আমার সর্বস্ব। আমি সাধুদের কাছে যাবার উপযুক্ত নই। এই কথা শুনিয়া শ্রীম চিন্তিত হইলেন।

এই চিন্তার কারণ সম্যক উপলব্ধি না হইলেও অন্তেবাসী অনুমান করিলেন সাধুসঙ্গের অরুচি। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবস্থা—গৃহাশ্রমী ভক্তগণ নিত্য সাধুসঙ্গ করিবে, তবে ধাত ঠিক থাকিবে। আগে 'ঈশ্বর পরে সব'— God first world second,—এই মহাসত্য ধরা পড়িবে। এখন ইহার ঠিক বিপরীত ভাবনাটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। এইটি মহামায়ার অবিদ্যা শক্তির খেলা। তিনি সত্যকে মিথ্যা দেখান। আর মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিভাত করেন। সর্বত্যাগী সাধুগণ এই নিত্য সত্য ও বিপরীত সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। তাই তাহারা পিতামাতা গৃহ পরিজন ছাড়িয়া প্রকৃত সত্যের পূজারী। তাহাদের সঙ্গ করিলে এই ভবব্যাধি দূর হইতে পারে। 'দুধকে' 'মাখনে' পরিণত করা যাইতে পারে। ঘরের 'কাজল' মনে রেখাপাত করিবে না। কচ্ছপের মত আঁড়ায় মন রাখিয়া জলে থাকা সম্ভব হইবে। না হলে, কোথা দিয়া স্নেহ মমতা অলক্ষ্যে উল্টা দিকে চালিত করিয়া দিবে। ঠাকুরের সর্বদার প্রার্থনা তাই, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিও না।

পার্বতীর উক্তি, আমি সাধুসঙ্গের উপযুক্ত নই—এই দীনতার

অন্তরালে যে মায়ের মূল অবিদ্যা শক্তি রহিয়াছে। তাহার উচ্ছেদ না হইলে, অথবা শরণাগতিরূপ বর্মাবৃত না হইলে অহংকার ধ্বংসের কবলে নির্মমভাবে নিক্ষেপ করিবে। এই মূল অবিদ্যার সন্তান অহংকারটিকে বশে আনিবার কৌশল শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করিলে ভক্ত সদাসচেতন থাকিতে পারে এই বিপরীত পথচারী ভ্রান্তিস্বরূপ অহংকাররূপী মহাশত্রুর।

নাগমহাশয় এই অহংকারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়। গৃহে থাকিলেও তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। তাঁহার দীনতা পাতালস্পর্শী, অথবা ব্রহ্মরূপী; 'অনোরনীয়ানের' কোলে আশ্রিত। যেমন ছিল স্বামীজীর অহংকার, 'মহতোমহীয়ানে'র সহিত সম্মিলিত। যার আকার ছিল বিশ্বরূপী, আয়তন ব্রহ্মপ্রসারী। ঋক্‌বেদের দেবীসূক্তের আবিষ্কর্ত্রী ব্রহ্মবিদুষী বাগ্‌দেবীর ন্যায় স্বামীজী ছিলেন ব্রহ্মভূত—'অহং রাষ্ট্রী', জগতের অধীশ্বর। নাগমহাশয় ও স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের দুইটি অদ্ভুত সৃষ্টি। একজন ছোট হইতে হইতে ব্রহ্মে দ্রবীভূত, অপরজন বড় হইতে হইতে পরব্রহ্মপ্রসারী।

এই উভয় মহাপুরুষ ব্রহ্মদ্রষ্টা। একজনের দীনতা আর অপর জনের মহতা—এই উভয়ই 'ব্রহ্মাম্ভোধি সমুদ্রবৎ'। তাই তাঁদের অহংকার এতো সরল সরস ও স্বাভাবিক।

কিন্তু সাধারণ জীবের অহংকার যায় না। তাই ঠাকুরের ব্যবস্থা ব্রহ্মদাস হইয়া থাকিতে। এই ব্রহ্মদাসত্বের জন্য নিত্য সজীব বলিষ্ঠ সাধুসঙ্গের প্রয়োজন।

আজও পার্বতীকে মাঝে মাঝে মঠে গিয়া সাধুসঙ্গ করিতে বলিলেন। পার্বতী কি বুঝিলেন কেন এই মহর্ষির তাঁহার জন্য অতো ভাবনা? শ্রীম-র হৃদয়দেবী মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ।

আগামী ১৫ই ভাদ্র পার্বতীগৃহে শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের উৎসব। সেই উৎসবের নিমন্ত্রণ করিলেন পার্বতীবাবুর পুত্র।

২

এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা বাজিয়াছে। স্বামী যোগেশ্বরানন্দ একজন সঙ্গীর সহিত আসিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালোরে মঠ করিয়াছেন। ইনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শিষ্যসন্তান। তাঁহার কলিকাতা আসিবার কারণ, শ্রীমকে দর্শন করা। শ্রীম তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে নিজের পাশে বসাইয়াছেন। শ্রীমর খুব আনন্দ আজ, তাঁহাকে দেখিয়া বহু দিনের পর। আনন্দে বাঙ্গালোরের ভক্তদের সংবাদ লইতেছেন শ্রীম।

এইবার কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানের সংবাদ লইতেছেন শ্রীম। বলিলেন, এইটি মঠের হাতে এলে ভাল হয়। নানা কথার পর শ্রীম পুনরায় পার্বতীবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (পার্বতীর প্রতি)—এই দেখুন এঁরা সব ছেড়ে কেবল ঈশ্বরকে ধরে রয়েছেন। ঠাকুর এই একটি ক্লাসের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা শুধু তাঁকেই চান, অন্য কিছু নয়। যেমন চাতক। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবুও অন্য জল খাবে না। চাই বৃষ্টির ফটিক জল। তেমনি এই সাধুরা। সংসারের অন্য আনন্দ নেবে না—চাই কেবল ব্রহ্মানন্দ। তাই কামিনী কাঞ্চন সব ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন—vantage ground-এ (অনুকূল স্থানে)। সেখান থেকে অগ্রসর হওয়া খুব সহজ। বাঁধা পথ।

হাজার সেয়ানা হলেও, কাজলের ঘর কিনা, কলঙ্ক লাগবেই। তাই যারা নিষ্কলঙ্ক, তাদের কাছে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করতে হয়। তবে ঐ কলঙ্কে কিছু খারাপ হয় না।

সাধুসঙ্গ চাই-ই। গৃহে থাকতে হলে সাধুসঙ্গ চাই। ঠাকুর বলেছেন, সাধুরও সাধুসঙ্গ চাই। তা' অপর গৃহস্থের চাই না? কেন না, তাদের ঘড়ি right (ঠিক) ঘড়ি। যারা গৃহে আছে তাদের ঘড়ি wrong (খারাপ)। স্নেহ মমতার আবরণ পড়ে যায়। মুখ দেখা যায় না আর্শিতে। 'আর্শি' মানে মনবুদ্ধি। সাধুদের আর্শি পরিষ্কার নির্মল। তাতে ভগবানের ছাপ পড়ে ভাল। তাই তাদের ঘড়ি right (ঠিক)। এটার সঙ্গে মিলিয়ে আনতে হয় মাঝে মাঝে।

হাজার ভক্ত হোক। তথাপি স্নেহের দাগ পড়বেই। এইটা বুঝা যায় সাধুদের কাছে গেলে। নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলেই হয়ে গেল। তখন অন্তর থেকে যথার্থ দীনতা আসে। আর সেইজন্য মনপ্রাণে সদা সর্বদা প্রার্থনা চলতে থাকে। এর পূর্বে যে দীনতা তা'তে অভিমান গুপ্তভাবে জড়িত থাকে। ঠিক ঠিক দীনভাব, বিনয় আসে না। এ দীনতা কি আর অপরের কাছে? ভগবানের কাছে। আর তাঁর স্বরূপ সাধুর কাছে। সাধুর কাছে যে দীন, সেই জগতে শ্রেষ্ঠ, জগৎপূজ্য। তাই সাধুসঙ্গ নিত্য দরকার। না পারলে মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে সাধুসঙ্গ করা চাইই।

শ্রীম (পার্বতীর প্রতি)—রবিবার তো অবসর। স্টীমার হয়েছে। বড়বাজার থেকে যাওয়া যায়। কি-ই বা সময় লাগে? সাধু-সঙ্গ করলে বুঝতে পারা যাবে, নাগমশায় কত বড়। সাধুরাও নাগ-মশায়কে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন।

সাধুরা আমাদের আপনার লোক কিনা। তাই এলে গেলে মানুষের কুটুম্, লোকে বলে। আপনার লোকও পর হয়ে যায় আনা-গোনা না থাকলে।

স্বামী যোগেশ্বরানন্দ—ঠাকুর তো অপরিবর্তনীয়। তিনি তো সকলের হৃদয়বিহারী। তা'হলে সাধুসঙ্গে কি হবে আর?

শ্রীম—তবুও তিনি চান, সাধুসঙ্গ করুক লোক। তা' না হলে সাধু করলেন কেন? বুড়ি চায় কিছুক্ষণ খেলুক। তারপর ছুঁবে। ছুঁলে তো আর খেলা চলে না, তাই।

সাধারণ লোকের তো আর আত্মবুদ্ধি নাই। তারা মনে করে, আমি সংসারী জীব। আফিসের বাবু আর ঘরে পিতা, ইত্যাদি। আমি ঈশ্বরের দাস, কিংবা সোঽহং এ সব মনে থাকে না। তাই সাধুসঙ্গে গেলে এইটে মনে করিয়ে দেয়। এটা ধরে চলতে চলতে তখন বুঝবে, হৃদয়ে ঠাকুর অপরিবর্তনীয়। তখন ঐ-টি নিয়ে পড়ে থাকা। তাঁর যখন ইচ্ছা হবে দর্শন দিবেন। যতক্ষণ ঐ-টা পাকা না হয় ততক্ষণ সাধুসঙ্গ দরকার।

আর একটি কথা ঠাকুর জোর দিয়ে বলতেন—গুরুবাক্যে বিশ্বাস॥ গুরু মানে ঠাকুর, অবতার। তিনি বলেছেন, মানুষের নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার। তাই করা। গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই।

সাধুসঙ্গে এটি হয়—গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়। সাধুসঙ্গ ছাড়া আমাদের উপায় নাই। তাই ঠাকুর অত জোর দিতেন সাধুসঙ্গের উপর। আবার সাধু যে নিজেই তৈরী করে গেলেন নিজে সাধুশ্রেষ্ঠ তবুও।

এটর্নি বীরেন বোসের প্রবেশ। তিনি প্রস্তাব করিলেন, আজ দক্ষিণেশ্বর গেলে হয়। শ্রীমর যাওয়ার ইচ্ছা আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামী যোগেশ্বরানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীকে লইয়া শ্রীম বীরেনের মোটরে দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। ফিরিলেন রাত্রি সাড়ে নয়টায়।

চারতলার ছাদে ভক্তগণ শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন—ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট অমূল্য, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বলাই, শান্তি প্রভৃতি।

শ্রীম ছাদে আসিয়া বসিলেন, বৃদ্ধ শরীর তাই tired (পরিশ্রান্ত)। ভক্তগণ তিন দিক ঘেরিয়া বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে। শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের শরীর থাকতে মনেই হতো না কষ্ট। দূরত্বজ্ঞান যে একেবারে মন থেকে বিলোপ পেয়েছিল। তখন মনে হতো, এ ঘর আর সে ঘর, যদিও পাঁচ মাইলের রাস্তা। আহা, কি আকর্ষণ তিনি প্রাণে ঢুকিয়ে দিছলেন। তাঁর ভালবাসায় পাহাড় উপড়ে যায়। এ তো আর মানুষের ভালবাসা নয়। অত ভালবাসতেন যে, ঐ ভালবাসায় সংসারের সকল যন্ত্রণার অবসান হয়ে যেতো, এই যন্ত্রণা-সমুদ্রের ভিতর বাস করেও। তাই এই দূরত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হবে, এ আর বেশী কথা কি? ভক্ত বুঝতেন, তিনিই প্রাণ তিনিই মন। কেবল শরীরটা মাত্র ঘরে থাকতো কলকাতায়। তা' হলে কেন কষ্ট বোধ হবে? একজনের প্রিয়জন, স্ত্রী পুত্রকন্যা পিতামাতা যদি ঘরে থাকে পাঁচ মাইল দূরে, আর সে কাজ করে কলকাতায় আফিসে, তা' হলে

কি তার দূরত্ব বোধ হয়, না কষ্ট বোধ হয় বাড়ীতে আসতে? বরং বাড়ীর প্রিয়জনের কথায় দূরত্ববোধ লোপ হয়ে যায়—কখন যাব, তাদের দেখবো এই প্রেরণায়, এই ব্যাকুলতায়।

এতে ভক্তদের বাহাদুরী নাই। তিনি ভালবাসাতে টানতেন, যেমন লোক নিজ সন্তানকে টানে তেমনি। তাই ভক্তদের টান তার ব্যাকুলতা। এ যে reflected light, borrowed attraction (প্রতিবিম্বিত রশ্মি, ধারকরা আকর্ষণ)!

কাল কাঁকুড়গাছি গিয়ে রামবাবুর কথা মনে হলো। আহা, কি ভালবাসা ঠাকুরের উপর! পরিবার পরিজন সব অন্যখানে রেখে নিজে পড়ে আছেন ঐ বাগানটিতে। যেই এক কথা মনে হলো অমনি আমার চোখে জল বেরুতে লাগলো—কত প্রেম! পুত্র-মিত্রকে ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য এই ভালবাসা। ঠাকুর থাকেন ওখানে, কাঁকুড়গাছি। ওখানে তাঁর সমাধি। তাই তাঁকে কোলে নিয়ে পড়ে আছেন। পূর্ণ সন্ন্যাস, একেবারে পূর্ণ বৈরাগ্য।

(সহাস্যে) কেউ যদি বলতো ও জায়গাটা খারাপ তা' হলে রেগে যেতেন। ঠাকুর রয়েছেন কি না! আমি একবার ধমক খেয়েছিলাম। বলেছিলাম, জায়গাটা বড় malarious (ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট)। অমনি এক ধমক। আহা কি ভালবাসা, কি গভীর প্রেম! ঠাকুরের অধিষ্ঠান ওখানে অত জীবন্ত।

কত ভালবাসায় এটি হয়? তাই ভক্তরা ভালবাসায় কেনা। সাধারণ লোকের কাছে অবতারলীলা প্রকটিত হয় ভক্তদের এই ভালবাসা দেখে। সাধারণ লোক গৃহ পরিজনকেই আত্মীয়, আপনার বলে। তাই তাদের জন্য সর্বস্ব বিতরণ করে দেয়। এমন যে প্রিয় প্রাণ তা' পর্যন্ত উৎসর্গ করে হাসিমুখে। কিন্তু ভক্তদের স্বভাব, অবতারের অন্তরঙ্গদের স্বভাব, তার বিপরীত। তাঁরা সর্বস্ব, প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেন ভগবানের জন্য, অবতারের জন্য। এই দু'টি বিপরীত স্রোতই জগতে চলে আসছে অনন্তকাল—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি।

জগৎটা খসে যায় ভগবানের টানে মন থেকে বেঙ্গাচির লেজ খসার মত। এ কি আর ইচ্ছা ক'রে করে? তা' নয় আপনি খসে যায়।

সংসারী লোকের মনরূপ ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ হাব্জাগোব্জাতে, জাগতিক ভোগের বিষয়ে। অন্তরঙ্গদের মনভাণ্ডটি, ভগবৎ পীযূষে।

কেন এটি করেন তিনি এরূপ—একটি বিষয়পূর্ণ, অপরটি প্রেমপূর্ণ? এর উত্তর দিয়েছেন ঋষিরা, তাঁর খেলা। অর্থাৎ আমরা জানি না। বিষয়পূর্ণ মনে দুঃখ, প্রেমপূর্ণ মনে সুখশান্তি আনন্দ। তুমি যদি দুঃখের ভাণ্ডটি ছেড়ে সুখপূর্ণ ভাণ্ডটি পেতে ইচ্ছা কর তবে এঁদের সঙ্গ কর, এঁদের সেবা কর। এঁদেরই নাম সাধু। অবতারের পার্ষদগণ সব সাধু, মহাত্মা।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন। শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে একটা জিনিস দেখলাম। সমগ্র বাগানটিতে একটা প্রেমের বন্যা দেখতে পেলাম। বৃক্ষলতা বাড়ীঘর মানুষ, সব সেই দিব্য প্রেমে তৈরী। প্রেমের বন্যায় সব ভাসছে। মরছে না। সব জ্যোতির্ময়। আনন্দে সব খেলছে। রাত্রি সাড়ে দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২৪শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
৮ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। রবিবার, কৃষ্ণা নবমী ১।৫৮ পল।

চতুর্থ অধ্যায়

তুমি অন্য কোথাও যাবে না, শুধু এখানে আসবে

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীমর কক্ষ। সকাল আটটা। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। মুকুন্দ আসিয়াছেন। ইনি রামপুরহাট স্কুলের রেক্টার, ছাত্রাবস্থা হইতে শ্রীমকে বড় ভালবাসেন। মুকুন্দ ও অন্তেবাসী শ্রীমর বাম হাতের বেঞ্চেতে বসিয়াছেন। শ্রীমর হাতে কেশব

সেনের বক্তৃতার কালানুক্রমিক একটা সূচী। তিনি তাহার পাতা উল্টাইতেছেন। তাঁহার নয়নে ও মুখমণ্ডলে আনন্দের ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর স্মৃতি-সাগরে শ্রীমর মন নিমজ্জিত। কেশবের স্মৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধিত। শ্রীম আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, ভক্তদের ঐ আনন্দ পরিবেশন করিতেছেন। আজ ২৫শে আগস্ট ১৯২৪ খ্রীঃ, ৯ই ভাদ্র ১৩৩১ সাল। সোমবার, কৃষ্ণা দশমী, ৭।৩ পল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমরা কেশববাবুর লেকচারে অনেক সময় যেতাম কিনা। তখনো সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। পড়বার সময় থেকেই যেতাম। স্কুলে পড়ি তখন—সেকেণ্ড ক্লাস হবে। পরিচয় করিয়ে দেন ঠাকুর স্বয়ং। তাঁদের বাড়িতেই প্রথম introduction (পরিচয়) করিয়ে দেন তিনি। ঠাকুর তাঁদের বাড়ীতে এসেছেন। সঙ্গে রয়েছি আমরা। আমাকে দেখিয়ে কেশব সেনকে বললেন অনুযোগের সুরে, 'আচ্ছা বল দিকিনি, ইনি যান না কেন ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে)? এদিকে বলছে সংসারে মন নাই।' যাতে কেশববাবু বলেন আমাকে যেতে, তাই এই অনুরোধ আর অভিযোগ। কি আশ্চর্য বল দেখি? কেশববাবুকে সুপারিশ করতে বলছেন প্রকারান্তরে। কেন, আমার যাবার জন্য অত ব্যস্ত? আপন জন কিনা, পিতা যে তিনি। Scattered flockকে (দলের বিক্ষিপ্তদের) একসঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করবেন কিনা। নইলে তাঁর নরলীলা চলে না। তাঁর অবতার হয়ে আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভক্তসঙ্গে লীলাপ্রকাশ। জগদম্বা বিশ বাইশ বছর পূর্বে দেখিয়ে দিয়েছেন যারা তাঁর লীলা-সহচর। তাই অত ভাবনা তাদের জন্য।

তারপর আরো পরিচয় পেলেন ঠাকুর ও কেশব সেন। আমি যেখানে বিয়ে করেছি তাঁদের সঙ্গে connected (সম্বন্ধিত) কেশব সেন। কেশব সেনের পিতামহরা কয় ভাই ছিলেন। একটা লাইনে কেশববাবুরা। আর একটা লাইনে ওঁরা। কলুটোলার সেন ওঁরা সব।

ঠাকুর কিন্তু আমাকে ধরে নিয়েছিলেন প্রথম থেকেই ব্রাহ্মসমাজের

লোক বলে। তাই তাঁর কাছে গেলে প্রথম প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের কথা বলতেন, 'কেশব সেন কেমন আছেন। শুনতে পাচ্ছি তাঁর অসুখ করেছে।' (নয়নহাস্যে) আমিও তেমনি উত্তর করলুম, আমার তেমন যাওয়া আসা নাই। আমিও শুনেছি তাঁর অসুখ করেছে। এ কথা শুনে ভাবলেন, ও-ও, তা' হলে এ যায় না।

একদিন বলছেন, এখানেও নিরাকার আছে। মানে, এখানেও সব রকম হয়ে গেছে—সাকার নিরাকার সব। আরও কত কি! সব ভাবে তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছেন কিনা। আর ঈশ্বরকে পেয়েছেন কি? তিনি যে নিজেই ঈশ্বর। এখন মানুষ হয়ে এসেছেন। এখন লীলা কিনা। তাই ভক্তের ভাবে কথা বলছেন। সব রকম সাধন করেছেন, খ্রীস্টান, মুসলমান পর্যন্ত। আর হিন্দুধর্মের তো কথাই নাই। বেদ পুরাণ তন্ত্র সকল সাধনে সিদ্ধ। তাই বলতেন, এখানেও নিরাকার আছে। ব্রাহ্ম সমাজের এরা, নিরাকার নিরাকার করে কি না। আমায়ও ঐ ধরে নিয়েছিলেন (শ্রীমর প্রবল হাস্য)।

একবার পূজার সময় কয়দিন খুব যাওয়া আসা করেছিলাম কেশববাবুর ওখানে। শুনে ঠাকুর চিন্তিত হয়ে গেলেন। সস্নেহ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তুমি অন্য কোথাও যাবে না, শুধু এখানে আসবে।

বলবেন না, আপনার বাপ-মা যে! ছেলে যদি বিগড়ে যায় তাই ভয়। ভক্তরা মায়ের লোক কিনা—অন্তরঙ্গরা। তাই পূর্বেই মা এদের এনে দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এরা সব আমার লোক। তোমার কাছে আসবে। এদের সঙ্গে মিলিত হলে, ঈশ্বরীয় কথা কইলে শান্তি পাবে। তিনি আরতির সময় কুঠীর ছাদে উঠে, চীৎকার করে বলতেন, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়রে। আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে কামিনী কাঞ্চনের জ্বালায়। তাই তাদের দেখে চিনে ফেলেছিলেন এরা আমার আপনার জন।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'তুমি অন্য কোথাও যাবে না। শুধু এখানে আসবে'—কত ঘোর-পাক কমিয়ে দিলেন এই কথাটি বলে। তাই গুরুর ঋণ শোধ হয় না—অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আমাকে পরীক্ষার জন্য এক এক বার জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর দাম। দেখছেন কতদূর হলো। ভক্তরা কতটা তাঁকে বুঝতে পারছে। এক একবার ইঙ্গিত করতেন কিনা—আমি ঈশ্বর এসেছি অবতার হয়ে। দেখতেন, ভক্তরা ধরতে পারছে কিনা।

একদিন বললেন, আচ্ছা, কেশব সেনের দলটল টেকবে কি, কি বল ? আমিও তেমনি। উত্তর করলাম, টিক্‌তো যদি এখানে বেশী আনাগোনা করতেন। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ওখানে তো অনেক লোক যায়। এখানে আর কয়জন আসে। আমি উত্তর করলাম, তেমনি লোক যায়। শুনেই খুব হাসলেন। বললাম, যারা কেবল ঈশ্বরকে চায় তারাই এখানে আসে (শ্রীমর বিলম্বিত হাস্য)।

এক একটা procedure adopt (প্রণালী গ্রহণ) করতেন। যদি দেখতেন যে হলো না এটায়, অমনি আর একটা ধরতেন।

এতো তো জ্বালাতন আমরা করেছি। কিন্তু একটুও রাগ বা বিরক্ত হন নাই। তিনি জানতেন কিনা human weakness (মানুষের দুর্বলতা)! এই up-bringing, environments (লালন-পালন, প্রতিবেশ) যায় কোথায়।

কত জ্বালাতন করেছে ভক্তরা। তাদের শিক্ষার জন্য তাঁকে কত নামা নামতে হয়েছে। একদিন রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে হাঁটু গেড়ে নমস্কার করলেন। এই তো অত কোমল শরীর। বড্ড সুকোমল ছিল তাঁর শরীর। 'ইংলিশম্যানদের' শিক্ষার জন্যেই এটা করলেন। তারা হাত জোড়ে নমস্কার করে। কিন্তু ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয়। ইংলিশম্যানরা কালীঘরে বসে জপধ্যান করছে শুনলে বড় আহ্লাদ করতেন ঠাকুর।

একদিন বললেন, একবার এ গাঁ থেকে ও গাঁ যাচ্ছি। সঙ্গে হৃদু। নদীর তীরে একটা মস্ত বড় পাথর দেখলুম। ওমা! যতই এগুচ্ছি দেখছি পাথরটাও চলছে। হঠাৎ ধপ করে জলে পড়ে গেল। এই শুনেই তো আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। পাথর আবার হাঁটতে পারে, জলে পড়ে! Rationalist (যুক্তিবাদী) কিনা

ভক্তরা। তিনি তখন হাসতে হাসতে বললেন, মথুর কিন্তু বলেছিল, বাবা অন্যে বললে বিশ্বাস করতুম না। তুমি বলছো তাই বিশ্বাস করছি (শ্রীমর তরঙ্গায়িত হাস্য)।

(কিঞ্চিৎ ভাবনার পর) একদিন একজন সাধুকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ এই দেখ, এই সাধুটি কেমন মা কালীকে চিন্তা করে এলো। (উদ্দাম হাস্যের সহিত) rationalist (যুক্তিবাদী) উত্তর করলে, ও তো তা' করবেই। মন যত দিন বহির্মুখ ততদিন তো কালী আছেই। এই কথা শুনে তিনি আর একটি কথাও বললেন না।

(একটু স্মরণ করিয়া) আর একদিন আর একজনকে বললেন, মা কালীর ওখান থেকে প্রণাম করে এসো। তিনি বললেন, আপনাকেই তো দেখছি। ওখানে গিয়ে কি হবে ? ঠাকুর বললেন, আমি যাকে ভক্তি করি তাঁকে ভক্তি করতে হয়।

শ্রীমর আনন্দচাঞ্চল্য দূর হইল। ক্রমশঃ তাঁহার স্বভাব-গম্ভীর ভাব ফিরিয়া আসিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ নীরব বসিয়া রহিলেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'কুহেলিকা'র মানে কি ?

মুকুন্দ—বোধ হয়, illusion (ভেল্কী)।

শ্রীম 'বোধহয়ে'র কর্ম নয়। আমরা যে positivist (প্রত্যক্ষবাদী)।

স্বামী যোগেশ্বরানন্দের কথা উঠিয়াছে। ইনি বাঙ্গালোর হইতে আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। গতকাল দর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বীরেনের মোটরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়াছিলেন। ইনি রামবাবুর প্রশিষ্য আর স্বামী সুরেশ্বরানন্দের শিষ্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, বই দেখাইয়া)—সুরেশ্বরানন্দ এই সবগুলি লিখেছে। কিন্তু মানুষ আজকাল বড় যেয়ানা হয়ে গেছে। Speculation (অনুমান) চায় না। এখন authority (প্রমাণ) চায়। শুনে পরমহংসদেব বলেছেন, তা' হলে নেবে। এটাতেও আছে হয়তো তাঁর authority (নজীর)।

রামবাবুর সন্তান সুরেশ বাঙ্গালোরে মঠ করেছে independently (স্বাধীনভাবে)। মিশনের নয়। কাজ করছে খুব। তা' না আবার একটা খুলেছে হায়দাবাদে ব্রাঞ্চ।

যোগেশ্বরানন্দ এখানে এসেছিল। বলছে, আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। বলছে, আপনাকেই দেখতে এসেছি।

কাঁকুড়গাছীতে উৎসব হয়ে গেল। কিন্তু যায় নাই। ওরা সব নানান কথা জিজ্ঞাসা করবে বলে। আমরা বললাম, অন্য দিন গেলে হয়। একবার দেখে, ঠাকুরকে নমস্কার করে মার দৌড়। ওখানকার লোক ওখানে যায় না।

২

রাত্রি আটটা। মর্টন স্কুলের ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে বেঞ্চেতে বসা ভক্তগণ—বড় জিতেন, জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, ডাক্তার, ছোট রমেশ প্রভৃতি। ছোট রমেশ শ্রীমর ভাগ্নীর ছেলে। কলেজে পড়ে। নরম প্রকৃতি। একটু এলোমেলো স্বভাব। তাহার শিক্ষা চলিতেছে।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—এখন থেকেই একটু methodical (সুশৃঙ্খল) হও। দু' পয়সা দিয়ে একটি ফাইল কেনো। তোমার ফাইল আছে না? (রমেশ না, বলিলে) তাই একটি কেনো। ওতে লিখে রাখবে টেলিফোনের নম্বর, বড় অমূল্য-বাবুর আর ডিকেন্সের গুদামের।

বড় জিতেন—এখানে কিছুদিন ঘর করলে পাকা হয়ে যায়।

শ্রীম—শুধু তা' নয়। Idealistও (আদর্শবাদী) Realist (বাস্তববাদী) হয়ে যায়।

একটা জাহাজ সমুদ্রে গিছলো। অনেক দূর গেছে। তখন জাহাজের সব লোহা আলগা হয়ে যেতে লাগলো। কোথাও দূরে চুম্বকের পাহাড়। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলে বললে, কোথাও চুম্বকের পাহাড় আছে। তা'তে টানছে। তেমনি ঈশ্বরের দিকে যাদের মন

সর্বদা তাদের সব কাজকর্ম শিথিল হয়ে যায়। ঈশ্বর চুম্বকের পাহাড় কিনা। যতক্ষণ তা' না হচ্ছে ততক্ষণ কি করবে? কর্ম করতে হবে না?

মোহন—আচ্ছা, পাশ্চাত্যের লোকদের যে এই অদম্য কর্মপ্রেরণা শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্যে, একদিন কি তাদেরও কর্মসন্ন্যাস লাভ হবে কেবল এই কর্ম করে করে?

শ্রীম—তা' কেমন করে হবে? কর্মযোগ যদি করে তবেই কর্মসন্ন্যাস হবে। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম যদি করে তবে হবে। নইলে তো কর্ম বেড়েই চলবে। মনে নিবৃত্তি ভাবনা এলে তো নিষ্কাম কর্ম করে। এ ছাড়া কর্মের ফল অনন্ত কর্মবৃদ্ধি। অনন্ত জন্ম মৃত্যু গ্রহণ করতে হবে। স্বামীজী ওদেশের পাশ্চাত্যের লোকদের বলেছিলেন কর্ম কর কর্মের জন্য, এর ফল ভোগের জন্য নয়। Work for work's sake—not for self enjoyment's sake. এরা ঈশ্বরার্থ কর্ম করা বোঝে না। তাই ঐ আদর্শ দিলেন।

সোজা কথায় ত্যাগ করতে হবে কর্মের ফলটি। এই ত্যাগের এমনি অমোঘ ফল উহা সত্যের দিকে টেনে নেবে, ভগবানের দিকে।

পরোপকার বুদ্ধিতে করলেও কর্মক্ষয় হয় না। অনেকটা উপরে নিয়ে যায় বটে। কিন্তু নিঃশেষ হয় না। কৃষ্ণদাস পালকে আর বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও এই একই কথা বলেছেন। এ কর্ম ভাল বটে কিন্তু ঈশ্বরলাভ হবে না। তাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না এই কর্মেও। তাই শাশ্বত শান্তিলাভ হয় না। ঐ-টি লাভ করতে হলে উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ আদর্শটি রাখতে হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কথাটিই বলতে গিয়েছিলেন ঠাকুর—ঈশ্বরার্থ কর, তা'তে ঈশ্বরলাভ হবে।

মোহন—গান্ধী মহারাজের কর্মের উদ্দেশ্যও তো পরোপকার, দেশের স্বাধীনতালাভ, দরিদ্রের অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এ দ্বারা কি চিত্ত শুদ্ধ হবে, তারপর ঈশ্বরলাভ হবে?

শ্রীম—গান্ধী মহারাজের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তিনি ঈশ্বরকেই

রাম বলেছেন। রামের দর্শনের জন্য এই কর্ম, দেশসেবার জন্য নয়। এটা উপায়, উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

মোহন—দেশের জন্য যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাঁদের এই ত্যাগের কি ফল হবে ?

শ্রীম—দেশ স্বাধীন হবে। লোকের উপকার হবে। গরীবের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু ঈশ্বরলাভ হবে না। তবে এ ত্যাগে এঁদের অনেকটা এগিয়ে দিবে, সাধারণের থেকে এঁরা অনেক উচ্চে। ঐ উচ্চে উঠে ঈশ্বরের সন্ধান সহজে হতে পারে। ত্যাগের দ্বারা পথটা ঠিক হয়ে রইল, মনটা তৈরী হয়ে রইল। এর পর যদি নিবৃত্তি-বুদ্ধি আসে, আর ঈশ্বরে প্রবৃত্তি হয়, তা' হলে এঁরাও ঈশ্বরদর্শন করবেন। অরবিন্দবাবু পলিটিক্স করে কত ত্যাগ করলেন। শেষে ঈশ্বরপ্রাপ্তি আদর্শটি নিয়েছিলেন, তখন শান্তি আনন্দ সিদ্ধি।

পরদিন অপরাহ্ন। শ্রীমর কক্ষ। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন। অন্তেবাসী বেঞ্চেতে বসা উত্তরাস্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রবন্ধাবলীর দ্বিতীয় স্তবক বলিয়া যাইতেছেন। অন্তেবাসী উহা লিখিতেছেন।

কথামৃত ছাপা হইতেছে। শ্রীম খুব ব্যস্ত। আজ সকালে অন্তেবাসীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরবাড়ী যান। সারাদিন সেখানে ছিলেন। অন্তেবাসী শ্রীমর আদেশে বার রিম কাগজ 'বাণী প্রেসে' দিয়া স্কুল-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম তিনটার সময় মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন কথামৃতের পরিশিষ্ট লেখা হইতেছে।

ভক্তগণ আসিয়া ছাদে বসিয়া আছেন। ঘরে দ্বিতীয় স্তবক লেখা হইতেছে। সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা। লেখা হইলে অন্তেবাসী ও শ্রীম ছাদে আসিয়া বসিলেন। অন্তেবাসী ভক্তগণকে উহা পড়িয়া শুনাইতেছেন। অর্দ্ধেকটা শুনিয়া ডাক্তার বিনয় ও ছোট অমূল্য কাশীপুরের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। আর শ্রীম ভক্তসহ উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। পাঠ চলিতেছে।

পাঠক—(শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, বিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক বাগ্মী

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে`) দেখ, আমি ও আমার এটির নাম অজ্ঞান।...
...এ স্ত্রীপুত্র পরিবার সব তোমারই জিনিস, জ্ঞানীর এসব কথা। আমার জিনিস আমার জিনিস বলে সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া।

শ্রীম—ঠাকুরই তাই ভক্তদের বলেছিলেন, নিজের ঘরে ঈশ্বরের দাসী হয়ে থাক। তা' হলে এই অজ্ঞানের হাত থেকে, মায়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পার। কেবল মুখে বললে হবে না 'দাসী'। কাজে করতে হবে। সারাদিন কাজ করা, কিন্তু benefit (ভোগ) না নেওয়া। গৃহস্থের বাড়ীতে যেমন দাসীর নিজ হাতে কিছু নেবার অধিকার নাই, কিন্তু দিনরাত কাজ করে, তেমনি ভাবে থাকা। ধনাদি সব দেবসেবায় সাধুসেবায়, দরিদ্র-নারায়ণসেবায় বার আনা লাগাতে হয়। চার আনাতে পরিবার পরিজনের সেবা করা।

কিন্তু সর্বদা সাধুসঙ্গ না করলে এ ভাব থাকেনা, স্বার্থপরতা এসে ঢেকে ফেলে। ঠাকুর ভক্তদের কারু কারুকে নিজ গৃহে দাসীর ন্যায় থাকতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আপন হাতে তৈরী করে গেছেন, নজীরের জন্য। একজন গৃহস্থ ভক্তকে বলেছিলেন, জগদম্বা আমাকে বলেছেন তোমাকে দিয়ে তাঁর একটু কাজ করাবেন, লোকশিক্ষার কাজ। আবার তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এককলা শক্তিও দিয়েছেন। ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া লোকশিক্ষা হয় না তাই। (সহাস্যে) সেই ভক্তটির ইচ্ছা সন্ন্যাস নেওয়া। অল্পবয়সেই বুঝেছে সংসার কঠিন স্থান। তাই সন্ন্যাস নিতে প্রবল ইচ্ছা।

একদিন সন্ধ্যার পর সমাধি থেকে নেমে ভক্তকে ধমক দিলেন। ঘরে কেউ ছিলনা। বললেন, কেউ মনে না করে, মায়ের কাজ বাকী থাকবে। মা একটা তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য তৈরী করেন। এই কথা শুনে ভক্ত জগদম্বার ইচ্ছাই মাথা পেতে নিলেন।

আবার বলেছিলেন, মা একে ঘরেই যখন রাখবি তখন মাঝে মাঝে তুই দেখা দিস। নইলে কেমন করে থাকবে মা।

একজন ভক্ত—এই ভক্তটির শেষটা কেমন হলো, দাসীর মত ছিলেন ?

শ্রীম—এখনও তিনি বেঁচে আছেন। শেষটা এখনও বাকী (হাস্য)। এই ভক্তটিকে আবার তান্ত্রিক সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। বাবুরামকে তান্ত্রিক সন্ন্যাস দেন এক সঙ্গে। ঐ ভক্ত বারবার ঠাকুরকে বিরক্ত করতেন সন্ন্যাসের জন্য। কিন্তু মায়ের আদেশে তাঁকে ঘরে রাখলেন। কিন্তু চার দিকে সব সুবিধা করে দিলেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাস দিলেন, জগদম্বাকে মাঝে মাঝে দর্শন দিতে বললেন, কত কি? তাঁরা যে মায়ের লোক। এদের দিয়ে লোক শিক্ষা দিবেন যে! তাই অত ভাবনা তাঁর।

মর্টন স্কুল ২৬শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
১০ই ভাদ্র, ১৩৩১। মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশী ১১।৪৭ পল।

পঞ্চম অধ্যায়

আনন্দময়ীর ছেলে আনন্দ কর

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীমর কক্ষ। সকাল আটটা। শ্রীম বিছানায় বসা। অন্তেবাসী বেঞ্চেতে। তাঁহার শিক্ষা চলিতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—'কথামৃতের' কপি পাঠাতে হবে। তা' পিয়নবুকে লিখে পাঠিয়ে দিন। রাজসিক লোকের সঙ্গে রাজসিক ব্যবহার করতে হয়। পিয়নবুকে পাঠালে তার effect (ফল) বেশী হবে। মনে করবে ওরা businesslike and methodical. (বৈষয়িক বিষয়ে সুনিপুণ আর শৃঙ্খলাপরায়ণ)। তা'তে যত্ন নিবে।

সংসারে কর্ম করা বড় কঠিন—ঠিক ঠিক কর্ম। ঈশ্বরার্থে কর্মই ঠিক ঠিক কর্ম। কিন্তু যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, যারা নিজের জন্য কর্ম করে ফল ভোগ নিজে করে, তাদের খুব methodical (সুশৃঙ্খল) হতে হয়।

দেখুন না ওয়েস্টের ওদের কর্ম। একটুও খুঁত নাই। মনপ্রাণে কর্ম করে। বাইরেটা তাদের খুব ঠিক। ভিতরটার সঙ্গেই ভেদ।

ভক্তরা করে ঈশ্বরার্থে, তারা করে স্বার্থে। ওদের কাছ থেকে আমাদের বাইরেটা শেখা উচিত। ওরাও ক্রমে ভিতরে ঢুকবে। ক্রমে ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে। প্রথমে সকাম হবে, তারপর নিষ্কাম।

যেখানে যা ভাল সেখান থেকে তা' নিতে হয়। তবে হৃদয় উদার হয়। মধুকরের মত সব ভাল গ্রহণ করে একটি সুন্দর মধুচক্র রচনা করা। তারপর সেটি ঈশ্বরার্থে সমর্পণ।

অন্তেবাসী পিয়নবুকে লিখিয়া কপি পাঠাইতেছেন। শ্রীম উহা চাহিয়া লইলেন। দেখিতেছেন। বলিলেন, এই দেখুন এখানে 'ফুলস্টপ্' দেওয়া হয় নাই। আর 'also'র ('অলসো'র) 'এ'টা capital (বড় হাতের) হবে।

এখন বেলা এগারটা। আজও কথামৃত লেখা হইবে। শ্রীম বলিবেন, কিন্তু ছোট অমূল্য লিখিবেন। অন্তেবাসী স্কুলেও পড়ান। তাই তাঁহার সময় হইবে না আজ লেখার। ছোট অমূল্যকে দেখাইয়া শ্রীম বলিলেন, এই ইনি লিখবেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী শ্রীম 'বসুমতী' নামক মাসিক পত্রে বাহির করিতেছেন। লেখা শেষ হইলে পুনরায় উহা অন্তেবাসীকে কপি করিতে বলিলেন।

সন্ধ্যায় ভক্তসভা বসিয়াছে ছাদে। বড় জিতেন, জগবন্ধু, ডাক্তার বিনয়, শান্তি, বলাই, ছোট অমূল্য, ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, মোটা সুধীর প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমর সামনে তিনদিকে বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে। শ্রীম বসা উত্তরাস্য চেয়ারে। ধ্যানের পর একথা সেকথা হইতেছে।

জগবন্ধু (শ্রীমর প্রতি)—কেউ কেউ বলে 'কথামৃতে' পুনরুক্তি রয়েছে।

শ্রীম—যার পুনরুক্তি ভাল লাগে না বুঝতে হবে তার ভক্তিলাভ হয় নাই। Words of Eternal Life (অমৃতত্বের বাণী), তার কি আবার পুনরুক্তি আছে? নির্দোষ কেবল অমৃতত্ব, ঈশ্বর!

আহা, কি বলবো! আপনারা অবতারকে দেখেন নাই। দেখলে

মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর সবই সুন্দর। তাঁর ওঠা বসা, চলন বলন, স্নানাহার, শয়ন স্বপন, ভালবাসা, তিরস্কার, মৌন ও কথন, সবই সুন্দর! সুন্দর সরস ও মধুর! তাঁর সবই মধুর! 'ছাতাটা আন' এ-ও সে অমৃতের ঝরনা! মানুষে কি এ সম্ভবে!

রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ। এগুলি যতক্ষণ, ততক্ষণই মন। মন থাকলে সুখ দুঃখ, ভালমন্দ বিচার থাকে। তাই অধর সেনের দেহত্যাগ হলে কেঁদেছিলেন ঠাকুর। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, মা কেন আমায় ভক্তি দিয়ে বেঁধে রাখলে? ভক্তিতে মন নিচে থাকে। তাই ভক্তের জন্য শোক। ভক্ত বেঁচে থাকুক এই ইচ্ছা। কেশবের কিছু হলে, কার সঙ্গে তোমার কথা কইব মা, কলকাতা গেলে? অন্তরঙ্গরা তখন তাঁর কাছে তেমন যায় নাই। অতুলনীয় পুরুষ! তাঁর তুলনা তিনি নিজে।

শ্রীম (মোটা সুধীরকে লক্ষ্য করিয়া সকলের প্রতি)—আর ভাবনা নাই। এটা খুব বোঝা যাচ্ছে। তিনি আমাদের শরীরটার জন্যও ভাবছেন। আবার আত্মার জন্যও। দেখুন না, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, আবার সূর্য চন্দ্র শস্যাদি, এ সবই এই দেহের জন্য। আবার আত্মার জন্য অবতারকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিছু ভাবনা নাই। শিস্ দিয়ে চল। আনন্দময়ীর ছেলে! নিরানন্দ কেন? আনন্দ কর, আনন্দ কর।

কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (আকাশে তারার দিকে দৃষ্টি)—ঐ দেখুন, ওরা আমাদের neighbours (প্রতিবেশী)। আমরা এদের জানি না বলে কি এ নয়? শ্যামবাজারে কোন বাড়ীতে কি করছে, তা আমরা জানি না বলে কি তারা নয়?

তবে ও কথা (ঈশ্বরলাভ) বললে, 'দাদারও ফলার'। জানেন তো গল্পটা? একটা ব্যাঙ্ খুব খেয়েছে। পেটটা মোটা হয়ে গেছে। সেই সময় নদী দিয়ে একটা মরা গরু ভেসে যাচ্ছে। পেটটা বায়ুতে খুব ফুলে উঠেছে। ব্যাঙ্ ঐটা দেখে বলছে, ও দেখছি 'দাদারও ফলার'।

ব্যাঙ্ মনে করেছে খেয়ে খেয়ে গরুর পেটটা এরই মত মোটা হয়ে গেছে। (হাস্য)। তাই তারও আমারই মত কষ্ট।

(তারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বগত) তোমার যে দশা আমারও সেই দশা। তাঁর কৃপায় এই বুঝতে পেরেছি যে, আমরা তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বসে আছি।

ঋষিরা বলছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তাঁর ঠিকানা পায় না। দেবী ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে, জগদম্বার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। দ্বারী বলছে, অপেক্ষা কর। তুমি ক' মুখো ব্রহ্মা? ব্রহ্মা বললেন, চারমুখো। ও বললো, ও-ও, তুমি চারমুখো ব্রহ্মা? দাঁড়াও, অপেক্ষা কর। পঞ্চাশমুখো ব্রহ্মা ভেতরে দেখা করতে গেছেন। তুমি কোথাকার? ছোট ব্রহ্মাণ্ডের বুঝি?

এমনতর ব্যাপার। তারও বাড়া, তারও বাড়া আছে। কিন্তু তাঁর বাড়া কেউ নাই। স্বয়ম্ভু।

সকলে নীরব। আবার কথাপ্রবাহ।

বড় জিতেন—মহম্মদের life (জীবনী) লিখেছেন একজন। কি সুন্দর বর্ণনা মৃত্যুর।

মৃত্যুর কিছু কিছু বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমর মন অন্যত্র।

শ্রীম—আহা, ঠাকুরের বর্ণনাটি বেশ। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লো। তখন মার মাই থেকে মুখটা আলগা হয়ে গেল। এইটে মৃত্যু—মার মাই খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়া। কেন লোক horrible (ভয়ঙ্কর) মনে করে মৃত্যুকে। দূর থেকে ঐরূপ দেখায়! কাছে গেলে, কিছুই না। ঐ, মার মাই থেকে মুখ সরে যাওয়া।

Amateur religion-এ (সখের ধর্মে) কি হয়? চোগা চাপকান এঁটে আফিস্ করলাম। এরই মধ্যে একদিন সকলে বসে একটু আমোদ করলাম ঈশ্বরের নামে। এরূপ amateur religion-এর (সখের ধর্মের) কর্ম নয়।

বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা? মন বুদ্ধি, এ যে বহির্মুখ অবস্থা। তাইতো যোগীরা অষ্টাঙ্গ সাধন করেছেন। যম নিয়মাদি পালন করা

চাই। তা' না হলে ধর্ম হয় না। এগুলো morals (নীতি)। সব ধর্মেতেই রয়েছে। ধর্মের প্রথম পাদ যম নিয়ম—morals (নীতি)। এ যার নাই তার ধর্ম বৃথা।

তাই বসে বসে ঠিক সময় করে তাঁকে ডাকতে হয়। অন্তরে তাঁকে খুঁজতে হয়। ধ্যান করতে হয়। তা' না হলে করলেন কেন যোগীরা এসব?

আমি খুব বুদ্ধিমান। বুদ্ধি দ্বারা মেরে দিবে? কাকও ভাবে, আমি খুব শেয়ানা। কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে।

Mutual Admiration Society (পরস্পর স্তাবক সমিতি) করে কি হবে? আপনি বড়! না, আপনি বড়! আহা, আপনার কি বুদ্ধি!—বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায়?

ঠাকুর একজন ব্রাহ্ম ভক্তকে বলেছিলেন, আপনি একটু ডুব দাও। ডুব দিলে অনেক রত্ন মাণিক পাওয়া যাবে। উপরে উপরে ভাসলে কি হবে?

তিনি অন্তরে বাহিরে। বাহিরে দেখছ। এবার অন্তরে দেখ।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, অর্জুন তুমি যোগী হও—"তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন।"

তা' হলে আর 'গু' খেতে হবে না। 'গু' মানে কামিনী কাঞ্চনের বেড়া। এর ভিতর থাকতে হবে না।

এমন যে কেশব সেন—কত লেকচার, ব্রাহ্ম সমাজ, preaching (প্রচার) কত কি করলেন—তাঁকেই ঠাকুর বলছেন, তুমি অন্ধকার ঘরে বসে আছ। একটু chink (ফাঁক) দিয়ে, সামান্য একটু আলো আসছে। তাই দেখছ। তুমি তো ময়দানে দাঁড়াও নাই গিয়ে। ঐখানে গেলে আর একরকম দেখবে—flood of light (আলোর বন্যা)। 'ময়দানে' মানে—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে সর্বত্যাগী হওয়া।

বুদ্ধিমান বলে নিজেকে মনে করে কি করবে? তোমার বুদ্ধির দৌড় কতটুকু! ছেলেদের বইয়ে আছে, 'ফড়িং মামার বিয়ে'। তুমি ফড়িং হয়ে হাতীর মত কথা কও কেন?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অনেক সময় বসে ভাবি, ফস করে এতো বয়স হয়ে গেল। বুড়ো হয়ে গেলাম। একটু তাঁকে চিন্তাও করতে পারলুম না। মানুষ এইটুকুতে (বুদ্ধিতে) কি বুঝবে?

যোগীর লক্ষণ আছে, সর্বদা উর্ধ্বদৃষ্টি। নিচে মন নাই।

উপনিষদে আছে বেশ। ভগবানদর্শন হলে, প্রস্ফুটিত পদ্মের মত হয় মুখটি। দেখে সকলে হয় অবাক।

আচার্য বলছেন, তোমার কি হয়েছে? এমন যে দেখছি! তুমি বুঝি ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছ? অন্তরে তাঁকে দেখেছ নিশ্চয়।

আচার্য বলছেন সত্যকামকে, 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সৌম্য ভাসি।'

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—ঋষিরা স্পষ্ট করে বলেছেন, আমরা ঈশ্বরকে জেনেছি তাঁর কৃপায়। বলছেন,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

'নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়', মানে আর পথ নাই যাবার। তাঁকে জানলে খেলা শেষ হলো। তাই ধ্যান করতে হয় তাঁর। ধ্যানযোগেতে ঋষিরা জেনেছেন তাঁকে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথামৃত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের কিন্তু তা-ও হয়েছিল আবার অন্যরূপও হয়েছিল। ঋষিদের মত অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন হয়ে ছিলেন একটানা ছয় মাস। তখন একটি বৈষ্ণব সাধুকে ভগবান পাঠিয়ে দেন ঠাকুরের দেহরক্ষার জন্য। একটা কাঠের রুলার গায়ে মেরে মেরে কিঞ্চিৎ বহির্চেতনা এলে, এক মুখ দুধভাত খাইয়ে দিতেন। তা'তে দেহ রক্ষা হতো।

আবার সমস্ত বিশ্ব চৈতন্যময় দেখতেন নিচে এসে।

আবার মায়ের, জগদম্বার নানা রূপ দেখতেন। মানুষের মত বানারসী শাড়ি পরে আসছেন। কখনো দেখছেন বসে বীণা বাজাচ্ছেন। কখনো নূপুর পায়ে চুল এলিয়ে, কখনো একঘর লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে! কেশব সেনের মৃত্যুর পূর্বে ওঁদের বাড়ীতে বানারসী শাড়ি পরে এসেছিলেন।

ঠাকুর জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ—সব উপায়ে তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। আবার দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত কত ভাবে।

আহা, ঋষিদের কি স্পষ্ট উক্তি, 'বেদাহমেতং'—আমি তাঁকে জেনেছি। 'তমসঃ পরস্তাৎ' অজ্ঞানের পর তাঁর অবস্থান। সংসারের মায়ামোহের অপর দিকে তাঁর স্থিতি। যদি মৃত্যুঞ্জয় হতে চাও, মরণকে ভয় না করতে চাও, তবে তাঁকে জান। মরণ মানে জন্ম মরণ দুই-ই। একটা থাকলে আর এক একটা সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এ দুটো একসঙ্গে চলে। এটা পার হতে হবে। এই জন্মমরণ-চক্রের নামই মৃত্যু। এর ওপারে গেলেই ঈশ্বর। সদানন্দ, সচ্চিদানন্দ। তখন অশিব শিব হয়ে যায়। মৃত্যু অমৃত হয়। ভয় অভয় হয়। অশান্তি শান্তি হয়। অল্প সুখ একটানা সুখ হয়। মানুষ দেবতা হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃতবর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, লাটাইয়ে সুতো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নাই। 'লাটাই' মানে মন। 'সুতো' মানে বাসনা। এই সংসার-বাসনা, বিষয়-বাসনাকে, অজ্ঞানকে,—ঈশ্বর-বাসনা, অমৃতত্বের বাসনা, দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তখন তাঁর দর্শন হয়।

এবারে সহজ পথ দেখিয়ে গেছেন। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। যেমন শিশু মায়ের জন্য কাঁদে। নিজে এই পথে প্রথম যান। কলিকালে কঠিন তপস্যাদি চলে না। তাই এই সহজ ও স্বাভাবিক পথ।

পুনরায় নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—আপনার গাড়ী কি হলো ? ধরা পড়েছে কি ? কি সব ঝঞ্ঝাট ! এদিকে তো কাজের সুবিধা হয়, কি কত হাঙ্গাম ! কে কি খুলে নিয়ে গেছে। এখন ছোট তার পিছু পিছু। কত দিকে নজর রাখতে হয়। সংসার চারটি-খানিক কথা !

এতে ঢিলে হলে ঈশ্বরেতেও ঢিলে হয়ে যায় মন। যতই বাইরে

বাড়াবে ততই মনের বাজে খরচ হয়ে যাবে। কামিনীকাঞ্চনে চলে যায় মন। তার ট্যাক্স দিতে দিতেই প্রাণান্ত হয়ে গেল। ঈশ্বরকে ডাকবে কখন ?

যাদের ঈশ্বরে মন নাই তারা দিক এতে মন। তা' হলে শান্তি পাবে। শান্তি সকলেই চায়। ঈশ্বর যে শান্তিস্বরূপ। শান্তি না পেলে সুখ নাই।

ভক্তরা মধ্যপন্থা নেবে। এক হাতে সংসার করবে আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরবে। কাজও হয় এদিককার, আবার মনের বাজে খরচ না হয়।

ডাক্তার বক্সীর মোটরকারের ড্রাইভার মোটর হইতে জিনিস খুলিয়া লইয়া বেচিয়া ফেলিয়াছে। বলিতেছে চুরি হইয়া গিয়াছে। মুস্কিলে পড়িয়াছে ডাক্তার। শ্রীম তাই ভাবিত হইয়াছেন। কি করিয়া সংসার করা উচিত তাই ডাক্তারকে বলিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—অনেকে দেখতে পাই গাড়ি ভাড়া করে আনে কোম্পানী থেকে। সকালে নিয়ে এলো সঙ্গে সোফার। রাত্রে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এতে হেঙ্গাম নাই। থাকলেও কম।

এতে এই লাভ হয় অত 'আমার আমার' বলার অবকাশ হয় না। 'আমি, আমার' এইটেই অজ্ঞান।

(হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) উঃ, ঠাকুর কি কথাই বলে গেছেন, 'আমি, আমার' অজ্ঞান।

বড় জিতেন—আজ্ঞে তাই ঠিক।

শ্রীম—আপনি অনুগ্রহ করে বললেই ঠিক আর তা' নইলে নয় ? (সকলের হাস্য)।

যতদিন এদিকে মন রয়েছে ততদিন সবই দেখতে হবে—গাড়ী বাড়ী প্রাক্‌টিস। এ সবই দেখতে হবে। দু'খানা তরোয়াল রাখতে বলেছেন—জ্ঞানের ও কর্মের।

শুধু কর্ম করলে জ্ঞানহারা হয়। আবার কেবল ওদিক করলে এদিক যায়।

তবে যদি উনি কৃপা করে ওদিকে টেনে নেন, তবে আর এদিকের জন্য ভাবতে হয় না। তিনি বলেছেন, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। কি শ্লোকটা ?

একজন ভক্ত—যস্ত্ব আত্মরতিরেব স্যাৎ, আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টম্, তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

দেখুন, কেমন exemption (অব্যাহতি)। ভগবানে মন যদি সদা রাখা যায় তা' হলে আর কর্ম করতে হয় না। একবার অর্জুনকে বললেন, কর্ম না করলে শরীর-যাত্রাও চলবে না। আবার এখানে বললেন, তার কাজ নাই যে আত্মতৃপ্ত। মনে হয় contradiction (বিরুদ্ধ বচন)। কিন্তু তা' নয়। কেন ? যে সমাধিস্থ তার ভার তিনি নিজে নেন। বলছেন, 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং'। অর্থাৎ সমাধিস্থের দেহরক্ষার ভার আমি নিজে নিই।

অন্তেবাসী—সমাধিস্থ থাকার সময়ের ভার নেন কি কেবল ? ব্যুত্থিত হয়ে যখন থাকেন তখনকার ভার নেন না কি ?

শ্রীম—তা-ও নেন। ব্যুত্থিতাবস্থায় যিনি কেবল ভগবৎ কথায়, তাঁর চিন্তায় সময় কাটান, তাঁর ভারও নেন। বলছেন তো, 'তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্'। যোগক্ষেম আমি বহন করি।

তিনি জগতের সকলেরই পিতামাতা। সকলকেই দেখেন, তাঁর বিং'ন অনুসারে। কিন্তু যারা একমনে তাঁর চিন্তা করে তাদের দেহ রক্ষার ভার তাঁর নিজের হাতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যতদিন না ঐ হচ্ছে, 'অনন্যচিন্তা', ততদিন দুই দিকই দেখতে হবে। মানুষ কি ইচ্ছা করে চেষ্টা ছাড়তে পারে ? তিনি নিজে ছাড়িয়ে নেন।

এই যে চেষ্টা, তা-ও তিনিই দেন। আবার ছাড়িয়েও নেন তিনি। কিন্তু চেষ্টাতেও সমস্যার শেষ হয় না। ও-টি হয় কেবল তাঁর কৃপাতে। তবুও বলছেন চেষ্টা করতে।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার ধ্যান করলেই হবে।' তাই ধ্যান করা উচিত সময় করে। আর সংসারের কাজ করা তাঁকে ব'লে। এই

করে চলা। এইরূপ করতে করতে অনেক জন্ম-মৃত্যুর পর তাঁর দর্শন হয়—'অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'। আবার কাউকে এক জন্মেই দর্শন দেন, এই জন্মেই।

কলিকাতা। ২৭শে আগষ্ট ১৯২৪ খ্রীঃ
১১ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। বুধবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী ১৫.৪৮ পল

ষষ্ঠ অধ্যায়

কথামৃতপাঠ শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শয়নকক্ষ। শ্রীম বিছানায় শুইয়া আছেন। শরীর খুব ক্লান্ত। 'কথামৃত' ছাপা হইতেছে, তাহার পরিশ্রম। আবার পিঠের বেদনা।

সকাল আটটা প্রায়। অন্তেবাসীর সঙ্গে পুস্তক ছাপা সম্পর্কে কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—চতুর্থভাগের দ্বিতীয় ফর্মের ফাইলটা পড়ে দেখুন না, কোন ভুল আছে কিনা।

স্বামীজীর সম্বন্ধীয় articleগুলি (প্রবন্ধ) দিয়ে একটা পরিশিষ্ট ভাগ করলে হয়। এতে ইয়াংম্যানদের খুব সুবিধা হবে। স্বামীজীর অত সব লেখা দেখে এগুতে চায় না। ভয় পায়। এতে reference (পরিচয়) দেওয়া আছে। ক্রমে ক্রমে সব পড়বে। এগুলি পড়ে রুচি হবে। তখন পড়বে মূল রচনা।

আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি পড়বে। ঠাকুরের কথা স্বামীজী কিভাবে প্রচার করেছেন তা-ও বেশ দেখতে পাবে। ঠাকুরের কথা যেন মন্ত্র, সূত্র। স্বামীজীর কথা তার ভাষ্য।

অন্তেবাসী—এসব কথা 'কথামৃতে' দিলে কথামৃত যে কেবল ঠাকুরের বাণীর বাহক, এই সুখ্যাতির হানি হবে না কি?

শ্রীম—কেন? 'পরিশিষ্ট'-ভাগে যাবে। সব ভাগেরই যে পরিশিষ্ট রয়েছে। এটাও ঐ পরিশিষ্ট হবে।

এর উদ্দেশ্য, কি ভাবে ঠাকুরের কথা ভক্তদের উপর কাজ করছে তা' দেখান।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম—কথামৃতের পঞ্চম ভাগ আরম্ভ করলেও হয়। কি বলেন?

অন্তেবাসী—আপনার শরীরের অবস্থা আগে বুঝে তারপর কাজে হাত দিলে হয়।

শ্রীম—হ্যাঁ, এক পার্ট লিখতে গিয়ে একটি কান খেয়েছি। কাছে একজন থাকে তো বেশ হয়। আমি শুয়ে শুয়ে বললাম, একজন লিখলো। এতে ঠাকুরের চিন্তাও হবে।

কখনো কোন দরকারী বই দিল, কিংবা জানালা বন্ধ করে দিল কিংবা খুলে দিল। এ হলে বেশ হয়। old body (বৃদ্ধশরীর) কিনা। এটা আরাম চায়। যৌবনের তেজ নাই। তাই অপরের সাহায্য।

অন্তেবাসী—কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পূর্বে দেখা উচিত, বোঝা উচিত, ভাবা উচিত, শরীর সহ্য করতে পারবে কিনা। কত concentration (একাগ্রতা)!

আর একটা বিষয় ভাববার আছে। যিনি থাকবেন লিখবেন, তিনিও থাকতে পারবেন কিনা ঐ সময়ে। যে ভাবে যা করতে চান তিনি সেভাবে করতে প্রস্তুত কিনা?

মনোমত লোক না হলে, আপনার সুবিধামত কাজ না হলে, শেষে আপনাকেই সব করতে হবে নিজে।

শ্রীম—হাঁ, একবার আরম্ভ করলে তখন ডান বাঁ লক্ষ্য থাকেনা।

ভেবে দেখলাম, এখন তো আমার বাইরে যাওয়া হচ্ছে না যতদিন না reprint (পুনর্মুদ্রণ) শেষ হয়। থাকতেই যখন হচ্ছে তখন করলেই ভাল। এইটে ভাবছিলাম।

অন্তেবাসী—পঞ্চমভাগ বের হওয়া তো খুব বাঞ্ছনীয়। সব লোক

আশায় আছে। মঠের সাধুরাও অনেকে চাইছেন। ভক্তরা ও বহু লোক চায়। শরৎ মহারাজ কতবার আমাকে বলেছেন পঞ্চমভাগের কথা। বলেছিলেন, তোমরা আরম্ভ করিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এ সবই ঠিক। কিন্তু আপনার শরীর দেখে কাজে হাত দেওয়া উচিত।

চারতলার ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ বেঞ্চেতে বসা। জগবন্ধু, শুকলাল ও মনোরঞ্জন, ডাক্তার বিনয় ও ছোট অমূল্য, বড় জিতেন ও বলাই, শান্তি ও মোটা সুধীর প্রভৃতি আসিয়াছেন। একটু পর আসিলেন দুর্গাপদ মিত্র (হিলিংবাম)।

শ্রীহট্টের ভক্ত মধুবাবু ও একজন সঙ্গী আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। আনন্দে বলিলেন, ওদেশে অনেক সব ভক্ত আছে। ভক্তির দেশ। ঠাকুরের খুব নাম প্রচার হচ্ছে। বলে, চৈতন্যদেবের চৌষট্টি মহন্ত সকলেই ঐ অঞ্চলের লোক ছিলেন।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে। শ্রীম সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া হাততালি দিয়া 'হরি বোল হরি বোল' বলিতেছেন। তারপর অর্ধ ঘণ্টা ধ্যানযোগ। পুনরায় মধুর সহিত মধুর কথা হইতেছে।

শ্রীম (মধুর প্রতি)—সাধুসঙ্গ করতে হয়। ঠাকুর বলেছেন, নিত্য সাধুসঙ্গ চাই, যেমন আহার বিশ্রামাদি চাই। সাধুসঙ্গ করলে তখন মনের ভিতর সৎ ভাব জাগ্রত হয়। ঐ সৎ ভাব নিয়ে তীর্থে যেতে হয়। তখন আনন্দ হয়।

তা' নইলে, যেমন দেশ দেখা। উপরি উপরি সব দেখে—বাড়ীঘর, লোকজন ইত্যাদি। আর সাধুসঙ্গ করে গেলে ভিতর দেখা যায়। এটি ভাল। তখন প্রাণে আনন্দ আসে। তীর্থে সূক্ষ্ম ও সুপ্তভাব সব রয়েছে। সেগুলি জীবন্ত। সেই সব ভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। চিরন্তন ভাব সব। কি সেগুলি ?

(১) ঈশ্বর সত্য, এই একটি ভাব। (২) ঈশ্বর নিত্য আর সব অনিত্য, এই আর একটি ভাব। (৩) অতএব সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর চিন্তা করা, তাঁর সেবা করা, এই আর একটি ভাব। (৪) শরীর আজ

আছে কাল নাই। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তা' দিয়ে তাঁর সেবা করা ভূতের সেবায় না লাগিয়ে, এ একটি। (৫) স্ত্রীপুত্র পরিজনকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সেবা করতে হয়, নিজেকে বড় ঘরের দাসীবৎ মনে করে। ঈশ্বর এদের দাসীর সংরক্ষণে রেখেছেন। এরা তাঁর। আবার তিনিই এইসব পরিজনরূপ ধারণ করেছেন, এই একটি। (৬) এইসব পরিজন আমার কেউ নয়। আমিও এদের কেউ নই। ঈশ্বরই এদের ও আমার আপনার জন, এই আর একটি ভাব। (৭) আমার জন্মের পূর্বে পিতামাতা পরিজন কেউ আমার সঙ্গে ছিল না। আবার মৃত্যুর পরও তারা কেউ সঙ্গে যাবে না। ঈশ্বরই সদা আমার সঙ্গে থাকেন দুরন্ত ছেলের মায়ের মত, যাবৎ না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়—এই একটি। (৮) আগে ঈশ্বর পরে সব, এই আর একটি। (৯) সত্যরক্ষা কেন করা? না, এই অভ্যাস দ্বারা মহাসত্য আবিষ্কার হবে বলে। সেটি কি? ঈশ্বরই আমার অনন্তকালের আপনার জন। আর সংসারে যাদের আপনার বলা হয় তারা সব পর।—এই আর একটি। (১০) কত মহাপুরুষ ধন জন বিদ্যা বুদ্ধি রাজ্য সব ছেড়ে আপনজন ঈশ্বরদর্শনের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করে এই সব তীর্থে বিচরণ করেন, এ ভাবটিও জাগে। (১১) আমি অমৃতের সন্তান, আমি ঈশ্বরের দাস, কিংবা আমি ঈশ্বর—এই সব দৈবীভাব তীর্থে জাগ্রত হয়, তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে। (১২) কত সাধু ভক্ত মহাপুরুষ তীর্থে বাস করেন তাঁদের দর্শন; তাঁদের সঙ্গে আলাপন হয়—এ-ও একটি।

কিন্তু আগে সাধুসঙ্গ না করলে এই সব ভাব চাপা পড়ে থাকে। দশজনে যাচ্ছে আমিও যাচ্ছি। ফিরে এসে গল্প করা যাবে, আমার অমুক অমুক তীর্থ হয়েছে এই সব ভাল নয়। তাই ঠাকুর ভক্তদের বেশী তীর্থে যেতে দিতেন না। বলতেন, কাশী আর বৃন্দাবন হয়েছে তো? তা' হলেই হলো। একটি জ্ঞানের আর একটি ভক্তির স্থান।

সর্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বয়ং ঠাকুর। তিনি নরদেহী ভগবান। তীর্থে যাঁর উদ্দীপনের জন্য যাওয়া তিনি সামনে উপস্থিত। তা' হলে

আর তীর্থের দরকার কি? এই ভেবেও মত দিতেন না বেশী তীর্থ করতে।

(মধুর প্রতি) বেশ তো, কিছুদিন কলকাতায় থেকে মঠের সাধুসঙ্গ করুন। সকালে ষ্টীমারে যাবেন। আর ন'টা দশটায় ফিরে এলেন। আগে এটি করুন। তারপর না হয় যাবেন। কি বলেন?

মধু ও সঙ্গী বিদায় লইলেন। শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। এখন রাত্রি আটটা।

এইবার ছাদে বিচার-বিলাস আরম্ভ হইল। ভক্তগণ ঘোরতর তর্কযুদ্ধে নিমগ্ন। এক পক্ষের দলপতি দুর্গাপদ মিত্র (হিলিংবাম)। অপর পক্ষের প্রমুখ বড় জিতেন। দুই-ই প্রবীণ ভক্ত। অধিক সংখ্যক ভক্ত দুর্গাপদের সমর্থক। অপর ভক্তগণ শ্রোতা ও দর্শক। আরম্ভ নিম্নরূপ।

বড় জিতেন (সকলের প্রতি)—গুরু দড়ি টেনে রেখে দেন। আর এখানের ঘাস ওখানের ঘাস খাইয়ে টেনে আনেন। এইরূপে বিষয়বাসনার শেষ হয়। বিষয়ভোগের ভিতর দিয়েই ভোগের নিবৃত্তি লাভ হয়। ঠাকুর তাই বলেছেন, স্ব-দারায় গমনাদির কথা।

দুর্গাপদ (মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া)—আপনার 'ঘাস' খেতে ভাল লাগে আপনি ঘাস খান। সকলকে টেনে আনছেন কেন? আপনি জানলেন কি করে ভক্তরা সকলেই ঘাস খায়? একদম কেন ড্যাঙ্গায় তুলে ফেলি না মাছটা, মরি কি মারি এই পণ করে?

যুবক—ঠিক কথা। নিজের ল্যাজ কাটা গেছে বলে অপরকে কেন ল্যাজ কাটতে বলা? ভক্তরা যে পুষ্পমধুর উপাসক। কেন তাদের টেনে আনা ঘাসে, হীন দ্রব্যে?

বড় জিতেন নির্বাক। কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না। তাই পুনরায় কথারম্ভ।

বড় জিতেন—আমাদের পাড়ার একটি বৃদ্ধ ভাল লোক। কিন্তু বই পড়ায় বড় আসক্তি। কেন এই আসক্তি, কেন অত পড়া? কি লাভ এতে? বাজনার বোল হাতে আনা। আবার পড়ার চাইতে শোনা ভাল। এই সব ঠাকুরের কথা।

দুর্গাপদ—হাঁ, ঠাকুরের কথা তো Gospel Truth (বেদ)। কিন্তু যার 'শোনা' এখনও শেষ হয় নাই সে না পড়ে কি করে? আজকালের পড়াটাও প্রাচীন শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রবণের পর মনন, তারপর নিদিধ্যাসন।

আমার নিজের কথাই বলছি। পড়াতে আসক্তি ছিল। নানা বই পড়ছি। ঐ অভ্যাসের ফলেই হাতে এসে পড়ে 'কথামৃত'।

'কথামৃত' পড়ছো? এতে যে পৃথিবীর বড় বড় সাধুসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে—এই কথা বলেছিলেন ঠাকুরের ভক্ত দেবেন মজুমদারমশায়। তাই পড়াটা খারাপ বলা যায় কি করে?

বাজনার বোল হাতে আনুক, যে অনেক শুনেছে পড়েছে, সে। কিন্তু যার শোনার দরকার তাকে 'তোমার দরকার নাই বলা'—কি করে হয়? কি করে judgement (রায়) দেওয়া যায় এসব বিষয়ে patronisingly (মুরুব্বির মত)?

ডাক্তার কার্তিক—ঠাকুর তো ভক্তিগ্রন্থ পড়তে বলেছেন! পড়া মাত্রই খারাপ নয়।

যুবক (সস্নেহে)—ঐ বৃদ্ধের যাতে রুচি সেই রকম বই পড়ছে। অন্য লোক অন্য বই পড়ছে। না, জিতেন বাবু? ওর দৃঢ় সংস্কারের কথা বলছেন আপনি। নয় কি?

বড় জিতেন—কি একটা বই পড়ছে—ডিউক ও চুরির কথা। তাই বলছিলাম, পায়েসমুণ্ডি খেয়েও আবার বই?

দুর্গাপদ—ঐ ব্যক্তি পায়েসমুণ্ডি পেলে তো?

যুবক—পায়েসমুণ্ডি খাওয়ার কথা কেবল মুখে বলে। মনপ্রাণে যদি এটা বুঝবে, তবে উনি যা বলছেন, সেই 'ঘাস', বিষয়রস খেতে যায় কেন লোক? এখানে তো আসছে, সকলে সব শুনছে, দেখছে, তবুও আবার ঐ-তে যায় কেন?

দুর্গাপদ—উনি (বড় জিতেন) খালি বুঝেছেন—

বড় জিতেনবাবু পুনরায় ঝাপটা খাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে কথা বলায়। কথা না কহিয়া

থাকিতে পারেন না। শ্রীম কতবার বলিয়াছেন চুপ করিয়া থাকা ভাল। কিন্তু তাহা পারেন না। আবার কথা কহিতেছেন।

বড় জিতেন (আস্তে আস্তে, শুকলালের প্রতি)—আমাদের পাশের বাড়ীতে একজন সাধু থাকেন, বৃদ্ধ। ইনি বৈষ্ণব, বাঙ্গালী। গুরুস্থান অযোধ্যায়। বড় ক্রোধী। বাজে কথা কন। কার কত মাইনে, ডাক্তারদের আমদানী বেশী, এই সব কথা তাঁর মুখে সর্বদা লেগে আছে।

দুর্গাপদ (সহাস্যে)—'স্বভাব যায় না মলে'। আবার কার condemnation (নিন্দাবাদ) হচ্ছে ? ঐ-তে রয়েছি আমরা নিজে। আবার অপরের condemnation (নিন্দাবাদ)! আবার support (সমর্থন) করা হচ্ছে নানারকম argument (যুক্তি) এনে!

বড় জিতেন হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক, স্থূলকায়, শান্ত ও ভক্তিমান। শ্রীম তাঁহাকে মঠে গিয়া সাধুসঙ্গ করিতে বলেন। তিনি যান না। কিন্তু শ্রীমকে দর্শন করিতে প্রায় নিত্য আসেন। দুর্গাপদ সর্বদা মঠে যান। তাঁহার বয়সী স্বামী শুদ্ধানন্দ, ধীরানন্দ প্রমুখ সাধুদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সখ্যসূত্রে সম্বদ্ধ। ইনি 'হিলিংবামের' ম্যানেজার। তাই সাধুরা সস্নেহে 'হিলিংবাম' বলে ডাকেন। প্রয়োজন মত তর্ক করেন বয়োবৃদ্ধ পূজনীয় সাধুদের সঙ্গেও। কিন্তু শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান। খুব পড়াশোনা আছে, সুলেখক। শ্রীমর উপর অগাধ আন্তরিক ভালবাসা।

বাক-বিলাস আরো চলিত। জিতেনবাবু চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার কি বলিতে প্রয়াস করিলেন। তখনই শ্রীম ভোজন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎক্ষণাৎ 'সিজ ফায়ার'। সন্ধি স্থাপনের জন্য বড় জিতেন শ্রীমর শরণাগত হইলেন। বড় জিতেন বড় বিপন্ন, তর্কযুদ্ধে গুরুতর আহত।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—আচ্ছা মশাই, আপনিই বলুন আমার কি অপরাধ ? আমি যা বলি ওরা তাই protest (আপত্তি) করছে।

আমি বলেছিলাম, সকলেই 'ঘাস' খাচ্ছে (বিষয় ভোগ করছে)। তবে কারুকে গুরু দড়ি ধরে খাওয়াচ্ছেন। তার আর ভয় নাই। আর

কেউ অন্যভাবে খাচ্ছে। গুরু যে ধরে খাওয়াচ্ছেন সেটা তার নিবৃত্তির জন্যই খাওয়াচ্ছেন।

এই অভিযোগ শুনিয়া শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। তারপর উভয় পক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের দৃষ্টি উর্ধ্বে অন্তরে তুলিয়া ধরিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ভক্তিই সার। ভক্তি বই কিছু না—তর্ক-ফর্ক। একটি মার্চেন্ট (সদাগর) সব সম্পত্তি বিক্রী করে, a pearl of great price (বহু মূল্যবান একটি হীরকখণ্ড) কিনলো। সেটি কি?—ভক্তি।

দুর্গাপদ—ভক্তি তো comprehensive term (সমষ্টিবাচক শব্দ)। এর তো ডিগ্রি, গ্রেড, শেড (রকমারি ভেদ) আছে। সেটি কোন ভক্তি?

শ্রীম—হাঁ। অহেতুক ভক্তি একটি আছে, ঠাকুর বলতেন। তবে সকাম ভক্তি, এ-ও ভাল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চার থাকের ভক্ত, সকলেই 'উদারা' প্রশস্তচিত্ত,—large-hearted, কিন্তু 'জ্ঞানী' আমার প্রিয় 'জ্ঞানীতু আত্মৈব মে মতম্'। কি শ্লোকটা?

একজন ভক্ত—উদারাঃ সর্ব এবৈতে, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা, মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

শ্রীম—সকাম ভক্তিও ভাল। সকাম ভক্তি দিয়েও তাঁর দর্শন হয়। তখন অন্য বাসনা থাকে না কারো কারো! ধ্রুব রাজ্যলাভের জন্য তাঁকে ডাকলেন। তিনি দর্শন দিয়ে তাঁকে রাজ্য দিলেন। কিন্তু একটু পরই আর রাজ্যে মন ছিল না। তখন চৈতন্য হল। পশ্চাৎতাপ করছেন, হায় হায় যোগীশ্বরগণও যাঁকে পায় না তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি রাজ্য চাইলাম। তাঁর দর্শনে ভোগবাসনা কেটে গেছে। তারপর দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করলেন, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে।

পূজা হোম দান তীর্থ গঙ্গাস্নান, এইসব যে গৃহস্থরা করে সকামভাবে তা-ও ভাল। তাঁকে লাভ হলে তখন এ ভাব থাকবে না।

সংসারী লোক কি সব নিয়ে রয়েছে। নানা কামনায় মন পরিপূর্ণ। কি করে তা' হলে তাদের অহৈতুকী ভক্তি হয়? অন্য কিছুই চাই না, কেবল ঈশ্বরকে চাই, এটি গৃহীরা বুঝতে পারে না।

তার জন্যই তো আর একটি আশ্রম হয়েছে—সন্ন্যাস। সন্ন্যাস আশ্রমে কিছু কিছু বোঝা যায়, একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যায়, অহৈতুকী ভক্তি কি।

ঠাকুর জানতেন কিনা এখানে অহৈতুকী ভক্তির খদ্দের নাই। তাই বলতেন, অহৈতুকী ভক্তি বলে একটা আছে। শুনিয়ে রাখলেন।

২

শ্রীম পুনরায় কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথাপ্রবাহ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বিবেকানন্দকে একটি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন ঠাকুর।

গান। কথা কইতে ডরাই, না কইলেও ডরাই,
পাছে সন্দেহ হয় তোমাধনে হারাই হারাই।
আমরা জানি যে মন্তর,
দিলাম তোরে সেই মন্তর, এখন মন তোর॥

বিয়ের কথা হচ্ছিল তার। ভাবনা, বুঝি পর হয়ে যাবে। তাই এ গান।

ভক্তরা পর্যন্ত অহৈতুকী ভক্তি প্রথমে বুঝতে পারে নাই। পরে বুঝেছিল। অত উঁচু সেটি।

বড় জিতেন চুপ থাকিতে পারেন না। ইতিপূর্বে বাগযুদ্ধে আহত হইয়া বিষণ্ণ ছিলেন। শ্রীমর ভক্তিপ্রলেপে বিষণ্ণতা দূর হইল। কিন্তু তিনি ঐ আঘাত ভুলিয়া গেলেন। পুনরায় মুখ খুলিলেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—রামায়ৎ বাবাজী হরিদাসবাবুর সঙ্গে আজ রাগারাগি করেছেন। হরিদাসবাবু অপর একজনের কথা কয়েছিলেন তাই। দেখলাম, ঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলিয়ে, he is found wanting (তাঁর মূল্য কম)।

এই সব হীনস্তরের তুচ্ছ কথায় শ্রীমর কষ্ট হয়। তাই তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। এইবার উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—সাধুর রাগ জলের দাগ। একটা লাঠি দিয়ে জলকে ঘা মার। এটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সাধুর রাগ।

মানুষগুলো কি নিয়ে আছে নিজেরা। এই দুরবস্থায় থেকে আবার সাধুদের criticise (নিন্দা) করতে যাওয়া! লজ্জা হয় না!

সাধুদের কথা আলাদা। এদের রাগ হতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ।

দেখ না, মানুষগুলি কামে কি না করে? সাধুদের ঐ ভাব এলে তারা দমন করতে পারে। গৃহীদের object (ভোগ্য বস্তু) রয়েছে সামনে। তাই তারা পারে না সামলাতে। মাত্র এইটুকু তফাৎ সাধুতে গৃহীতে।

ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন, তোমরা ঘরের একটা chink (ফাঁক) দিয়ে একটু আলো দেখতে পাচ্ছ। আর সাধুরা মাঠে দাঁড়িয়ে আলো দেখে। এতো তফাৎ!

খানিক পর বড় জিতেন পুনরায় কথা কহিতেছেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছি। মনে উঠছে, বুঝতে পারছি না। শুনেছি, অবতার বলে একটা upheaval (উত্তেজনার আবির্ভাব) হয়। কিন্তু কই ভক্তদের মধ্যে তো তার কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আর লোকগুলো যেন আগের চাইতেও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীম (স্মিতহাস্যে)—তা'তে বুঝি আপনার খুব ভাবনা হয়েছে?

বড় জিতেন—না, তবে বুঝতে পারছি না।

শ্রীম—আমরা কি সব বুঝতে পারছি? এই তো time, space (সময়, আকাশ), ঐ তারাগুলি। আমরা এর কোন্‌টা বুঝতে পারছি? এগুলি গোড়ার জিনিস।

কি করে বুঝবে বল? এক ছটাক বুদ্ধি নিয়ে তাঁকে বোঝা! ছি! তিনি কি এইটুকু?

আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, সবই তিনি করছেন। আমাদের ভাবতে হবে না। যদি ভাবতে হয় তবে কেবল তাঁকেই ভাব।

এই যে এতিমখানা ভেঙ্গে কলকাতায় তেতাল্লিশটি শিশু মারা গেল—নিষ্পাপ শিশু সব। পাঁচবেলা নামাজ পড়তো। এই কাণ্ডটা কেন হলো? এটা কি বুঝবে মানুষ? দক্ষিণ ভারতেও এইরূপ দুর্ঘটনা হয়েছে। এই যে অত লোকক্ষয় হচ্ছে, কেন হচ্ছে, তা' কি আমরা বুঝতে পারছি? না, এতে আমাদের একটুও চৈতন্য হয়েছে? এই কয়দিন একটু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তারপর সব চুপ।

পিঁপড়ে যেমন বলেছিল, আবার এসে চিনির পাহাড়টা নিয়ে যাব, এ-ও তেমনি বুঝতে চেষ্টা করা। তাঁর কাজ বোঝা যায় না।

কি দিয়ে বোঝে? এই মন দিয়ে তো? ভাঙ্গা আর্শিতে যেমন সম্পূর্ণ ছবি পড়ে না, তেমনি এ মন দিয়ে সব বোঝা যায় না।

(একজন ভক্তের প্রতি) একটা ভাঙ্গা আর্শি আছে। তাতে ছবি পড়লে কি হবে? ঠিক ছবি পড়বে না, না? তেমনি এই মন। এই মন নিয়ে আবার বুঝতে যাওয়া। এই মন নিয়ে আবার মানুষ লেকচার দিতে যায়। চুপ করে বসে নিজের দুরবস্থার কথা ভাবা উচিত। আর গুরুজনরা যা বলেন তা' শুনে, মনন করা উচিত। তা' না করে আবার লম্বা লম্বা কথা অপরকে বলা। গুরুগিরি করার যো নাই।

আমায় ঠাকুর দ্বিতীয় দিনে এমন ধমক দিয়েছিলেন যে তার কথা আজও মনে আছে। এমনি গাঢ় রেখাপাত করিয়ে দিছলেন মনের উপর। বলেছিলেন, এই যা, কলকাতার লোক খালি লেকচার দেয়। বললেন, ওগো, তোমায় কিছুই ভাবতে হবে না। তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন। তীর্থ, দেবালয়, সাধু ও শাস্ত্র। আবার শরীরটার রক্ষার জন্য চন্দ্র, সূর্য, বর্ষা ও শস্য, সব ঠিক করে রেখেছেন তোমার জন্মের পূর্বেই। আবার মাতৃস্তনে দুধ! তুমি কেবল বসে বসে তাঁকে ডাক।

শ্রীম নীরব। আবার কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এক একবার বলতেন, মা, আর কেন

বিচার করাও? একদিন বলছেন, এর ভিতর (নিজের শরীরের ভিতর) একটা কি আছে। আর একদিন বলছেন, এই পাখাটা যেমন দেখছি তেমনি মাকে দেখছি।

সাধুসঙ্গ করলে এ সবের একটা glimpse (আভাস) পাওয়া যায়। বসে বসে বুদ্ধি দিয়ে কিছুই solved (মীমাংসা) হয় না। এ সব আর্ম চেয়ারে বসে মুরুব্বিয়ানার কাজ নয়। সাধুসঙ্গ চাই—সর্বত্যাগীর সঙ্গ।

সাধু মানে, যে সব ছেড়ে এসব তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করছে। কি সেটি? না, এসব তিনিই করছেন। আমার এতে হাত দেবার যো নাই। আমার কাজ তাঁকে ডাকা। যাঁরা এরূপ করেন তাঁদের বলে সাধু। ঠাকুর কি কেবল সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন? সাধু যে তৈরী করেছেন! এরা অন্য কিছু চায় না, চায় কেবল ঈশ্বরকে। কেন, এই সাধু সৃষ্টি করে গেছেন? তাদের সঙ্গ ও সেবা করে অন্যলোক শান্তি পাবে। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন—তারা এটি ধরে আছে। অন্য লোক সংসারের নানা কাজে এই আদর্শ ভুলে যায়। এদের সঙ্গ করলে ঐ কথা স্মরণ থাকবে। তখন আনন্দে থাকতে পারবে। তিনিই সব করছেন, আমার কাজ তাঁকে ধরে থাকা—এটা বুঝলেই সর্বদা শান্তি ও আনন্দ।

যতক্ষণ 'আমি করছি, আমি কর্তা' এ বোধ, ততক্ষণ দুঃখ, অশান্তি। কর্তাগিরি যেতে না চাইলে তাঁর দাস হয়ে করলেও অনেকটা নিশ্চিন্তি, শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়! কিন্তু তা' বড় কঠিন। তাই সাধুসঙ্গ। এটি থাকলে সহজ হয়ে যায়।

সাধুসঙ্গ করলে তীর্থের মহিমাও বোঝা যায়। খালি তীর্থে গেলে কি হবে? তাই বলেছি (মধুকে) আগে মঠে গিয়ে সাধুসঙ্গ করতে। তারপর তীর্থে গেলে আনন্দ পাবে।

লোক নড়তে চায় না। কেউ কেউ (বড় জিতেন) বসে বসে খালি বকর বকর করে। মঠে যেতে চায় না। চন্দনের সন্ধান পেয়েছে। আগে মণিমাণিক্য কত আছে। আগে বাড়।

সব arrangement (ব্যবস্থা) ঠিক আছে। তুমি তো সাধুসঙ্গ কর। তা' হলেই পরমানন্দের অধিকারী হবে।

শ্রীম—অবতার আসাতেই তো এইসব উদ্দীপনা হচ্ছে। কত ভাল লোক দলে দলে সাধু হচ্ছে। তারপর ভক্তদের ভিতরও ব্যাকুলতা এসেছে। দেখ না, আমেরিকার, ইউরোপের ভাল ভাল লোক ঠাকুরের কথায় সাড়া দিচ্ছে।

ঠাকুর বলতেন, বড় জাহাজ যখন যায় তার অনেক পরে কিনারায় ঢেউ লাগে। একটু দেরীতে অবতারের বাণী সাধারণে পৌঁছায়। বুদ্ধের বাণী অশোকের সময় প্রচার হচ্ছে। ক্রাইস্টের বাণীও দেরীতে নিয়েছে সব লোক। ঠাকুরের বাণীও সাধারণ লোকের নিতে একটু দেরী লাগবে।

কলিকাতা, মর্টন স্কুল। ২৮শে আগস্ট ১৯২৪ খ্রীঃ
১২ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ১৮।৫১ পল।

সপ্তম অধ্যায়

শেষ জন্ম যার অবিচলিত বিশ্বাস তার

১

আজ সারাদিন বৃষ্টি। তবুও ভক্তদের আসার বিরাম নাই। শ্রীম বৈকাল চারটা থেকে নিজ কক্ষে ধ্যান করিতেছিলেন। সাতটার সময় তিনতলায় নামিয়া গেলেন হাত মুখ ধুইতে। আজ ২৯শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১ সাল, শুক্রবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ২০ দণ্ড। ৪৩ পল।

সন্ধ্যার অল্প বাকী। বৃষ্টি বন্ধ। ভক্তগণ চারতলার ছাদে গিয়া বসিয়াছেন। বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য, ছোট রমেশ, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন।

বড় জিতেন আবার আজও গতকালের কথা তুলিলেন।

বড় জিতেন (ভক্তদের প্রতি)—গুরুই রশি ধরে ভোগ শেষ করিয়ে নেন্ ভক্তদের, ঘাসটাস খাইয়ে।

যুবক (ঘোরতর আপত্তির সহিত)—কেন যাবে ভক্ত ঘাস খেতে? সে অমৃত খাবে। ভগবানের নামামৃত, তাঁর আনন্দ করে ভক্তগণ।

বড় জিতেন—দেখছি তো আমাদের ঘাস খাওয়াচ্ছেন ধরে রেখে।

যুবক—তাই বলুন। আপনি খাচ্ছেন। সকলকে কেন টেনে নিচ্ছেন? এ তো আপনার নিজের কথা—আপনি বলুন। অপরের হয়ে কি করে একথা বলেন? গুরুদেব কি ঘাস খেয়েছিলেন, কিংবা অপর কত সন্ন্যাসী ত্যাগী ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা কি ঘাস খাচ্ছেন সকলে?

বড় জিতেন—তাঁরাও তো দেহ ধারণ করলে যা সব দুঃখ কষ্ট হয়, সে সব সয়েছেন।

যুবক—সেটা কি ঘাস খাওয়া—আপনি যেমন 'ঘাস খাচ্ছেন' বলেন? শ্রীরামকৃষ্ণও শারীরিক অসুখে ভুগেছেন, চৈতন্য বিষজ্বরে শরীর ত্যাগ করেছেন, ক্রাইস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, বুদ্ধ রক্ত-আমাশায় শরীর ত্যাগ করেছেন—আপনি কি এগুলিকেও 'ঘাস খাওয়া' বলছেন? তা' তো নয়। আপনার 'ঘাস খাওয়া'র অর্থ বিষয়ভোগ, কামিনীকাঞ্চনের সেবা। তাই নয় কি? তবে আর এ সব দেহের কষ্টকে 'ঘাস খাওয়া' বলা চলে কি করে? অমৃত পান করেছেন, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেছেন তাঁরা।

ডাক্তার বক্সী—অবতার, মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দিন। অপর লোকদের কথা ধরুন।

যুবক—অপর লোকদের কথাই বা কি করে বলতে পারেন? কত মহৎ ভক্ত সব রয়েছে। তারা অমৃত পান করে। কত ত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্ত রয়েছে। যদি বলেন, যারা গৃহে আছে তাদের কথা বলা হচ্ছে। তাই বা আপনি কি করে বলতে পারেন? ভোগ করে ভোগত্যাগ সকলের পক্ষে নয়।

বড় জিতেন (হতাশভাবে)—কি জানি ভাই, আমি তো দেখছি তাই—ঘাস খাওয়াচ্ছেন।

ডাক্তার বক্সী—তা' আপনি বলতে পারেন। অন্য সকলেই 'ঘাস' খাচ্ছে তা' বলা যায় না।

ভক্তগণ এইরূপ বচনবিলাসে নিমগ্ন। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া ছাদে আসিয়াছেন। ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছে দেখিয়া সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তদের বলিলেন, ঘরে আসুন সব। ওখানে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে।

শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন উত্তরাস্থ সিঁড়ির পাশে। ভক্তগণ কেহ সম্মুখে, কেহ পাশে ডান হাতে। কথাবার্তা চলিতেছে। বড় জিতেন গতকালের মত আজও তর্কযুদ্ধে আহত। শ্রীমর আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—আমি বলছিলাম, এই ভাবেই ভোগ করে ভোগ কাটাতে হবে। গুরু রশি ধরে থাকবেন, তুমি ভোগ কর। ভোগ করে ভোগ ক্ষয় গুরুর হাত ধরে। জগবন্ধু তা'তে তীব্র প্রতিবাদ করছেন।

শ্রীম—কে বলছে এই কথা—কে, কে? গুরু যদি বলেন তবে হবে।

বড় জিতেন (হতাশভাবে)—কি জানি মশায়, আপনার কাছে পড়া গেছে। যা ভাল হয় তাই করুন।

শ্রীম (স্মিতহাস্যে রহস্যস্বরে)—যা ভা—ল হ—য় তা—ই ক—রু—ন।

বড় জিতেন নীরব। গতকাল বচনবিলাসে হারিয়া গিয়াছেন। আজও সেই দশা। শ্রীমর কোর্টের আপিলও নিষ্ফল। তাই মুহ্যমান।

শ্রীম (সস্নেহ গাম্ভীর্যে বড় জিতেনের প্রতি)—আর কি করবেন? তিনি যা বলে গেছেন, গুরু যা বলেছেন তাই করুন। গুরু বলেছেন, চাল ধোয়া জল খাও। বিকারের রোগী। চাল ধোয়া জল খেলে বিকার কাটে। চাল ধোয়া জল খাওয়া যাক।

আর তিনি যা বলেছেন, সাধুসঙ্গ করা। সাধুসঙ্গ করলে ভোগ কাটে। সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস, তীর্থ, শাস্ত্র, দান, দয়া—এতে পাক খোলে। যে পাক লেগেছে লাটাইয়ে, সে পাক খোলে।

ছেলেবেলা থেকে ঐ দেখে আসছে। ভাইয়ের বিয়ে, বোনের বিয়ে। জামাই এল। আবার তাকে ঘুমুতে দেওয়া হল আলাদা ঘরে। দেখে দেখে শিখেছে, এটাই সহজাবস্থা। এই যে পাক লেগেছে, এখন কিসে খোলে সে পাক? এই সব যা বলে গেছেন গুরু, তা'তে।

শ্রীম কিছুকাল মৌন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—কি হলো গাড়ীর? বলেছেন ওকে—ড্রাইভারকে?

ডাক্তার—না।

শ্রীম—উহা বলা উচিত ছিল। আমরা তো আপনাকে বলে দিয়েছি। হয়, ঐ ওদের বের করে দিক। না হয়, নিজে টাকা দিক।

ডাক্তার—বোকা মত লোক।

শ্রীম—বোকা বলেই সে যা করছে সব সয়ে যেতে হবে? তিন তিনবারই ঠকতে হবে? রাগ, অলংকার এই সব গেল। আবার মোটরেরও কিছু কিছু জিনিস চুরি গেল।

সাতটা পান আনাতে ঠাকুরের কি রাগ! যোগেন স্বামীজীকে বললেন, যা শালা এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে আয়। দশটা পাওয়া যায় এক পয়সায়। যোগেন এনেছিল সাতটা। তক্ষুণি এক মাইল দূর আলমবাজার পাঠিয়ে দিলেন।

একে যদি দয়া বলা হয় তা' হলে আর রক্ষা ছিল না। তাঁর সঙ্গে থেকে যা দেখেছি যা শিখেছি, তা'তে মনে হয় এ দয়া নয়, দুর্বলতা। এ সয়ে গেলে নিজের ক্ষতি। আজ এই, কাল আর এক রকম। নিজের ভুগতে হবে, এই করে।

ডাক্তার—আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু দেড়শো টাকা তো লাগবে (মোকদ্দমায়)।

শ্রীম (তীব্র স্বরে)—না না! টাকার question (প্রশ্ন) নয়। মনে যে দুর্বলতা এসে পড়বে। Human languageএ (মানুষের ভাষায়) বলতে গেলে ওর (মোকদ্দমা করে সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করার) দাম ক্রোড় টাকা। আর এর (দয়ার) দাম এক টাকা।

মনের ঐ অবস্থার (সত্য, ন্যায় রক্ষার) দাম কত ! এর তো দাম হতেই পারে না। তবুও বলতে গেলে দাম ক্রোড় টাকা।

যে এদিকে ঠকবে সে আবার ওদিকেও (ঈশ্বরের দিকেও) ঠকবে। স্ত্রীলোক আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। ঐ mentality (মনোভাব) নিয়েই তো সংসার করা।

তাই ঠাকুর বলতেন, যে লুণের হিসাব করতে পারে, সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। এদিকে যে পারে, ওদিকেরও সে পারে।

একে দয়া বললে আর রক্ষা ছিল না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কাজ করলে কঠোর হতে হয়। এ যে হচ্ছে এ তো আর worldly things (সাংসারিক বিষয়) নিয়ে নয় —highest ideal (জীবনের চরম আদর্শ) নিয়ে কথা !

ঈশ্বরের পথে যা বিঘ্ন, তা' তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত। এ সব করা কেন ? তাঁকে পাওয়ার জন্য। তা' হলেই হলো, যা ঈশ্বর থেকে দূরে ফেলে দেয়, তা' তৎক্ষণাৎ নির্মমভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

এই রকম (নরম) ভাব থাকলে সবেতেই ঠকতে হবে।

ডাক্তারের বাড়ী হইতে কম্বল, অলংকারাদি চুরি হইয়াছে। মোটর গাড়ীরও কিছু কিছু জিনিস চুরি গিয়াছে। ড্রাইভারের কাছে কতকগুলি লোক আসিত। সকলের সন্দেহ তাহাদের উপর।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—কি quick decision (কি দ্রুত বিচারশক্তি) ! একদিন কীর্তন হচ্ছে বারান্দায়। ঠাকুর বারান্দায় বসে শুনছেন। (উত্তরপাড়ার প্যারী মুখুয্যের বাড়ীর) মেয়েরা এসে বললে, আমরা ঘরে বসতে পারি ? ঠাকুর তক্ষুণি উত্তর করলেন, না না, এখানে কোথায় বসবে ? এখানে হবে না।

কেন বললেন, হবে না ? ওরা বিষয়ী লোক। এই এক কথা। তারপর নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে। একবার এরা বসলে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে পারবেন না। তারপরই দেখা গেল ছোকরা ভক্তদের খাওয়াতে ঘরে গেলেন।

দেখুন কি quick decision (দ্রুত রায়দান)! Quick decision greatness-এর (মহত্বের) একটি চিহ্ন।

যাদের mind (মন) vacillation (দোলায়মান) করে, ঠিক করতে পারে না কি করবে, তাদের মন দুর্বল। বিবেকানন্দকে দেখিয়ে ঠাকুর বলতেন, ঐ দেখ কেমন যায়—যেন খাপখোলা তরোয়াল। এমন হলে তবে তো হবে!

না হয় কয়দিন ভাড়াটে গাড়ী করে রোগী দেখা হলো। এতে টাকা খরচ হবে, তবুও বড় কাজ।

ঐ লোকটি (ড্রাইভার) careful (সতর্ক) নয়। বেলেঘাটা গিছলুম সেদিন। আপনিও তো ছিলেন আর ইনিও (জগবন্ধু) ছিলেন। মোটরের ধাক্কা লাগিয়ে দিল একটা গরুর গাড়ীর সঙ্গে। তা' হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর উচিত ছিল পেছনে হঠান। তা' না করে হাঁ করে রইল। বোকা।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গৃহস্থাশ্রম তাই অত কঠিন। এখানে চারদিকে চোখ রেখে চলতে হয়। কোন দিক থেকে গুলী এসে পড়ে—ছিটাগুলী সদা চলছে। একটু অমনোযোগী হলেই গেল।

দাসীর মত থাকতে বলেছিলেন ঠাকুর, একজন ভক্তকে ঘরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছিলেন, কাজ যখন করবে, ভিতরে জানবে অকর্তা। কিন্তু দেখাবে কর্তা। তা' না হলে কেউ মানবে না। ফোঁস্ করতে বলেছিলেন অন্যায় দেখলে। কিন্তু বিষ ঢালতে নাই। তা' যদি করতে না পার তবে সরে দাঁড়াও। গাছতলায় যাও। বলতেন, অযুত হস্তীর বল থাকলে সংসারে যাও। দু'খানা তরোয়াল নিয়ে সংসারে ঢোক। একখানা জ্ঞানের, অন্যখানা কর্মের। 'জ্ঞানের' মানে এই, আমি ভগবানের সন্তান। পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদি কেউ আমার নয়—না আমি এদের। ভগবানই আমার ও এদের অনন্ত কালের বন্ধু, আপনার জন। এইটা জানা। আর 'কর্মের' তরোয়াল,

মানে সুচারুরূপে, tactfully, কর্ম করা। আর নিষ্কাম হয়ে কর্ম করা, ভগবানের জন্য কর্ম করা। প্রকৃতিতে যে বীজ রয়েছে সেরূপ কর্মই করতে হবে। তবে নিষ্কাম হয়ে করা। নইলে বন্ধন। কর্মের ফল ভোগের জন্য আরও জন্ম নিতে হবে।

কর্মের প্রবৃত্তি না থাকলে সংসার অচল। সংসার মানেই কর্ম। কর্মের আবার দু'টি ফল, একটি গরল অপরটি অমৃত। 'গরল' মানে বিষ, অর্থাৎ মানুষের অনিষ্ট করে, প্রাণহানি করে। কি করে প্রাণহানি করে ? জন্মমরণ-চক্রে পাতিত করে। একেবারে প্রাণ যাবে না। কিন্তু বারবার অনন্ত বার জন্ম ও মরণ হবে। হয়রান করে এইভাবে জীবকে। কখনও লোকে যাকে ভাল বলে সেই জন্ম হয়—হলো যেমন মানুষ জন্ম, রাজাটাজা কিংবা স্বর্গাদি, উত্তম লোকে গেল। সেখানে পৃথিবীর চাইতেও উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু পাওয়া গেল। তা' ভোগ করলো। আবার সেখান থেকে পতন হল।

আর খারাপ জন্ম, পশু পক্ষী আদি জন্ম। এতে দুঃখই সব। কর্মের এই দু'টি ফল, ভাল ও মন্দ। আর দু'টি রূপ, জন্ম ও মরণ।

একজন ভক্ত—অত বিচার করে চলা কি সম্ভব ?

শ্রীম—অসম্ভবই বা কি ? গুরু এসে, অবতার এসে বলে দিয়েছেন, কিসে এই বিচারলাভ হয়। বলেছেন তো, মনে ভাববে সবের মালিক ঈশ্বর। একথা সদা মনন করবে। নিত্য সাধুসঙ্গ করবে। সাধুরা সদা মনন করে কিনা—ঈশ্বরই কর্তা মানুষ অকর্তা। অহংকারটা যায় না। তাই বলেছেন, থাক্ শালার 'দাস আমি' হয়ে।

চেষ্টা করে সাধু সঙ্গ করতে বলেছেন। আবার সাধু কে তাও বলে দিয়েছেন। বলেছেন তো, যার কাছে বসলে মনে হয়, সংসার অনিত্য ঈশ্বর নিত্য ; তিনিই সকলের সর্বদার জন্য বন্ধু—এই জ্ঞান হয়। সেই-ই সাধু।

এই সাধুসঙ্গ করলে তখন মনে থাকতে পারে, জন্ম মরণের স্থান সংসার। এখানের লোক আমি নই। এখানে আমার কেউ নাই। ঈশ্বরই আমার সব 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', এই কথা যদি

মনে থাকে তা' হলেই তো আপনি বিচার এসে যায়। সংসারে 'আমার অন্য কোনও কর্তব্য নাই' ঈশ্বর-ভজন ছাড়া। সব অনিষ্টকারী, এক ঈশ্বর ছাড়া। এ দু'টি ভাবনা মনে থাকলে সব সম্ভব হয়।

যার ফাঁসি হবে সাতদিন পর তাকে যদি সব ভোগ্য দ্রব্যাদি দেওয়া যায়, তবে কি সে ভোগ করতে পারে? তেমনি এ অবস্থা।

তাই ঠাকুর বলেছেন, মানুষ—যারা জ্যান্তে মরা। অন্যের মন যায় সংসার ভোগে, তার মন যায় সংসার ত্যাগে, ভোগ ত্যাগে। মড়া যেমন ভোগ করতে পারে না, তেমনি সে সংসারের ভোগ নেয় না। যতটা নইলে দেহ রক্ষা হয় না ততটাই কেবল নেয়।

অবতার আসেনই তো এই জন্য, কি করে ঈশ্বরকে সদা মনে থাকে সেই পথ দেখাতে। একটা ক্লাস করেছেন, 'সাধু' নাম সেটার। সাধুরা সর্বদা তাঁকে মনে রাখে, অন্য সব ছেড়ে ছুড়ে তাদের সঙ্গ করতে বলে গেছেন। তাই করা আমাদের উচিত। আর প্রার্থনা করা, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না। এসব করলে অসম্ভব সম্ভব হয়। মাংসের ঘরে থেকে বাঘ নিরামিষাশী হতে পারে।

পরের দিন শনিবার। ভক্তরা অনেকে আফিসের ফেরৎ আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে একটার সময় দেরাদুন হইতে আসিয়াছেন একজন ভক্ত। ইনি 'কথামৃত' পড়িয়াছেন। আজ শ্রীমকে প্রথম দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কুশলপ্রশ্নের পর তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, আমার ধ্যান করলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না। আপনার বিশ্বাস হয় এ কথা?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ। তাঁর কথায় সংশয় নাই।

শ্রীম—ঠাকুর সকলকে বলতেন না এ কথা, যাদের বুঝতেন এ ঘরের লোক (ঠাকুরের ভক্ত), তাদেরই বলতেন। অপর লোকদের, যেমন ব্রাহ্মসমাজের ভক্তদের বলতেন, মিছরীর রুটি যে ভাবেই খাও মিষ্টি লাগবে। কিন্তু খাওয়া চাই এই মিছরীর রুটি। মিছরীর রুটি মানে ভগবান।

'আমার ধ্যান করলেই হবে'—এতে যার বিশ্বাস হয়, সে বেঁচে গেল। জন্ম জন্ম দুঃখ ভোগ তা'কে আর করতে হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার সময় এসেছে, বুঝতে হবে। জন্মমরণ-চক্রের অবসান হবে শীঘ্র। 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং'। এ-টি মানুষের চরম লক্ষ্য।

শেষ জন্ম তার যার ঠাকুরের উপর বিশ্বাস অবিচলিত। ঠাকুর এসেছিলেনই এই জন্য, এই কথা বলতে। বলেছিলেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ প্রেম সমাধি, আমার ঐশ্বর্য।

কিন্তু তাঁকে চেনা বড় কঠিন। অত ঢাকা ঢেকেছেন নিজেকে। দরিদ্র, নিরক্ষরপ্রায়, আবার পূজারী। কার সাধ্য অত আবরণের ভিতর তাঁকে চেনা! যাদের পূর্ব জন্মের চেষ্টায় সঞ্চয় আছে তারাই অজ্ঞাতভাবেই তাঁর দিকে অগ্রসর হবে। 'না দেখে না শুনে কানে, মন গিয়ে তাঁয় লিপ্ত হলো'। চুম্বকের পাহাড়ের টানে জাহাজের যা দশা হয়, তাই হয় আন্তরিক ভক্তদের। বাসনা সব খসে পড়ে।

অপরাহ্ণ দুইটা। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, একবার মঠের সংবাদটা নিলে হয়। জগবন্ধু তৎক্ষণাৎ বেলুড় মঠে রওনা হইলেন।

এখন রাত্রি প্রায় আটটা। শ্রীম ছাদে বসা চেয়ারে, উত্তরাস্য। বড় জিতেন, ছোট রমেশ, শান্তি, বলাই, মনোরঞ্জন, ছোট অমূল্য প্রভৃতি ভক্তগণও শ্রীমর সামনে বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। মনোরঞ্জন ও ছোট অমূল্য দুইখানা উদ্বোধন শ্রীমর হাতে দিলেন। ইহাতে স্বামীজীর কথা বাহির হইয়াছে।

জগবন্ধু আসিয়া মঠের সংবাদ বলিতেছেন। বলিলেন, ষ্টীমার-ঘাটেই প্রিয় মহারাজের সঙ্গে দেখা হ'ল। উনি এখন ম্যানেজার। ওঁর কাছে সব জিজ্ঞাসা করলাম মঠে যেতে যেতে। অসুখ বিসুখ এখন তেমন নাই।

শ্রীম বলিলেন, এ সময়টা মঠে বড্ড ম্যালেরিয়া। সাধুদের অসুখ

বিমুখ হলে বড় কষ্ট। কে দেখে? সংসারে তবুও পাঁচজন আছে। পরস্পর দেখাশোনা করে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঐ চেয়ে দেখুন একবার উপরের দিকে। কি কাণ্ডটা চলছে। আমরা এই অনন্ত মঠে রয়েছি। 'সৃ' ধাতু থেকে 'সংসার' হয়েছে। এর মানে to project (সৃজন করা)। সংসার অর্থাৎ যা ঈশ্বর থেকে projected (সৃষ্ট) হয়েছে, তাঁর শরীর থেকে বেরিয়েছে। তা' যদি হলো তবে এ সবই তাঁর, সবই তিনি। সূর্য চন্দ্র আকাশ জল বায়ু পৃথিবী, এ সবই তিনি হয়ে রয়েছেন। তা' যদি হয়, তবে এ সমগ্র বিশ্বটাই পবিত্র স্থান, তীর্থ। তাই এ-টি বিরাট মঠ, অনন্ত আশ্রম, অনন্ত মঠ। যদি এ-টি কেউ ভাবে তবে সিদ্ধ হয়ে যাবে, তার ঈশ্বরদর্শন হবে।

এই ভাবনা—এই বিরাট বিশ্বে সবই ভগবানের রূপ। আমিও তাঁর একটি রূপ, সচ্চিদানন্দ। তা' হলে কাজ করা, ধ্যান করা, চলা ফেরা, সবই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে হচ্ছে। এই করে ক্ষুদ্রতা ঘুচে যাবে। বিরাটের সঙ্গে ক্ষুদ্র 'আমি'টার মিলন হয়ে যাবে—সচ্চিদানন্দোঽহম্।

ভাবনাতেই ছোট বড়। বস্তুতঃ ছোট বড় নাই। সবই যে তিনি। 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্' তিনি। ধর্ম আর কি? এই ছোট 'আমি'টাকে বড় 'আমি'তে ঢেলে দেওয়া। তখন এই ছোটই বড় হয়ে গেল। গঙ্গা সমুদ্র হয়ে যায়।

এ যেন এল্‌কেমী। হীন ধাতু, যেমন লোহা, তাকে সোনা করা। একজন গরীব। কেউ তাকে মানে না। সে যদি বড় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে তখন তাকে সকলে মানে। নালার জল গঙ্গায় পড়লে গঙ্গাজল হয়ে যায়।

মঠে থাকে সাধুরা। তারা দিনরাত ভগবানের চিন্তা করে, তাই মঠ পবিত্র। তেমনি বিশ্বে আছেন ঈশ্বর। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। আবার তিনিই অন্তর্যামীরূপে সবের ভিতরে আছেন। তা' হলে এই বিশ্বও পবিত্র মহাতীর্থ।

এই process-কে (চিন্তাধারাকে) বলে sublimation (ছোটকে বড়র সঙ্গে মিলিয়ে বড় করে দেওয়া)। আমি ঈশ্বরের সন্তান ভাবতে ভাবতে, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যাওয়া,—গুণে ও কার্যে। রূপে তো মানুষই থাকে। 'আমি মানুষের সন্তান', এই হীন ভাবকে 'আমি ঈশ্বরের সন্তান' এই মহৎ ভাবে রূপান্তরিত করা। এরই নাম ধর্ম।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৩০শে আগস্ট ১৯২৪ খ্রীঃ ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল।
শনিবার, অমাবস্যা ২১ দণ্ড.২৮ পল।

অষ্টম অধ্যায়

নিত্য উৎসব—বিশ্বের জন্মোৎসব

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম চারতলার নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। আর নিম্নতলে মোটরে বসিয়া আছেন স্বামী সারদানন্দ। সঙ্গে কপিল মহারাজ। স্বামী সারদানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর, বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের' সুবিখ্যাত লেখক। তিনি শ্রীমর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের জন্মোৎসবে যাইবেন।

অন্তেবাসী ছাদ হইতে নামিয়া মোটরের কাছে গেলে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, মাস্টার মহাশয়কে বলে দাও আমাদের কথা। তিনি নাগমহাশয়ের উৎসবে যাবেন আমাদের সঙ্গে। অন্তেবাসী শ্রীমর দরজায় করাঘাত করায় তিনি নিচে আসিয়া মোটরে উঠিলেন। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিয়া গেলেন, আপনারা সকল ভক্তগণ হেঁটে উৎসবস্থলে আসুন।

উৎসবস্থল পার্বতী মিত্রের গৃহে, শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে ছকু

খানসামার লেনে। জগবন্ধু ছোট অমূল্য গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িলেন। তৎপর শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে চলিতেছেন।

'উদ্বোধন' হইতে শরৎ মহারাজ, কপিল মহারাজ, অসিতানন্দ, অশেষানন্দ, হরিপ্রেমানন্দ, বৃদ্ধ কার্ত্তিক মহারাজ আসিয়াছেন। মর্টন স্কুল হইতে আসিলেন মাস্টার মহাশয়, জগবন্ধু, ছোট অমূল্য, গদাধর। পরে আসিলেন মোটর গাড়ীতে ডাক্তার কার্ত্তিক বক্সী, বিনয়, ছোট নলিনী, অমৃত ও ললিত। এটর্নি বীরেন বসু ও গায়ক বঙ্কিম গড়ুই আসিলেন বীরেনের মোটরে একটু পর।

নিম্নতলে সকলে বসিয়া আছেন মেঝেতে ফরাশের উপর।

শ্রীম ও স্বামী সারদানন্দ আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার অনুকীর্তন করিতেছেন—তাঁহার অমৃতময়ী স্মৃতি ও দিব্য লীলার। ঠাকুরের বালকভক্ত পল্টু, পূর্ণ প্রভৃতির কথা হইতেছে। আর কথা হইতেছে কামারপুকুর ও জয়রামবাটির ঠাকুর ও মায়ের জন্মস্থানের বাল্য লীলার কথা। ঐ অঞ্চলের চিনে শাঁখারী, প্রসন্ন মাঈ, ধনী মাঈয়ের কথা, হৃদয়ের মায়ের কথা। এঁরা ঠাকুরের দৈবভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন।

পূজার মঞ্চ হইয়াছে দ্বিতলে। শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের মহাসমাধির ছবি একটি চৌকির উপর স্থাপিত হইয়াছে। বিবিধ প্রকার সুগন্ধি গোলাপাদি পুষ্পে সজ্জিত করা হইয়াছে। দেবতার নিকট দীনতার মূর্তিমান বিগ্রহ দুর্গাচরণ কি করিয়া তাঁহার এই নশ্বর শরীরের প্রতিমূর্তি লইবার অনুমতি ভক্তদের দিবেন? তাঁহার এই হীন শরীরের পূজা করিয়া কি লাভ হইবে? পূজার একমাত্র যোগ্য প্রতিচ্ছবি তো শ্রীরামকৃষ্ণই দিয়াছেন। আর স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ শরীরের ঐ প্রতিচ্ছবির অর্চনা করিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, ঐ ছবি পরে ঘরে ঘরে পূজিত হইবে। অতএব আমার এই হীন শরীরের প্রতিচ্ছবির কোন আবশ্যকতা নাই! এইরূপ যুক্তিতে তিনি ভক্তগণকে তাঁহার দেহের ছবি লইবার চেষ্টা হইতে বারবার নিরস্ত করিয়াছেন। ভক্তগণ তাই নিরুপায় হইয়া তাঁহার মহাসমাধির ছবি

লইতে বাধ্য হইয়াছেন। স্থূলদৃষ্টি ভক্তদের স্থূল শরীরের নিদর্শন চাই। তাই আজ বেদীর উপর নাগমহাশয়ের দেহাবসানের ছবি স্থাপিত।

উপরে কুলঙ্গিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্তি। উহাও ভক্তিভরে সুগন্ধ পুষ্পপত্রে সজ্জিত। এই অর্চনামঞ্চের সম্মুখে মেঝেতে নানাবিধ ভোগের দ্রব্যাদি রাখা হইয়াছে। পক্কদ্রব্যের মধ্যে পোলাও, পায়েস, নানাবিধ ভাজা ও তরকারী, চাটনী আর উত্তম ফল মিষ্টি রহিয়াছে।

মিত্র পরিবার অতি ভক্তিমান। গৃহটি যেন একটি আশ্রম। প্রবেশ করিলেই ভক্তির সঞ্চার হয়। ভোগ না দিয়া এ গৃহস্থাশ্রমের কেহ কোন দ্রব্য ভোজন বা পান করেন না। মন্দিরে যেমন নিত্য ভোগরাগাদি এখানেও তাই। নিত্য উৎসব এই আশ্রমে। মিত্র মহাশয় ও মিত্র-গৃহিণী বাল্যকাল হইতে নাগমহাশয়ের স্নেহাশিস্ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মিত্র-গৃহিণী শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র, 'নাগ দুহিতা' নাম দিয়া শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের একটি জীবনী লিখিয়াছেন শ্রদ্ধাঞ্জলির নিদর্শনরূপে। ছেলে দুইটিও কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান। একসূত্রে গাঁথা এই চারিটি জীবন। শ্রীম ইতিপূর্বে অন্তেবাসীকে কয়েকবার পাঠাইয়াছিলেন এই ভক্তিমান মিত্র-পরিবারের কুশল সংবাদ লইতে।

সাধু ও ভক্তগণ নিম্নতলে বসিয়া আছেন। ভাদ্রের বিরক্তিকর গরম! তাই একটি সেবক তাঁহাদিগকে পাখার বাতাস দিতেছে। মিত্র পরিবার সত্যই ভাগ্যবান। একদিকে বাল্যকাল হইতে নাগমহাশয়ের অহেতুক কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এদিকে আবার ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদরা শ্রীম ও সারদানন্দ মহারাজ তাঁহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করেন। আজ তাঁহারা উভয়েই স্বগণ, এই পুণ্য পর্বে সশরীরে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে নিম্নতলে বসা। পার্বতী থালায় করিয়া উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি মিষ্টি প্রসাদ ও ফল লইয়া আসিয়াছেন। তিনি ভক্তিভরে ঠাকুরের পার্ষদদ্বয়ের হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন। আর পরে সমাগত সাধু ও ভক্তগণের হাতেও দিলেন। আর সকলকে অন্ন প্রসাদ

পাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় লইলেন। কেবল জগবন্ধু, গদাধর ও ছোট অমূল্য আর উদ্বোধনের চন্দ্র ও কার্ত্তিক মহারাজকে উপরে গিয়া বসিয়া প্রসাদ পাইতে বলিয়া গেলেন। মিত্র-গৃহিণী স্বহস্তে পরিতোষপূর্বক সাধু ও ভক্তগণকে নানাবিধ উপকরণে ভোজন করাইতেছেন। শ্রীশ্রীনাগ-মহাশয়ের দৈবী সেবা শ্রদ্ধা ও প্রেম যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছে আজের উৎসবে।

ভক্তগণ ফিরিবার সময় কেহ কেহ নিকটস্থ পার্শিবাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি দর্শন করিয়া আসিলেন।

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে ভক্ত মজলিস বসিয়াছে। এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। ভক্তগণ বেঞ্চেতে পূর্ব-পশ্চিমাস্য—বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, শান্তি, জগবন্ধু, ছোট অমুল্য, গদাধর প্রভৃতি।

আজ শ্রীম উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ। এই আনন্দ নির্ঝরের ন্যায় বিগলিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয়-মন সরস ও সন্দীপ্ত করিতেছে।

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি)—দু'দিন একদিন উৎসব কি? নিত্য উৎসব হবে! আনন্দময় সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। কার হয় সে-টি? যিনি সর্বদা সমাধিস্থ, যেমন ঠাকুর। ঠাকুরের নিকট উৎসব চলছে সর্বদা, অহর্নিশ! তিনি নানাভাবে ঈশ্বরের আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করছেন। কখনও দেখছেন, মা-ই সব হয়ে লীলা করছেন। কখনও দেখছেন, মা মহাকাল-রূপ ধরে বিশ্বের বিনাশ করছেন। বলেছিলেন, একদিন দেখলাম সমস্ত বিশ্বটা একটা মৃত্যুর স্তূপ। আমি তার মাঝে বসে ধ্যান করছি। ঐ উৎসবানন্দই সত্যিকার আনন্দ। যেই একটু ভেতরে গেল মন অমনি ঐ আনন্দ-সমুদ্রে গলে গেল। কোনও সংবাদ নাই আর। কে নেয় সংবাদ? যে নেবে সেই মনটা, সেই বুদ্ধি সেই 'আমি'টার যে অস্তিত্বই নাই। সেখানে এক নাই দুই নাই, সব শূন্য! অথচ সেটা একটা negative state (নাস্তিত্ব) নয়। অস্তিত্ব। মুখে বলা যায় না।

তাই বিদ্যাসাগর মশায়কে ঠাকুর বলেছিলেন, ব্রহ্ম এঁটো হয় নাই। মুখের ভিতর দিয়ে বলা যায় না। এদিককার একটা শূন্য। বিশ্ব নাই। ঠাকুর এই মহাসমুদ্রে ডুবে গেলেন, ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রে। একটু পর যেই নিচে এলেন নেমে, তখন দেখছেন সেই আনন্দস্বরূপই বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। বলেছিলেন, দেখলাম গাছপালা ঘরবাড়ী, বাগবাগিচা মালী, মানুষ, পশুপক্ষী, বিড়াল কুকুর সব আনন্দে মোড়া, আনন্দস্বরূপ নামরূপ নিয়েছেন। জীবজগৎ হয়েছেন। এই জন্মালেন, এই নানারূপে খেলছেন, আবার সব ধ্বংস করছেন, বিনষ্ট হচ্ছেন। কি কুহেলিকা। এটাই ঠিক উৎসব। বিশ্বের জন্মোৎসব, ক্রীড়োৎসব, নৃত্যোৎসব। কিন্তু সবই আনন্দোৎসব। ঐ উৎসবে তো সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ। তাই তারা এই সব উৎসব করে। যাঁরা ঐ উৎসবের, ব্রহ্মোৎসবের সন্ধান পেয়েছেন তাঁদেরই মহাপুরুষ বলা হয় extraordinary personalities. তাঁদের জীবন আচরণ, তাঁদের মহাবাণী নিয়ে আনন্দোৎসব। নিত্য উৎসব—বিশ্বের জন্মোৎসব।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন ক্ষণকাল। পুনরায় আনন্দ বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হয়ে গেল একপক্ষকাল। কিন্তু একপক্ষ কেন? নিত্যোৎসব হয় না কেন? এমন কোন স্থান আছে কি, যেখানে নিত্য ব্রহ্মোৎসব হয়? শুনেছি, অমৃতসরে খানিকটা হয়। সর্বদা ভজন কীর্তন গ্রন্থ-সাহেব পাঠ চলছে। অখণ্ডোৎসব। আর জগন্নাথ মন্দিরেও লেগেই আছে উৎসব। আজ ভগবানের চন্দনযাত্রা, কাল স্নানযাত্রা, আবার রথযাত্রা, ঝুলন, দোলযাত্রা কত কি। সারা বছর ধরে উৎসব লেগেই আছে।

এ সব ব্যবস্থা কি আর মানুষ করেছে? ভগবানই ভক্তদের জন্য এ সব করে রেখেছেন। বড় লোক কি করে? আরামের জন্য নানা বাড়ীঘর করে, নানান খানা করে। তেমন ভগবান ভক্তদের জন্য নানা স্থানে নানারূপ উৎসব রচনা করে রেখেছেন। এ সব যেন আনন্দ-গঙ্গা। গঙ্গায় স্নান করলে যেমন শরীর শীতল হয়, এই সব উৎসবানন্দে অবগাহন করে মনের মলিনতা, দুঃখ দৈন্য দূর করে। আর নূতন শক্তি

নূতন আনন্দ, নূতন উৎসাহ লাভ করে সরস ও সতেজ হয়। তাই এ সবের ব্যবস্থা করেছেন ঈশ্বর। এ সব আনন্দোৎসবে গেলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যান না আপনারা, ফস করে দেখে আসুন না অমৃতসর। কি-ই বা দূর ? আজ রাত্রে গাড়ীতে বসলে পরশু সকালে পৌঁছে যাবেন। রেল হওয়ায় বড় সুবিধা হয়েছে। যান না। আরও শীঘ্র যদি যেতে চান এরোপ্লেনে যান (হাস্য)। (স্মিত হাস্যে) কুঁড়ে যারা তারা কেবল মনোরথে যেতে চায় (সকলের হাস্য)। এ ল্যাটা নাই। পয়সা খরচা নাই। আর্ম-চেয়ারে বসেই হতে পারে। আবার মুখে সিগার।

(বড় জিতেনকে লক্ষ্য করে) মনে মনে তীর্থ করলে হয় না। পায়ে হেঁটে যাও। কে পারে মনে মনে যেতে ? যার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট, যে বহুবার যাওয়া-আসা করেছে সে পারে মনে মনে যেতে। নড়তে চায় না কুঁড়েগুলি। অত কাছে মঠ, তবুও যাবে না। এমনি আলস্য।

বড় জিতেন (যুক্তকরে)—মশায় আমি অপরাধী ! এরা সকলেই যায়। আমিই মঠে যাই না। কেবল এখানেই আসি। আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না।

শ্রীম—তা' বললে কি হয় ? বুদ্ধি দিয়েছেন কেন তিনি ? জোর করে যেতে হয়। মন তো আরাম চায়ই। শরীরের কথা কি ? কিন্তু এই জড়তা না ভাঙ্গলে জীবন্মুক্তের আনন্দ লাভ হয় না।

সর্বত্যাগীদের কাছে না গেলে নিজের অবস্থা বোঝা যায় না। গেলে compare (তুলনা) করা চলে। তাঁরা কোথায় আর আমরা কোথায়। সাধুরও সাধুসঙ্গের দরকার, ঠাকুর বলেছেন। তা' যদি হয় তবে যারা ঘরে আছে তাদের আরো কত বেশী দরকার সাধুসঙ্গের। সাধুরা দিনরাত ঈশ্বরকে নিয়ে আছেন। যা কিছু করেন তার ফল

ঈশ্বরে দিয়ে দিচ্ছেন। আর যারা গৃহে আছে তারা কি করছে ? দিন রাত স্ত্রী-পুত্রকন্যার সেবায় মগ্ন। অর্থোপার্জনে বেশীর ভাগ শক্তিক্ষয় হচ্ছে। আর বাকী শক্তিক্ষয় হয় দেহসুখে, স্নেহবন্ধনে। এই lost (হারানো) শক্তি regained (পূর্ণ) হয় সাধুসঙ্গে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তিনি যখন মঠ করেছেন তখন তার advantage (সুযোগ) নেওয়া উচিত। সর্বত্যাগীদের জীবন না দেখলে আমরা ঘরে কোথায় পড়ে আছি তা' বোঝা যায় না। মনে হয় বেশ আছি। এই আত্ম-প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে মঠে গেলে। তখন মন তৈরী হয়। উচ্চ ও উন্নততর রঙে তখন মন রঙিন হয়ে যায়। তখন 'মনোরথে' গেলেও চলতে পারে। যতক্ষণ মন সংসারে আসক্ত থাকে, স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় কুটুম্বের স্নেহে মন ডুবে থাকে, ততদিন সাধুসঙ্গে সশরীরে যাওয়া উচিত। মনে মনে গেলে চলবে না।

প্রথম খুব খাটতে হয়। মন যখন বোঝে, ঈশ্বর আগে পরে জগৎ, যেমন সাধুরা বুঝেছেন, তখন ঘরে বসে সাধুসঙ্গ করা চলে। তখন শরীরের ব্যবধান দূর হয়ে যায়। ঘর আর মঠ এক হয়। এ অনেক দূরের কথা। কারু কারুকে এরূপ তৈরী করে তিনি ঘরে রাখেন লোকশিক্ষার জন্য। এঁদের দেখাদেখি ঘরে বসে সাধুসঙ্গ করতে গেলে এদিক ওদিক দু'দিক যায়।

সাধুসঙ্গ করতে করতে মন চৌদ্দ আনা তৈরী হয়। ঠাকুরের মন ষোল আনা তৈরী ছিল।

স্বভাবতঃ মন সংসারে যায়। নিজের দেহে মিশে আছে। এই দেহের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকে। মা না খেয়ে নিজের ছেলেকে খাওয়ায় কিন্তু পরের ছেলেকে এ ভাবে খাওয়াতে পারে না। নিজের ছেলেমেয়ের জন্য মুক্তহস্ত। কিন্তু অপরকে কিছু দিতে হলে হাত বেঁকে আসে। যতদিন এই দুরবস্থা ততদিন সাধুসঙ্গ বই উপায় নাই।

সাধুরা সর্বভূতে নারায়ণ দেখেন ; তাঁর সেবা করেন সকলের ভিতর। আর গৃহস্থরা কি করে ? নারায়ণ দেখা বহু দূরে। তাই সাধুদের

কাছে গিয়ে এইটে শেখা। অভ্যাস করতে করতে হয়। সাধুদের সেবা করতে করতে এইটি হতে পারে। তাঁদের ভালবাসা পেলে ঈশ্বরের ভালবাসাও পাওয়া যায়। সাধুরা যে ঈশ্বরের রূপ। নিজের ছেলের ভিতর বেশী নারায়ণ-বুদ্ধি করলে হয় না, প্রথমেই। সকলের ভিতর নারায়ণ-বুদ্ধি অভ্যাস করতে হয়—প্রথমে সাধুদের দেখে, তাঁদের সেবা করে, তাঁদের সঙ্গ করে। তখন সকলের ভিতর নারায়ণ দেখার অভ্যাস হয়। তখন ছেলের ভিতরও নারায়ণ-বুদ্ধি হতে পারে। আর্ম-চেয়ারে বসে হয় না। কেবল মুরুব্বিয়ানা হয়। হাতে-নাতে সাধুসঙ্গ-সাধুসেবা করা চাই। পায়ের সৎ ব্যবহার চাই। পায়ে হেঁটে যাওয়া চাই সাধুদের কাছে। তা' না করলে কিছুই হবে না। মুখে বলা আর হাতে করা অনেক তফাৎ। মন মুখ হাত এক করতে হয়।

লোকের মনে থাকে একটা কথা, মুখে বলে আর একটা কথা, হাতে আনে আর একটা কথা। এই triangular (ত্রিকোণ) আচরণ। এই ত্রিভুজকে পিটে পিটে এক straight line (সরলরেখা) করতে হবে। তখনই মন মুখ এক হয়। অতঃপর এই straight lineকে (সরলরেখাকে) পিটে পিটে একটা pointএ (বিন্দুতে) আনতে হবে। এই পয়েন্টই সমাধি, ঈশ্বর। এটাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

সাধন ভজন যা কিছু করে লোক, তার উদ্দেশ্য মন মুখ এক করা। সাধুরা এই কাজে ব্রতী। Wholetime man (চব্বিশঘণ্টার কর্মী)। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাঁরা সোনা গালাতে বসেছেন। বাড়ীঘর বাপ মাকে ছেড়ে দিয়ে। মঠ এই workshop (কারখানা)। মঠ ব্রহ্মজ্ঞানী তৈরীর ফ্যাক্টরী।

ভগবানের পথে যত প্রতিবন্ধক, এ সব দূর হয়ে যাবে মঠের সাধুসঙ্গ করলে। সাধুসঙ্গ বই আমাদের উপায় নাই। আলস্য ও অভিমান ছেড়ে দিয়ে মঠে যাওয়া উচিত। সাধুসঙ্গের substitute (বিকল্প) নাই। কারণ সাধুরও সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। তা' হলে গৃহস্থের আরো কত অধিক প্রয়োজন! যত বড় সেয়ানই হোক, কাজলের ঘরে থাকলে

কাজল লাগবেই, ঠাকুর বলতেন। এই কাজল দূর করার জন্যে সাধুসঙ্গে যেতে হয়। আর কিছুতেই কাজল যায় না। 'আমি, আমার' এই কাজল। এরই নাম অজ্ঞান, অবিদ্যা। সাধুসঙ্গ করলে এই অজ্ঞান নাশ হয়। 'তুমি, তোমার' হয়, 'আমি, তোমার' হয়। এরই নাম দাসীবৎ সংসারে থাকা। এর একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় ঠাকুরের লীলা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একদিন একটি ছবিওয়ালা এসেছে। বাক্সের ভিতর ছবি। একটি আংটি সুতায় বাঁধা। আংটি ধরে টান দেয় আর বাক্সের ভিতর ছবিগুলি বদলাচ্ছে। ছেলেদের দেখায়। এক পয়সা করে নেয়। বাক্সের গায়ে দু'তিনটি গ্লাসের ডিবা। ছেলেরা এই গ্লাসের ভিতর দিয়ে বাক্সের ভিতরের ছবি দেখে, গ্লাসের গুণে ছবিগুলি বেশ বড় দেখায়। লোকটি বেশ গানের সুরে বলে। বলছে, 'এই এল কলকাতা সহর'। 'এবার দেখ বোম্বাই নগর'। প্রত্যেকটা কথার পরে তাল ঠিক রাখার জন্য বলে 'হা'। যেমন বলছে, 'এই দেখ এবার এল রাজারানীর দরবার, হা'। এইরূপে নানা ছবি দেখাচ্ছে।

হঠাৎ বললে, 'এবার কর দরশন বদরী নারায়ণ, হা'। ঠাকুরের বালকের স্বভাব। শুনেই কৌতুহলী হয়ে উঠে গিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখেই একেবারে বেহুঁস। ভাবসমাধিতে নিমগ্ন। কে আর দেখে তখন ছবি। ব্যুত্থিত হলে, লোকটিকে পয়সা দিতে বললেন। একজন এক আনা কি ছ' পয়সা দিল। ঠাকুর রেগে বললেন, সে কি, বদ্রীনারায়ণ দর্শন করালে, তার দাম ছ' পয়সা! টাকা দিতে হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের মন ঐতেই (ঈশ্বরে) চড়ে আছে রাত দিন! একটু উদ্দীপন হতেই সমাধি! যেন শুকনো দেশলাই। একটু ঘসলেই জ্বলে ওঠে ফস্ করে। যা দেখছেন, যা শুনছেন তাতেই উদ্দীপন। বাবা, কি মন! এমনটি আর দেখা যায় না।

অন্য লোকের মন ভিজে দেশলাই। ঘষ, জ্বলবে না। জোর

কর, কাঠি ভেঙে যাবে। ভোগেতে, কামিনীকাঞ্চনে মনকে ভিজিয়ে রাখে। ওটা ত্যাগ হলেই শুকনো হয়ে যায়। এই শুকনো করার উপায় ঠাকুর বলে দিছলেন। বলেছিলেন, সর্বদা সাধুসঙ্গ কর।

বলেছিলেন, মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। যত সাধনভজন, সবই মন তৈরী করার চেষ্টা। একবার তৈরী হলে তখন বসে বসে আনন্দ কর। তখন বিপদই হোক কি সম্পদ হোক, মনে আনন্দ থাকে। পাণ্ডবদের বনবাসেও আনন্দ ছিল।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—ঠাকুর ভক্তদের মন এমনি করে তৈরী করে দিতেন যে, যা দাগ লাগে তা' আর উঠে না। কত বৎসর হয়ে গেল (৩৮ বৎসর) তিনি চলে গেছেন। কিন্তু ভক্তরা (শ্রীম) এখনও দেখছে তাঁর লীলা-অভিরাম যেন কাল হয়ে গেছে—কিংবা এই হচ্ছে চোখের সামনে।

আজ আসতে আসতে মনে হল আমহার্স্ট স্ট্রীটে শরৎ মহারাজদের বাড়ীর কথা। হ্যারিসন রোডের ক্রসিং-এ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছিল। উনিও সঙ্গে মোটরে বসা। সব ভেঙ্গে-চুরে রাস্তা ঘাট হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ছবি মনে লেগে আছে। সুরেশবাবুর বাড়ীও ভেঙ্গে গেছে রাস্তায়। কিন্তু ঠাকুর নৃত্য করছেন সেখানে এখনও দেখছি। মেছুয়াবাজারে ঈশান মুখার্জীর বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে পায়চারী করছেন বাইরের ঘরে, আর কথা বলছেন, তাও দেখছি কেমন ? যেন এই মাত্র করে এলাম। কেশব সেনের বাড়ীতে নৃত্য, অধর সেনের বাড়ীতে নৃত্য ! আহা কি দেবদুর্লভ নৃত্য ! মানুষের মনপ্রাণ হরণকারী নৃত্য দোতলার ঘরে, দু' জায়গায়ই। চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসছে। যেন আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি।

ডাক্তার বক্সী—কর্মই যত গোল বাধায় !

শ্রীম—তা' বটে। তবে গুরুর আদেশে করলে ভয় নাই। মন সাফ হয়ে যায় (সে কর্মে), চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম করা বড় কঠিন, বড় মুস্কিল। কিন্তু এই আসান—গুরুবাক্যে কাজ করা। গুরু জানেন কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ।

(সহাস্যে) একজন পিশাচসিদ্ধ ছিল। সে একটা ভূতকে দিয়ে সব কাজ করায়। যা বলে তা' মুহূর্তে করে ফেলে। এখন কাজ আর পায় না। কাজ দিতে না পারলে তার ঘাড় ভেঙ্গে খাবে, এই চুক্তি ভূতের সঙ্গে। নিরুপায় হয়ে গুরুর শরণাপন্ন হলো। গুরু বললেন, আচ্ছা, বাড়ী গিয়ে উঠোনে একটা বাঁশ পুঁতে দাও। আর ভূতটাকে বল, একবার উপরে উঠ, একবার নিচে নাম। ভূতটা ঐ করছে দিন রাত। সে তখন রক্ষা পেয়ে গেল। তেমনি সব কাজ।

গুরু এসে যা বলে গেছেন তাই করা উচিত। তবে মন তৈরী হবে। বলেছেন, নিত্য সাধুসঙ্গ করতে—তা' করা উচিত। আর, নিত্য জপ ধ্যান পূজা পাঠ করা। আর, প্রার্থনা করা। মাঝে মাঝে নির্জনবাস। এই সব করলে মন তৈরী হয়। তখন আনন্দ। গুরুবাক্য বই আর উপায় নাই। গুরু মানে অবতার, এই ঠাকুর।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৩১শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রী:
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। রবিবার শুক্লা প্রতিপদ, ২০ দণ্ড।:৫ পল।

নবম অধ্যায়

এরা বোম্বাই আমের জাত

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শয়ন কক্ষ। এখন অপরাহ্ন চারটা। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিতেছেন, একবার পার্শীবাগান যাওয়া দরকার। যান একবার, যদি শরীরে কুলোয়। খবর করে আসুন। শরৎবাবুর খুব অসুখ শুনছি। যাবার সময় হয়েছে।

জগবন্ধু তখনই রওনা হইলেন। পার্শীবাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র মিত্র খুব অসুস্থ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। বিবাহিত হইলেও জীবন ঠিক সাধুর মত। সর্বদা গুরুবাক্যে বিশ্বাসবান হইয়া জীবরূপী শিবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তান স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে স্বামী রামেশ্বরানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত মায়ের বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। উহা শরৎবাবুর মুখে দিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

জগবন্ধু শরৎবাবুর কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলেন, মাস্টার মহাশয় আমাকে পাঠাইয়াছেন আপনার সংবাদ লইতে। শরৎবাবু চক্ষুতে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীমকে প্রণাম জানাইলেন। তিনি সকল সংবাদ শুনিয়া স্থিরগম্ভীর হইয়া রহিলেন। শরৎবাবুর শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে পুনর্মিলন অতি সন্নিকট।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য, চেয়ারে। কাছে জগবন্ধু, গদাধর প্রভৃতি বসা বেঞ্চেতে। শ্রীম প্রথমে হাততালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিতেছেন। তারপর কোলের উপর যুক্তকর রাখিয়া ধ্যানমগ্ন। ভক্তগণ ইতিমধ্যে একে একে আসিয়া জুটিলেন। দুর্গাপদ (হিলিংবাম), ছোট জিতেন, বলাই, মনোরঞ্জন, ছোট রমেশ, শান্তি, হরি পর্বত প্রভৃতি বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন।

ধ্যানান্তে শ্রীম ছোট জিতেনের সঙ্গে আগ্রহ সহকারে কথা কহিতেছেন। তাঁহার বাড়ীর সংবাদের জন্য তিনি খুব ব্যস্ত। ইনি রাত্রিতে স্কুলবাড়ীতে থাকেন জগবন্ধুর সহিত। রাণাঘাটে বাড়ী। সেখানে অসুখ-বিসুখের সংবাদ পাইয়া গিয়াছিলেন, আজ ফিরিয়াছেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আজই ইনি (জগবন্ধু) আপনাকে চিঠি দিয়েছেন। খবর না পেয়ে আমরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। খবর ভাল তো সব?

ছোট জিতেন—আজ্ঞে হাঁ। এখন সব ভাল। খুব ঝাপটা গেছে।

বড় জিতেন (প্রবেশমাত্র প্রণামান্তর)—কি কথা হচ্ছে আপনাদের?

শ্রীম—এই তাঁরই লীলার কথা হচ্ছে। আমরা সব তাঁর হাতের যন্ত্র। ঠাকুর তাই বলতেন, সব তার 'অণ্ডারে' (underএ)। জপ ধ্যান তপস্যা, এ-ও তাঁর আণ্ডারে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ম্যালোরি ও আরভিনের (Malory

and Irvine) দেহ গেল এভারেস্টে। অত বড় ব্রিটিশ গভার্নমেণ্ট, কিন্তু ঐ লোক দু'টির দেহ রাখতে পারলো না। কেহ গিয়ে help (সহায়তা) করতেও পারলো না। দেখ না, কি দুরবস্থা মানুষের! কত মেসিনগান, কত কিছু রয়েছে, কিন্তু রাখতে পারলো না তাদের দেহ। এই তো ক্ষমতা মানুষের! আর এই মানুষই বলে কিনা, এভারেস্টের মত উঁচু আর কিছু নাই। কি আশ্চর্য! বলে কি? এ আর কত উঁচু? না হয় পাঁচ মাইল!

দেখ না চেয়ে একবার উপরে। ওরা (তারকাসমূহ) কত উঁচুতে রয়েছে। এক সূর্যই দেখ না, কত কোটি মাইল উচ্চে। তারাগুলি নাকি আরও উঁচুতে। আর বলে নাকি, মাউণ্ট এভারেস্টই সব থেকে উঁচু!

Expert opinion (সুদক্ষ অধিকারীদের মত)—যারা খুব expert astronomers (সুযোগ্য জ্যোতির্বিদ) তাঁরা বলেন—এই যে দেখা যাচ্ছে তারা, এগুলি এক একটা সূর্য। তার চতুর্দিকে নক্ষত্র ও satellitesও (উপগ্রহও) ঘুরছে, ঠিক আমাদের solar systemএর (সূর্যমণ্ডলের) মত।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, কৈলাসের পথে কারো দেহ গেলে তার আর জন্ম হবে না। কেদার-বদ্রীও কৈলাসের পথেই। যারা ঐ রাস্তায় দেহ ত্যাগ করে তাদেরও না—আর জন্ম হবে না। ম্যালোরি ও আরভিনের দেহ এভারেস্টে গেল। তাও বলা যায় কৈলাসের পথ।

(ভক্তদের প্রতি) ঠাকুর গল্প করতেন, একজন সাধু একটা জলের ঝরণা দেখে—অনেক জল পড়ছে কিনা—অবাক হয়ে রোজ গিয়ে তার কাছে বসে থাকত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর সাধুটি বলতো, হ্যাঁ, এ কি করেছে দেখ, এক ঝরণাতেই এই কথা! আর এই যে কাণ্ড উপরে রয়েছে, তার কি হল! সাধুটি সারা দিন বসে বসে ঐ বলতো, আর রাত্রে কুটিরে এসে ফলমূল খেত।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—ঠাকুর একদিন বললেন, এইটুকু ছেঁদা

হয়েছিল, আবার বুজে গেল—মহামায়া দেখালে। নরুন দিয়ে একটু ছেঁদা করছি আর অমনি বুজে যাচ্ছে। হঠাৎ একবার অনেকটা হল। তা' দিয়ে ওপারের অনেকটা দেখা গেল,—অসীম অনন্ত ব্যাপার।

অর্জুন ছিটে-ফোঁটা দেখেই একেবারে 'বেপথু'—কাঁপতে লাগলেন। এমনতর কাণ্ড! এই মানুষ কি করে বলে, আমি জ্ঞানী, আমি পণ্ডিত! এই সব দেখে ঠাকুর অবাক হয়ে যেতেন।

ওপারের কিছু দেখতে দিচ্ছে না—উপরের সব। মানুষগুলিকে নিম্নদৃষ্টি করে রেখে দিয়েছে। অবাক হয়ে বলতেন, তুমি কে মা? এই তাজ্জব কাণ্ড করে রেখেছ—জন্ম-রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, জরা-মৃত্যু। আবার স্নেহ, যা দিয়ে এতো সবের ভিতরও মানুষকে পরস্পর বেঁধে রেখেছে। ধন্য মহামায়া!

বেদে মহামায়ার definition (সংজ্ঞা) দিয়েছেন, যা realকে (সত্যকে) unreal (অসত্য) করে দেয় আর unrealকে (অসত্যকে) real (সত্য) করে দেয়, তাই মহামায়া।

তিনি, 'দেবাত্মশক্তি স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্'—বেদের কথা। ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভাল বলে দেখান তিনি। এই তাঁর কাজ।

তাই সাধুসঙ্গের দরকার সর্বদা। এ-টিতে ধাত ঠিক রাখে। সাধুরা সর্বদা মায়ের এই খেলা দেখতে চেষ্টা করছেন কি না! এ-টি মনে রেখে সংসার করা।

এই যে অত সব কাণ্ড হচ্ছে অহরহ চোখের সামনে, তা' কয় দিন আমাদের স্মরণ থাকে? সব ভুলিয়ে দেন মহামায়া। এই যে জাপানে অত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, এক কোপে পাঁচ লাখ লোক গ্রাস করলো—tidal wave (সমুদ্রের বানে) ভাসিয়ে নিল, তা' কয়দিন মনে থাকবে? যদি মনে থাকতো, তবে সংসার চলতো না। কেউ আর কাজকর্ম করতো না। তারপর ইটালির flood (বন্যা), আবার মালাবারের দুর্ঘটনা, এই সব কয়দিন মনে থাকে?

আজকাল আবার কেহ কেহ বলে আটলান্টিক মহাসাগর একটা continent (মহাদেশ) ছিল। তা'তে আটলান্টিক জাতি বলে লোক

ছিল। কোথায় গেল সে সব? এ সব কাণ্ড কেন করছেন? লোকের চৈতন্যের জন্য। কিন্তু তা' হয় কই?

শব নেবার সময় হিন্দুরা বলে, 'বল হরি, হরি বোল' 'রামনাম সত্য'। আর মুসলমানরা বলে, 'লায় লাহা ইল্লেল্লা, মহম্মদ। রসুল্লুল্লা!' এ কি শিক্ষা দেয়? না, সবই ধ্বংসের মুখে বসে আছে। এগুলি অবশ্য ছোট ছোট destruction (বিনাশ)। বড় destruction (বিনাশ) আসছে। আর বলছে, হে জীব, তোমার দেহ বিনষ্ট হবে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। এই আত্মার সেবা কর।

এই যে রোজ হাজার হাজার প্রাণী বধ হচ্ছে, কি জন্য তা' হচ্ছে কে বলবে? তবে এটা বোঝা যাচ্ছে, সব তাঁর ইচ্ছা। রোজ সকালে ঘর থেকে শুনতে পাই জানোয়ারগুলি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে যাচ্ছে। আবার খানিকক্ষণ পরে দেখি, সেগুলি কেটেকুটে মুটের মাথায় চড়ে আসছে।

আমরা কালীঘাটে যেতাম ছেলেবেলায়। তখন বয়স আট দশ বছর। পাঁঠাগুলির বলি হচ্ছে দেখে ভাবতুম আমরা বড় হলে এটা বন্ধ করে দেব। তখন ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) ছিল কি না! বুড়ো হয়ে এখন বুঝতে পারছি, ওমা সব যে তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যদি বল কেন, এসব কাটাকুটি হচ্ছে? কেন তিনি এসব করছেন? তার উত্তর, কি করবে এই পশুর জীবন দিয়ে? তাঁর দিকে মন নাই, তা' হলে এ জীবনে কি লাভ? তাই বলির ব্যবস্থা। এই কথাই মনে হচ্ছে। আবার মানুষের মধ্যেও যারা পশুভাবাপন্ন, তাদেরও বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল পূর্বে। মানে এই, কি করবে এই শরীর দিয়ে তাঁর দিকে যদি মন না রইল।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—যে দেহ থাকবে না তা' নিয়ে এতো কেন? এ মহামায়ার কাজ। তিনি সব ভুলিয়ে দেন। তাই ঠাকুর বলতেন, মহামায়াকে আগে সন্তুষ্ট করতে হয়। আহা, আমাদের বন্ধুটি (ভোলানাথ মুখার্জী) কি গানই গান!—

কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে আনিয়ে এ ভবে ভাবালে আমায়।
এ দেহ সন্দেহ, ত্বরা করি দেহ, রসিকের দেহ জলবিম্বপ্রায়॥

কখন যায় এ দেহ তার ঠিক নাই। তবে কেন তার জন্য এতো ভাবনা? যা থাকবে—সেই আত্মা, ঈশ্বর, তাঁরই ভাবনা করা উচিত!

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—জগবন্ধুবাবু, আজ (কথামৃত) ছাপা হয় নাই?

জগবন্ধু—আজ্ঞে ছাপাখানা বন্ধ আজ।

শ্রীম—তাই আনেন নাই কিছু (প্রুফ্)।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—আমরা বুঝতে পারছিনা কেন এ সব?

শ্রীম—দেহবুদ্ধি থাকলে বোঝা যায় না এসব। এখন এই দেহবুদ্ধি যায় কিসে? তপস্যায়। তাই তপস্যা করা। তপস্যা দ্বারা এই দেহবুদ্ধি দূর হয়। নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকলে তিনি দূর করে দেন দেহবুদ্ধি।

এই feeling, affection (স্নেহ, মমতা) এগুলি দেহবুদ্ধি থেকে হয়। ছেলের অসুখ। বলছে, আহা, কি কষ্ট এর। এর মানে, তার নিজেরও ঐ সব ভাব রয়েছে—অসুখে কষ্ট, সুখে সন্তুষ্ট। তাই ছেলের কষ্ট বুঝতে পারছে।

তবে অবতার-পুরুষের এ নয়। ঈশ্বর যখন যেভাবে অবতার-পুরুষকে রাখেন তিনি সেই ভাব ধরেন। তাঁর দেহবুদ্ধি নাই।

২

শ্রীম নীরব। কিছুক্ষণ পর পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ডাক্তারবাবু আসেন নি? (হরি পর্বতের প্রতি) বুঝলে হরিবাবু? ছেলেবেলায় আমরা একটি হালুয়াবেচা পরমহংস দেখেছিলাম। এখন যেখানে 'আর্য-সমাজ', সেখানে। সর্বদা হাসি লেগে আছে মুখে। আর গান। কখনও বিষাদ দেখি নাই। তাই সকলে পরমহংস বলতো। তার মিঠাইয়ের দোকান ছিল। হালুয়ার

quantity (পরিমাণ) বেশী দিত (হাস্য)। হরিবাবু, তুমিও বালতি বেশী দিও। (তাঁর বালতির কাজ)। (সকলের উচ্চ হাস্য)। আহা, ঠাকুরের ভাবটি কোথাও দেখলে ভাল লাগতো।

শ্রীম—দুর্গাবাবু, আপনাকে সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) কি বলেছিলেন সেদিন ?

দুর্গাপদ—মঠে সেবাকার্যের কথা ছাড়া বড় একটা অন্য কথা হয় না কিনা আজকাল। তাই সুধীর মহারাজ বললেন, 'মায়ের কথা' বের হচ্ছে। এতে সাধনভজন তপস্যা, এই সব কথা আছে। এ থেকে একটা new light (নূতন উদ্দীপনা) পাওয়া যাবে।

শ্রীম—আজ শুনুন এখন কি বলছেন। এঁকে (হরি পর্বতকে) বলেছেন সুধীর মহারাজ, কয়েকদিন ধরে জুনিয়ারদের মধ্যে একটা formal inspiration (প্রকাশ্য উদ্দীপনা) এসেছে। বলছে, চার দিকে ছুটে যাও। তপস্যা কর। আর সব কাজ ছেড়ে দাও।

তা' হবে না বৈরাগ্য ! কত আর ভাল লাগে ? বাপ মা বাড়ীঘর সব ছেড়ে এসেছে কিনা। তাই ভিতরটা সর্বদা জ্বলছে। কিছুদিন কাজ করলো, আবার তপস্যা। তা'তে ধাত ঠিক থাকে। নচেৎ ঘরবাড়ীর মত হয়ে যায়। নির্জনে গেলে তখন উদ্দেশ্যের প্রতি ভালবাসা হয়। তারপর এসে কাজ কর। তা'তে কাজও ভাল হয়। নইলে একঘেয়ে হয়ে যায়। কাজও তপস্যা, এর alteration (অদল বদল) ভাল, সঙ্ঘের পক্ষে।

'যা বেটা এক্ষুনি বেরিয়ে যা। মঠকে বাড়ীঘর বানিয়ে তুলেছিস। এক কুর্সি ছেড়ে আর এক কুর্সিতে বসেছিস। যা তপস্যায় বেরিয়ে যা।' এই বলে একজনকে মাদ্রাজ মঠ থেকে তপস্যা করতে পাঠিয়ে দিলেন রাখাল মহারাজ।

পুরানো দল গেল, নূতন দল কাজ করলো। এই ভাবে কাজ করলে কাজ ও তপস্যা দুই-ই হয়। তপস্যাও কাজ। আর মঠেই কি কম কাজ ! ঠাকুরসেবা রয়েছে। তারই কত কাজ ! তারপর রিলিফ, ডিস্‌পেনসারী কত কি।

ঠাকুরের যখন অসুখ, তখন কয়েক মাস ধরে ভক্তরা খেটে খেটে এলিয়ে পড়েছে। ঠাকুর তখন বললেন, ওরে একটা মাদুর ও একটা বালিশ রেখে দে, ইচ্ছা হলে শুতে পারবে। তা' না করলে এরা আসবে না। দেখ, ভগবানের সেবা, গুরুসেবা, তা'তেই এই। বাইবেলে তাই বলেছে, **Jesus knew what was in man**! মানুষের দেহবুদ্ধিজনিত দুর্বলতার কথা ক্রাইস্টের জানা আছে।

ছেলের অসুখ হলো কি, আদরের একজনের অসুখ হলো। প্রথম প্রথম বিছানার চারদিকে লোক ধরে না। ওমা, কিছুদিন ভুগলে তখন আর পাওয়া যায় না কারুকে। এমন শরীর! কি করে এরূপ না ক'রে ? **Self-preservation instinct**-টি (আত্মরক্ষার চেষ্টাটি) যে রয়েছে। এ শরীর দিয়ে বেশী চলে না।

শ্রীম (হরিবাবুর প্রতি)—তবুও ওদের (মঠের সাধুদের) কাজ ভাল—**altruistic** (পরোপকারের) কাজ। কিন্তু বালতির কাজ, সে এ নয়! কি বল হরিবাবু ?

(ভক্তদের প্রতি) ইনি বালতির কাজ নিয়েছেন। কাজ কি ছাড়ে, দেখ না ? সকাম কাজে বন্ধন হয়। আর নিষ্কাম কাজে তাঁকে পাওয়া যায়।

গুরুর আদেশে যা করা যায় তা'তে বন্ধন হয় না। নিজের ইচ্ছায় করতে গেলেই বন্ধন হয়। এমনি মহামায়ার কাণ্ড। কোন্‌টা সকাম কোন্‌টা নিষ্কাম তা' বুঝতে দেয় না। মনে করছি নিষ্কাম, কিন্তু ভিতরে হয়তো লোকমান্য হবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু গুরু সব জানেন। যেমন এক হাজার গাঁট একটা দড়িতে। কেহ একটা গাঁটও খুলতে পারছে না। বাজীকর হাত নাড়িয়ে এমন এমন করে সবগুলি খুলে ফেলে। তেমনি গুরু। তিনি সব খুলে দিতে পারেন হৃদয়ের গ্রন্থি। ঠাকুর নিজহাতে ভক্তদের সব হৃদয়গ্রন্থি খুলে দিয়েছেন।

শ্রীম (স্বগত)—'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়তে আনন্দেন হি জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' কি প্রহেলিকা!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—জন্মস্থিতিবিনাশ—সকল জীবজন্তর,

সমগ্র বিশ্বের—আনন্দে করছেন ঈশ্বর। আনন্দেতে বিনাশ হয় কি করে তা' মানুষ কি করে বুঝবে! জন্ম ও স্থিতি, আনন্দে হয় এটা বুঝতে পারে মানুষ। জন্মস্থিতিবিনাশ, ভগবান আনন্দে করছেন, এই বিশ্বসংসারের, যদি এটা কেউ বোঝে, তা' হলে সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হবে। কেবল তাঁর কৃপায় এটা বোঝা সম্ভব। ভগবানের স্বরূপই আনন্দ। তা' হলে তাঁর কৃত সব কাজই আনন্দময়। এটা যে জানে, সে জীবিতাবস্থায়ও মুক্ত। অর্থাৎ সংসারের ভালমন্দ, শোকতাপ, তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরূপ লোক অতি বিরল।

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, তারপর সপ্তাহ, মাস, বৎসর—এই করে দিন চলে যায়, মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ কথাটা তাঁর মহামায়ায় বুঝতে দিচ্ছে না। তা' বুঝতে যাকে দেয় সে আর অজ্ঞানের কাজ করতে পারে না।

পর্দা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। স্নেহ মমতা, এই পর্দা। এমনি কাণ্ড! যে বুঝতে পারে ঈশ্বরই এই সব হয়ে খেলা করছেন, তার কাছে মরা-মারা এক হয়ে গেছে। তার আর ভয় নাই। গানে আছে, 'হেরিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে। কি ভয় সংসার শোক, ঘোর বিপদ নাশনে॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পঞ্চভূতের সংযোগ ও বিয়োগে এই সব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। পঞ্চভূত তাঁর মায়াশক্তির সৃষ্টি। বস্তুতঃ এই সব কিছুই নাই। কিন্তু দেখাচ্ছেন যেন সব আছে, সব সত্য। এই পঞ্চভূত দিয়ে সবাইকে ভুলিয়ে রেখেছে। অবতার পর্যন্ত পঞ্চভূতে পড়ে নাকানি চুবানি খাচ্ছে, খাবি খাচ্ছে। তাই তো ঠাকুর বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। তাই তো অবতারকে সকলে ধরতে পারে না। মানুষের মত শোকতাপ দুঃখ, জন্মজরামৃত্যু এ সব বরণ করেন কিনা। বুঝবার যো নাই। এক দিকে মানুষ, তো সম্পূর্ণ মানুষ। অপরদিকে ঈশ্বর। মাঝখানে মায়া। কি করে মানুষ একসঙ্গে এই তিনটে দেখে? সাধারণ মানুষ একধারে থাকে। সেই দৃষ্টিতে সে কেবল মানুষভাবটা দেখতে পায় অবতারের। তাই তাঁকে আদর

করতে পারে না। 'অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবং অজানন্তো মমভূতমহেশ্বরম্।'

আর একদিকে থাকেন মহাপুরুষগণ। তাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন বটে, তবুও তাঁরা সকলে অবতারকে চিনতে পারেন না। তাই ভরদ্বাজাদি দ্বাদশজনমাত্র ঋষি রামকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অপর ঋষিরা বলেছিলেন, হাঁ ভরদ্বাজাদি বলছেন বটে, তুমি ভগবানের অবতার। কিন্তু আমরা তোমাকে বলব মহাজ্ঞানী, আত্মজ্ঞ, মর্যাদা-সম্পন্ন রাজর্ষি। দেখ, মহাপুরুষরা, ঋষিরাও সকলে ধরতে পারলে না। শ্রীকৃষ্ণকেও তাই। মাত্র অসিত দেবল ব্যাস গর্গ, এই কয়েকজন ঋষি চিনেছিলেন, অবতার বলে।

তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে বলতেন, 'অচিন গাছ' একরকম আছে। তাঁকে সকলে চিনতে পারে না। ভক্তরা কেউ কেউ ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর ভিতরে কি হচ্ছে যদি বা তা' বুঝতে পারেন। তাঁর কৃপায় তাঁরা তাঁকে ধরতে পেরেছিলেন অবতার বলে। ঠাকুর তাই দেখে বলতেন, এখানে যদি সবটা মন কুড়িয়ে এল, তা' হলে আর বাকী রইলো কি ? অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হয়েছে। ঠাকুরকে দর্শনই ঈশ্বরদর্শন।

পাতঞ্জল-দর্শনে একটা সূত্র আছে, 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা'। হয় অষ্টাঙ্গ যোগ কর, যমনিয়মাদি ; না হয় ঈশ্বরের চিন্তা কর, ধ্যান কর। এই উভয় উপায়েই ঈশ্বরদর্শন হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভগবান কল্পতরু। যে যা চায় তাই পায়। তবে এক বিপদ আছে এতে। বেফাঁস্ চাইলে বাঘে খায়। জানেন তো গল্পটা ? (সহাস্যে) একজন পথিক চলতে চলতে অতিশয় ক্লান্ত। গাছতলায় বসে বসে ভাবছে, যদি বিছানা হতো, শুয়ে পড়তাম। অমনি বিছানা এসে গেল। তখন ভাবছে যদি একটি স্ত্রী এসে পা দাবিয়ে দিত, বেশ হতো। অমনি স্ত্রীলোক হাজির। তারপর খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে উত্তম আহার এসে উপস্থিত। লোকটি কল্পতরুর নিচে বসে বিশ্রাম করছিল কিনা। তাই যা যখন মনে হচ্ছে তাই

তখনই এসে উপস্থিত। সব আরাম মিলে গেছে, বেশ আরাম করছে। হঠাৎ মনে হল, এখন যদি একটা বাঘ এসে যায়? অমনি বাঘ এসে সব খেয়ে ফেললো। তাই বড় বিপদ তাঁর কাছে চাওয়া। তাই ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, ঈশ্বরকে বলতে হয়, যাতে আমার ভাল হয় তাই করা। প্রার্থনা করতে হয়, প্রভো সুমতি দাও।

হরি পর্বত—চিৎপুর রোডে নাখোদা মসজিদের ফটকের পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতেন একজন মুসলমান ফকির। মৌনী। কেহ কিছু দিতো তাই খেতেন। চাইতেন না। আর আহারের চেষ্টাও ছিল না। ইচ্ছা ছিল খাওয়ার। তাই কেউ দিলে খেতেন। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলাম। শেষটায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। বসে পড়েছিলেন। লোক বলতো, এঁর অজগর বৃত্তি।

আর একটি দেখেছি। তিনি মঠের পায়খানার বাইরে থাকতেন একটা গাছের নিচে। ইনি ছিলেন রামায়ত সাধু। বসে বসে 'সীতারাম সীতারাম' করতেন। বাবুরাম মহারাজ খুব ভালবাসতেন। খিদে পেলে খুব উচ্চৈঃস্বরে 'সীতারাম সীতারাম' বলতেন। বাবুরাম মহারাজ তখন বলতেন, ওরে যা, সাধুর খিদে পেয়েছে। খাবার টাবার দিয়ে আয়।

শ্রীম—ঈশ্বরের জন্য কত ব্রত ধারণ করেন সাধুরা। তাঁর উপর ভার দিলে তিনি সব দেখেন। গীতায় তাই স্পষ্ট করে বলেছেন ভগবান, 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং'। অনন্যচিত্ত হয়ে যাঁরা তাঁর চিন্তা করেন তাঁদের দেখবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়ে দেন।

অজগর বৃত্তির প্রধান ভাবটি মনে। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। দিলে খাবে, নইলে শরীর যাবে। উভয়েতেই তাঁর ইচ্ছা। উভয়ই তাঁর কৃপা। দিলে কৃপা, না দিলে কৃপা নয়, তা' নয়। যখন এই জ্ঞান হয়—তিনিই রাখেন তিনিই মারেন, উভয়ই তাঁর কৃপা—তখন আসে ঐ ভাব, অজগর বৃত্তি। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, এই দুই-ই তাঁর কৃপা।

হরি পর্বত—আর একটি সাধুর সঙ্গলাভ হয়েছিল লিলুয়ায়। আমার বয়স তখন আঠার উনিশ। একদিন আমি আর হরমোহন

(মিত্র) গঙ্গা পার হয়ে সালখায় যাই। সেখান থেকে দু'টি বন্ধুর সঙ্গে যাই হরিদাস সাধুর কুটীরে। সাধুটি হরমোহনের পরিচিত। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। উনি অতি যত্ন করে পায়েস রেঁধে আমাদের খাওয়ালেন। আর বেল দিলেন খেতে। আমরা সকলে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে ফেললুম দেখে সাধুর বড় আনন্দ। আকাশে চাঁদ খুব কিরণজাল বিস্তার করেছে দেখে সাধু বললেন, একটা গল্প শুন।

"এক গভীর বন দিয়ে কয়েকজন বন্ধু যাচ্ছে। রাত্রিকাল। পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এমন সময় এক জলাশয়ের তীরে এসে তারা উপস্থিত হল। জলেতে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, জ্বল জ্বল করছে। তা' দেখে তারা এতো আনন্দিত হলো যে চাঁদ দেখতে ভুলে গেল। প্রতিবিম্বে মন মগ্ন। তখন উপর থেকে হঠাৎ একটা কাক 'কা' করে উঠলো। সেই শব্দ অনুসরণ করে কাককে দেখলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র আকাশে বিরাজমান দেখতে পেল। তখন আর প্রতিবিম্বে মন নাই। মুগ্ধ হয়ে পূর্ণচন্দ্র দেখছে। কাকটি তখন অদৃশ্য।"

শ্রীম—আহা, ও-টি গুরু। গুরু ইষ্টে মিশে যান। প্রতিবিম্বে আনন্দ মানে, জীবাত্মার আনন্দ সংসারে। জীবাত্মা পরমাত্মার দিকে যেই মোড় ফিরিয়ে দেয় তখন অন্য সব ভুলে যায়। সব পরমাত্মা হয়ে যায়। এক হয়ে যায়। যোগীদের হয় এ অবস্থা। সত্যিকার চাঁদ হলো পরমাত্মা। কে যায় তখন দেখতে প্রতিবিম্ব চাঁদ ?

৩

শ্রীম—হরিবাবু, তোমরা (বেলুড়) মঠে যাও না ?

হরি—আজ্ঞে কাল যাব ভাবছি। হয়ে ওঠে কই ? গেলেই সকলে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বলতে পারি না সংবাদ। তাই আজ এসেছি সংবাদ নিতে।

শ্রীম—বেশ বেশ, যাবে। আমাদের কাছে গল্প করবে ফিরে এসে। কতদিনে যাওয়া হয় ?

হরি পর্বত—দুই এক মাসে যাওয়া হয় একবার।

শ্রীম—যা হোক, ধাত ঠিক রেখেছ।

হরি পর্বত—সুধীর মহারাজরা সেদিন আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর বলেছিলেন—

শ্রীম—কি বলেছিলেন বল দেখি।

হরি পর্বত—বলেছিলেন, সুধীর মহারাজরা তখনও সাধু হন নাই। আপনার কাছে আসতেন। আপনি একদিন ওঁদের বলেছিলেন, সংসারী ভক্ত, যেমন পাকা দেশী আম। কিন্তু ঠাকুরের সন্ন্যাসী অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যেমন কাঁচা বোম্বাই আম, লেংড়া আম।

শ্রীম—হুঁ!

হরি পর্বত—তখন নাকি আপনি খুব সন্ন্যাসের কথা বলতেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখনও কি সেই মত আছে?

শ্রীম (খানিক নীরবে, পরে স্মরণ করিয়া)—তুমি বলতে পার নাই। ঠাকুরের দেহ গেলে তাঁর কথা গৃহী ভক্তরাই তখন বেশী বলতেন। ওঁরা তাই তাঁদের কাছে যেতেন। এই দেখে আমরা বলেছিলাম, এই যে সব গৃহী ভক্তদের দেখছ এরা সব পাকা আম। দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু দিশি আম। কিন্তু ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের যদিও কাঁচা দেখছো, খেতে টক, কিন্তু এঁরা বোম্বাই আম, লেংড়া আম। এঁদের যখন full development (পূর্ণ বিকাশ) হবে তখন দেখবে world of difference (আকাশ পাতাল তফাৎ) দিশি আমেতে আর বোম্বাই লেংড়া আমেতে।

সন্ন্যাসীদের অবসর কত! গৃহীদের অবসর কোথায়? যদিও বা অবসর মিললো, তা' কাটিয়ে দেবে amateur concert partyতে (সখের বাদ্যদলে)। (ভক্তদের প্রতি) আপনারা জানেন না, amateur concert party (সখের বাদ্যদল)?

একদিন অবসরের দিন কনসার্ট করলো। অন্য ছ'দিন আপিস টাপিস করলো। তেমনি গৃহীদের ধর্ম! Within bracket (অবসর সময়ের ধর্ম) গোছের।

আপিসে যাচ্ছে চোগা চাপগান লাগিয়ে। আর অবসর সময়ে

একটু ধর্ম হচ্ছে। এতে কি হয়? তাই ঠাকুর বলেছিলেন বিবেকানন্দকে, গৃহীদের অবসর কোথায়? গৃহীরা part-time men (অবসরধর্মী) আর সাধুরা whole-time men (চব্বিশ ঘণ্টার ধর্মী)।

শ্রীম একটু নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—এই দেহ থাকবে না। তবে এই নিয়ে কেন এতো মাতামাতি? অত ফড়র ফড়র কেন? অত ঝাড়া কেন? অতো লেকচার কেন (হাস্য)? (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করিয়া) চুপ করে থাক না—shut up। (হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে)—গৃহীদের মাঝে মাঝে মৌনব্রত নেওয়া উচিত। তা-ও পারছে না। হরিবাবু, তুমি কাশীতে দেখেছিলে একটি সাধু মৌনব্রত অবলম্বন করে ছিলেন। তিনি এখানে এসেছিলেন কয়দিন হলো। বেশ ভাবটি, হাস্যমুখ।

হরি—মোক্ষানন্দজী আর খগেন মহারাজ (শান্তানন্দজী)।

শ্রীম—হে হে। তিনি বেশ একটা কথা বললেন। এঁর এই অবস্থা দেখে মা-ই তাঁকে আসন করে দিতেন গঙ্গাজল ছিটিয়ে। বলতেন, ন্যাও বাবা, এখন জপ ধ্যান কর বসে। আর বলেছিলেন, এদিকে ওদিকে যখন মন যাবে মেয়েমানুষ দেখে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। আমার কথা মনে হলে আর তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না।

আহা, কি কথাই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন মা! এমন মা চলে গেলে আর ঘরে থাকতে পারলেন না। বাপ আগেই চলে গিছলেন। আহা, কি মহামন্ত্র!

আহা, কত মহৎ লোক দেখা যাচ্ছে এখন অবতার আসায়। মরুভূমির ভিতর oasis (মরূদ্যান) আছে। তা'তে আছে, জল ছায়া বৃক্ষলতা ফলমূল। এ সব দেখলে মনে হয় এ সব ভোগ করারও লোক আছে। তেমনি অবতার এসেছেন দেখলেও মনে হয় তাঁর ঐশ্বর্য—জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি, মহাভাব—এ সব ভোগ করবার লোকও আছে। সেই সব লোক এসেছে, আসছে ও আসবে।

অবতার এলে তখন whole atmosphere is surcharged with spirituality—সমস্ত বাতাবরণ তখন আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হয়। বড় সুবিধা তখন। ড্যাঙ্গায়ও তখন একবাঁশ জল। কত মহৎ লোক দেখা যাচ্ছে এখন।

ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও ছোট অমূল্যের প্রবেশ।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—কি সে-টি, গীতার সেই শ্লোকটি,—কেউ কেউ তাঁকে ডাকে।

ডাক্তার—মনুষ্যানাম্ সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাম কশ্চিৎ বেত্তি তত্ত্বতঃ সিদ্ধয়ে॥

এরও অধিকারী আছে। সন্ন্যাসীরা এর উত্তম অধিকারী। (একজন ভক্তের প্রতি) কথাটা হচ্ছে অনধিকার চর্চা। অর্জুনকে তাই ধমক দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, ওটা (সন্ন্যাস) ধাতে সইবে না দাদা। তিনি সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন, মোহ ও ভয়ে। তাই কৃষ্ণ তাঁকে নানারকম করে বলে বলে যুদ্ধে লাগালেন।

প্রথম বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম—ন্যায় যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। তারপর বললেন, তোমার দুর্নাম করবে লোক। বলবে, অর্জুন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের ভয়ে পালিয়েছে। তৃতীয় বার বললেন, দুর্নাম আর মৃত্যু, সমান। বললেন, ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী হলে রাজ্য ভোগ করবে। আর মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হবে।

যখন কোনও কথায় মন উঠছে না অর্জুনের, তখন দিলেন ধমক। বললেন, যদি আমার কথা না শোন তা'হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে—'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'

প্রথম সন্ন্যাসের কথা বলেছিলেন। দেখলেন তা'তে রুচি নাই। তখন বললেন, কর্মযোগের কথা। শেষে ধমক। এমনতর কাণ্ড!

মুখে বললেই হলো, করবো না? প্রকৃতিতে যা আছে তা' করতেই হবে। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ

১ ৬ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। সোমবার, শুক্লা দ্বিতীয়া ১৮ দণ্ড। ৩৯ পল।

দশম অধ্যায়

বাইরে পূজারী ভিতরে ঈশ্বর

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। পাশে বেঞ্চেতে বসা জগবন্ধু, ছোট নলিনী, গদাধর, লক্ষ্মণ, প্রভৃতি। কথামৃত বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—কর্তাগিরিটা কোথায় ? এই দেখ না, এতক্ষণ ঘরে যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ছাদে আসতেই অন্য রকম হল। সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব ফিরে এসেছে। কোথায় থাকে তোমার কর্তাগিরি যদি এক ঘণ্টা হাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ? All will be dead. সব মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবে। তা' হলে এত কেন, 'আমি আমি' ?

দেখ না food (খাদ্য) সময়মত পেটে না পড়লে মন বুদ্ধি কাজ করে না। এমনি helpless state (অসহায় অবস্থা) মানুষের ! এ আবার বলে 'আমি কর্তা' ! জল হাওয়া খাদ্য দিয়ে যে অত conditioned (নিবদ্ধ), তার কেন অত অহংকার বলতে পার ? নইলে যে সৃষ্টি থাকে না ! তাই মহামায়ার এই ব্যবস্থা।

সত্যের ঠিক উলটো দিকে মনকে চালিয়ে দিচ্ছেন। সত্য—তিনিই সব ; অসত্য—আমি সব। এ দুটোর ঝগড়াই জগৎ। এ-টি করছেন তিনি। মাঝে মাঝে এক একজনকে 'তিনিই সব', এটা বুঝিয়ে দেন। তখন তাঁকে দিয়ে আর এ অসত্যের সংসারের কাজ চলবে না।

কেন এই ব্যবস্থা ? দিন রাত সংসারের পেষণে পিষ্ট হয় যখন মানুষ জন্ম জন্ম, তখন চায় শান্তি সুখ। এই শান্তিসুখের সন্ধান এঁরা বলে দেন যাঁদের ঈশ্বর সত্যের মুখ দর্শন করান। কখনও তিনি নিজেই মানুষ হয়ে এসে কতকগুলি লোককে দেখিয়ে দেন ঐ অভয় প্রশান্ত আনন্দময় মুখ। তাই দেখে ভক্তরা উল্লাসে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন অহর্নিশ অতন্দ্রিত হয়ে। 'হেরিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।

কি ভয় সংসার দুখ কঠোর তব শাসনে ॥' এই সেদিন ঈশ্বর এসেছিলেন মানুষ হয়ে দক্ষিণেশ্বর। তিনি কৃপা করে আমাদের তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে গেলেন। ভক্তরা ধাঁধায় পড়েছিলেন, একদিকে পূজারী বামুন আর একদিকে প্রেমময় পরম পিতা পরমেশ্বর।

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ হইয়া রহিলেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—এই যে মনটা আমাদের, এটা conditioned and controlled externally by all these objects—water, air, food etc. and internally by past habits—সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত—জল বায়ু খাদ্যাদি দ্বারা বাহ্য জগতে। আর মনে বদ্ধ অতীত সংস্কারে। এই precarious state (সঙ্কটাপন্ন অবস্থা) থেকে রক্ষা করতে পারেন কেবল গুরু। 'গুরু' মানে ঈশ্বর, যিনি অবতার হয়ে এসেছেন, যাঁর control-এ (অধীনে) external and internal conditions (বাইরের ও ভিতরের পরিবেশ) সব। আর কারো সাধ্য নাই। তাই consistent proposition (ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত) হচ্ছে, to take shelter at His Feet—তাঁর শ্রীচরণে শরণ নেওয়া। এই হয়ে গেলেই শান্তি। তখনই জীবনমরণকে গায়ের জামা বদলানোর মত মনে হয়। তখনই হয় বিগত ভীঃ। 'অভয়ং বৈ প্রাপ্তোঽসি জনক', এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এই কথা বলেছিলেন।

এই body-টাকে (শরীরটাকে) 'আমি' বলেই যত দুঃখ, যত ভয়। আর ঈশ্বরকে, আত্মাকে 'আমি আমার' বললে হয় অভয় প্রশান্ত আনন্দময়।

শ্রীম পুনরায় নীরব। অবার কথোপকথন।

লক্ষ্মণ—আমাকে একজনের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেছে, খাব কি?

শ্রীম—ঠাকুর এটা বড়ই মানা করতেন। বলতেন, শ্রাদ্ধের অন্ন কিছুতেই খাওয়া উচিত নয়—বিশেষতঃ আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন। খেলে মৃতব্যক্তির পাপের ভাগ নিতে হয়। ঐ অন্ন প্রেতকে দেয় কিনা, তাই অশুদ্ধ। যদি ভগবানের নামে নিবেদন করা হয়, তা' হলে খাওয়া

যায়। এই ব্যবস্থা হলো অলৌকিক দৃষ্টিতে। আর লৌকিক দৃষ্টিতেও দেখ, কি নিষ্ঠুর কাজ এটা। লোকটা মরে গেছে। কোথায় শোক করবে। তা' না করে অতগুলি পেটে দেওয়া।

একজন ভক্ত—যদি কেহ এই শ্রাদ্ধ না করে, তার alternative (অন্য ব্যবস্থা) আছে কি ?

শ্রীম—শাস্ত্রের বিধি, তাই করতে হয়। যদি কেহ জ্ঞানী হয়, তার না করলেও দোষ নাই। তিনি ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেই মৃতব্যক্তির কল্যাণ হবে। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং'। ভগবানকে সন্তুষ্ট করলেই সকলে সন্তুষ্ট হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পিতামাতার সেবা করতে হয়। তাঁদের সেবা না করলে অনন্তকাল নরকে থাকতে হয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তা'তে তপ্ত কড়াইয়ে গলিত লৌহ। তার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, এসব শাস্ত্রে আছে। এমনতর কাণ্ড!

তবে যদি সাধু হওয়া যায় সব ছেড়েছুড়ে, তা' হলে আর কোন দোষ থাকে না। তখন ঈশ্বর সব দোষ নিজে নিয়ে যান। তা' যদি না করে, তবে পিতামাতার সেবা করতে হয়। সেবা না করলে নরকে যেতে হয়।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ।' সকল 'ধর্মান্', মানে সকল কর্তব্য ছেড়ে আমার শরণ নাও, এই কথা ভগবান বললেন। এর পরই বলছেন, 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি'—আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, এই প্রতিজ্ঞা। এর পরও আছে। (একজন ভক্তের প্রতি) কি ?

ভক্ত—'মা শুচ'—শোক করো না।

শ্রীম—'অহম্ ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি'—মানে ঈশ্বর তাঁর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সমস্ত ভার নিলেন। শরীর মন আত্মা, এই তিনেরই ভার। আবার পূর্ব জন্মের ও এই বর্তমান জন্মের কর্মের সমস্ত বোঝাটি তিনি নিয়ে নেন। একে বলে শরণাগতি। তাঁর দাস হয়ে থাকা সংসারে।

বাড়ীতে বাপ মা ছেলের ভার যদি নিতে পারে, তা' হলে ঈশ্বর ভক্তের ভার নিতে পারেন না? এতে কি সংশয়? বাপ মা যে সন্তানের জন্য ব্যাকুল এ-টা কে দিয়েছে? ঈশ্বর দিয়েছেন। সারা বিশ্বের ভার তিনি নেন। কিন্তু ভক্তের ভার তিনি নিজের হাতে নেন। আর বিশ্ব চলছে তাঁর তৈরী নিয়মে। ভক্ত চলে তাঁর সাক্ষাৎ নির্দেশে।

'মা শুচ' বললেন কেন? মনটা calculating (হিসেবী) কিনা। অহংকারের সঙ্গে এক হয়ে আছে পাপপুণ্য। আমি পাপ করেছি, আমি পুণ্য করবো—এই ভাবটি। তাই পাপের চিন্তায় শোক হয়, ভয় হয়। তাই অর্জুনকে বললেন, শোক করো না। আমার উপর ছেড়ে দাও সব, আর আনন্দ কর, নিশ্চিন্ত হও—যেমন বাপ-মা-ওয়ালা ছেলের মত।

(লক্ষ্মণের প্রতি) এই যে তুমি সাধুসেবা করছো এতেও কাজ হয়ে যাবে। ভগবান তুষ্ট হলেই লোক সাধুসেবা করতে পারে। আর সাধুসেবায় মন গেলে বুঝতে হয় ভগবান তুষ্ট। সাধু ভগবানের রূপ—'জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্।' জ্ঞানী আমারই রূপ। 'জ্ঞানী' মানে, যে বুঝেছে ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা। এই সাধুরা কত কৃতবিদ্য। কিন্তু ঠাকুরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তুমি যদি একাগ্র মনে এঁদের সেবা কর, তা' হলে তোমার সব ভার তিনি নিয়ে নেবেন।

২

সন্ধ্যা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে। শ্রীম সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। যে সকল ভক্ত পরে আসিলেন তাঁহারাও নীরবে ধ্যানে যোগদান করিতেছেন। এখন বসিয়া আছেন বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, বড় অমূল্য ও ছোট অমূল্য বিনয় ও ছোট নলিনী, শান্তি মনোরঞ্জন আর মোটা সুধীর, বলাই ও উপাধ্যায়, জগবন্ধু ও গদাধর প্রভৃতি। ডাক্তার বক্সী একটু পর আসিলেন। একটু পর শ্রীম তিন তলায় নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আপনারা বসে ধ্যান করতে থাকুন।

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম তিনতলা হইতে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়াছেন। আসন গ্রহণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় অমূল্যবাবু এসেছেন? ভক্তরা উত্তর দিলেন, আজ্ঞে এসেছেন। বড় অমূল্যর একটি শিশু কন্যা মারা গেছে। বয়স দুই বৎসর।

শ্রীম (শোকাভিভূত হইয়া সস্নেহে অমূল্যর প্রতি)—আহা, ভোলা কি যায়? বললেই হলো, এসব কিছু নয়? আমাদের তা' হবার যো নাই। আমরা সব স্নেহ মমতা নিয়ে রয়েছি। পেট থেকে যখন পড়লো তারপরই দিনে দিনে মানুষ করা হয়েছে। খাওয়ান নাওয়ান কত হাসি কত আনন্দ কত চুম্বন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শিশুটি হাসছে। বাপ মা সে-টি দেখছে। আর স্নেহানন্দে জগৎ ভুল হয়ে যাচ্ছে। অত সব করে মানুষ করা হয়েছে। হঠাৎ তাকে ভোলা যায় কি? এই সব স্নেহস্মৃতি মজ্জাগত হয়ে গেছে। সর্বদা এ সব থেকে আনন্দ লাভ করেছে। এখন হঠাৎ এই আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেছে। কি করে সেই স্মৃতি ভোলা যায়?

তাই তো ঠাকুর অত কাতর হতেন, ভক্তদের এইসব কষ্ট হবে জেনে। তার জন্যই বলতেন সংসার জ্বলন্ত অনল। কেঁদে কেঁদে তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন। বলতেন, মা কি করে থাকবে এরা এই জ্বলন্ত অনলে? তাই মাঝে মাঝে এদের দেখা দিস্ মা।

গানে আছে, জীবের দুঃখে কাতর হয়ে 'এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে।' চৈতন্যদেবের গান এই সব। চৈতন্যদেব বললেন, নিতাই এখানে (নবদ্বীপে) বেশ হচ্ছে হরিনাম মহোৎসব এবং আরও কত আনন্দোৎব। কিন্তু আমি যদি ঘরে থাকি তা' হলে লোকে মনে করবে ভোগ করছি। তা' হলে তারা আমার কথা নেবে না। তাই আমাকে সব ছেড়ে যেতে হবে।

আহা, জীবের দুঃখ মোচনের জন্য সব ছেড়ে চললেন। এত দিনে বুঝতে পারছি কত কৃপা কত করুণা অবতারের, ভক্তদের জন্য। সব দুঃখ বরণ করলেন তাদের কল্যাণের জন্য।

গিরিশবাবু একটি নাটক লিখেছিলেন নাম, জনা। তা'তে আছে

পুত্রশোকে মা পাগল হয়ে গেছে। ভাইরা প্রবোধ দিচ্ছে। মা প্রবোধ মানছে না। মা বলছে, দেখ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বোঝাতে পারেন নাই অভিমন্যুর শোকে।

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, এখানে অন্য কেউ নাই। সব আপনা আপনি। বড় গুহ্য কথা। কারোও শোক ভুলতে হলে তার দোষ সর্বদা মনে করবে। দোষ মনে করলে শোক কমে যাবে।

একজনের (শ্রীমর পত্নীর) পুত্রশোক হয়েছে। শুনেছিলাম ঠাকুর তাকে বোঝাচ্ছেন ওগো, ও যে তোমার পুত্র হয়ে এসেছিল সে পূর্বজন্মে ছিল তোমার শত্রু। তাই তোমাকে জব্দ করতে এবার তোমার পেটে জন্ম নিয়েছে। ও তোমার মহাশত্রু।

সংসার জ্বলন্ত অনল। কি করে ভক্তরা এর মধ্যে থাকবে তা' ভেবে ভেবে ঠাকুর কাতর হতেন। তাই কখনও বলতেন, বরং চৌদ্দ সের বীর্য বের হয়ে যাক্ তবুও যেন একটা পুত্র না হয়।

মহামায়ার এমনি খেলা। এই যে অত শোক, তা-ও কিছু দিন পর চলে যায়। আবার পূর্ব সংস্কার জাগ্রত হয়। এই নিদারুণ শোকও ভুলে যায় লোক। আবার ভোগ করে।

তাই তিনি ভক্তদের বলতেন, এক বিছানায় শোবে না। ছেলেপুলে আর বৃদ্ধি করো না, এ কথা বলবার যো নাই। তাই এ কথা suggest (উল্লেখ) করতেন—এক বিছানায় শুয়ো না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বললেই হল, ও সব কিছু নয় ? অতদিন যাকে খাইয়েছি, পরিয়েছি, মানুষ করেছি তার শোক কিছু নয় ? তা' হয় না। এ কিছু নয়, আর আপিস রান্নাবান্না, এগুলি বুঝি কিছু ? কিছু নয় যদি বল তা' হলে এ-গুলিও কিছু নয়, ও-গুলিও কিছু নয়। এর বেলা কিছু নয়, তা' বললে চলবে কেন ? সবই তো কিছু না— মিথ্যা। এ-টি বোধ করার জন্যই তো তপস্যা করা—সাধুসঙ্গ নির্জনবাস এই সব করা। এ সব কিছু না বললে কেমন করে চলবে ?

যতদিন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, পাণ্ডবরা এ সব কিছু নয়, তা' বুঝতে পারেন নাই। তাই যজ্ঞটজ্ঞ কত কিছু করা হলো। শ্রীকৃষ্ণ যেই চলে

গেলেন, অমনি ওঁরা বুঝতে পারলেন, এ সব কিছু না। তারপর মহাপ্রস্থান—পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—এতো যে (বড় অমূল্যর) শোক তা' আবার ভুল হয়ে যাবে। মহামায়ার এমনি কাণ্ড। প্রথমে ভুলবে, একটু জল পেটে পড়লে। তাই পানা খাওয়ায় অনেকে। বায়ুর কাণ্ড কিনা এ সব। শোকটোক সব বায়ুর কাণ্ড। বায়ু জমে এ সব হয়। পানাতে খুব কাজ হয় শুনেছি। তারপর অন্ন। অন্ন পেটে গিয়ে শোক কমায়। তারপর নিদ্রা। এতেও বায়ু দমন হয়। তারপরও আবার আছে। ক্রমে সব ভুলে গিয়ে পুনরায় পূর্বসংস্কার ভোগ করতে আরম্ভ করে। সেই হাসি সেই আমোদ আহ্লাদ! আবার সন্তানের জন্ম। এমনি খেলা মহামায়ার।

শোকে অনেকে পাগল হয়ে যায়—পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাই ভগিনীর শোকে। আর-একটিতেও শোক হয়। সেটি টাকাপয়সার অভাব। বিলেতে শুনেছি, ব্যাঙ্ক ফেইল পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে পাগল হলো। আগে যে অনেক বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেছে—লর্ড ফ্যামিলির সঙ্গে। এখন কি করে তাদের কাছে মাথা নিচু করবে, এই ভেবে পাগল। আবার অনেক সময় নিজেকে নিজে shoot (গুলি) করে। অথবা অন্য উপায়ে suicide (আত্মহত্যা) করে মরে যায়।

তাই আগে থেকেই বিচার করতে হয়। রোজ জপধ্যান করার পূর্বে চিন্তা করতে হয়। ভাবতে হয়, এ-টি যদি চলে যায় তবে কি হবে? উ-টি যদি চলে যায় তা' হলেই বা কি হবে! এরূপ করলে শোক অত লাগে না। বজ্রাঘাতের মত মনে হবে না আগে থেকে ready (প্রস্তুত) হয়ে থাকলে। দেখ না, অর্জুন পাগল হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও বোঝাতে পারলেন না।

শ্রীম জনা থেকে একটি চিত্র কল্পনায় অঙ্কিত করিতেছেন। জনা শোকে মুহ্যমানা। বাহ্য চেতনা বিলুপ্ত, চক্ষু পলকহীন, রক্তবর্ণ। ভাইরা প্রবোধ দিতেছেন।

প্রথম ভাই (শোকার্ত স্বরে)— বোন, প্রবোধ মান। জীব কর্মফলে বদ্ধ। কেহ এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। যতদিন তোমার ছেলের আয়ু ছিল, সে বেঁচে ছিল। আয়ু ফুরিয়ে গেছে সে, চলে গেছে। সকল জীবই আপন আপন পথে চলে। যাবৎ না জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তাবৎ এই জন্মমরণ বরণ করে। অবশেষে মুক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থান করে। শ্রীরামচন্দ্রও কর্মফলে বনবাস যন্ত্রণা ভোগ করলেন। পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসের দুঃখ বরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর সম্মুখে সমগ্র পরিবার ধ্বংস হলো। এঁদের কথা স্মরণ করে শোক সম্বরণ কর।

আর এক ভাই—দেখ না, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, মানুষ সকলেই জন্ম নেয় আবার মরে। এটাই প্রকৃতির বিধান। তুমি আমি, সকলে এই বিধানের অধীন। অতএব তুমিও এই বিধান স্বীকার কর। ধৈর্য ধারণ কর। পানাহার গ্রহণ কর। বৃথা কেন নিজ জীবন বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ ? শান্ত হও বোন, শান্ত হও।

তৃতীয় ভাই—ভগবানই জীবজগৎ হয়ে জগৎলীলা করছেন। তুমিও তিনি, তোমার পুত্রও তিনি, আমরা সকলেই তিনি। তাঁর মায়াতে বলি আমি, আমার। এটা অজ্ঞান। জ্ঞানীগণ সর্ববস্তুতে সর্বজীবে আত্মবুদ্ধি করেন। আত্মার বিনাশ নাই। শরীরের বিনাশ হয়। এ যেন পুরানো বস্ত্র ছেড়ে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করা—এই মৃত্যু। তোমার পুত্রের স্বরূপ আত্মা। তাঁর বিনাশ নাই। জ্ঞানীগণ বৃথা শোক পরিহার করে জীবের আত্মস্বরূপ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন। অতএব আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে শোক ত্যাগ কর। প্রকৃতিস্থ হও। মনকে দেহ থেকে উঠিয়ে আত্মায় স্থাপন কর।

আর এক ভাই—আমরা সকলেই শ্রীভগবানের দান। তিনি কৃপা করে আমাদিগকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন। আবার কৃপা করে উহা প্রতিগ্রহণ করেন। তিনি সর্বমঙ্গলময়। আমরা অজ্ঞানতার জন্য বলি, এটা আমার, ওটা তোমার। বস্তুতঃ সবই ভগবানের। তোমার ছেলেকে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। সময় বুঝে তাকে

নিয়ে গিয়েছেন। তোমারও আপনার জন ঈশ্বর। তোমার ছেলেরও আপন জন ঈশ্বর। ভগবানের দ্রব্য ভগবান নিয়ে গিয়েছেন এতে শোক করা অনুচিত। দেখ বোন, আমাদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সকলেই চলে গেছেন। সকলকেই যেতে হবে, আগে আর পরে। তোমার পুত্র দু'দিন আগে গেছে এইমাত্র প্রভেদ। তুমি যদি যথার্থই তোমার পুত্রকে ভালবাস তা' হলে তোমার উচিত যাতে তোমার পুত্রের কল্যাণ হবে তাই করা। তোমার পুত্র যদি এই শরীর ছেড়ে উন্নততর শরীর গ্রহণ করে থাকে, তা' হলে তো তোমার সুখী হওয়া উচিত। মহাজনগণ এইরূপ আচরণ করেন। মোহ পরিত্যাগ কর। জ্ঞান দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

ভাইদের প্রবোধ নিষ্ফল। জনা নির্বাক্ স্তব্ধ বসে রইল যেন পাথর। কন্যাশোকগ্রস্ত অমূল্যের কর্ণে কি এই কথামৃত পৌঁছিল ?

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার কার্তিক বক্সী তাঁহার মোটরে অমূল্যকে লইয়া কাশীপুর চলিয়া গেলেন। সঙ্গে গেলেন বিনয় ও ছোট অমূল্য।

সকলে কিছুক্ষণ নীরব। আবার কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—এর একমাত্র remedy (প্রতিকার) হলো সন্ন্যাস। তীব্র বৈরাগ্য ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নেই। এইটি sovereign remedy (সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ)—দূরে চলে যাওয়া। কিছু দিনের জন্য অন্তত দূরে চলে যাওয়া—এই সব sights and scenes (দৃশ্য ও দর্শন) থেকে। নূতন পরিবেশে নূতন ছাপ পড়ে মনে। আর পুরোনো ছাপ চাপা পড়ে যায়। তা' না হলে পূর্ব সংস্কার ক্রমশ ফিরে আসবে। আবার যেই সেই। Feeder (মনের আহার) যে রয়েছে।

ঠাকুর একটা গল্প বলতেন। একটা মাঠে দুটো গর্ত রয়েছে। একটাতে জল থাকে অপরটাতে জল শুকিয়ে যায়। যেটাতে জল শুকিয়ে যায় তার feeder (জলের যোগান) নেই। আর অন্যটাতে feeder (যোগান) আছে।

এ-টি হলো সন্ন্যাসের অবস্থা—feeder (যোগান) নেই।

Feeder (যোগান) থাকলে আবার (মনে) ঐ (বিষয়রস) গড়াবে। কি বলে ? 'যার ভয় কর তুমি সেই দেবী আমি'। আবার কাদামাটি।

ঋষিরা তাই সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থা করেছেন। উঁচু জায়গা। সেখানে শোকতাপ জমতে পারে না।

গৃহস্থ-আশ্রমে স্নেহ মমতা, শোক তাপ এসেই পড়ে। যদি আরামে থাকতে চাও, যদি আনন্দউপভোগ করতে চাও সর্বদা, তা' হলে সন্ন্যাস নাও—তারস্বরে ঘোষণা করছেন ঋষিগণ।

শ্রীম কিছু দীর্ঘ সময় নীরব রহিলেন। নীরবতা ভঙ্গ করিলেন বড় জিতেন।

বড় জিতেন—কবিরাজী মতই (সন্ন্যাস নিয়ে দূরে পলায়ন) ভাল, বিশুদ্ধ মত।

শ্রীম—খালি মুখে বললে তো হবে না। কবিরাজ যা বলে তা' কর। দূরে নির্জনে গোপনে চলে যাও। তা' না হলে ঐ শোকটোক সব ফিরে আসবে।

যে ঘরে (মৃত ব্যক্তি) থাকতো সেই ঘর দেখে শোক আবার জাগ্রত হবে। মনে হবে, আহা, এখানে খেল্‌তো! আবার মৃতের বালিশ বিছানা প্রভৃতি নানা দ্রব্য দেখেও শোকের উদ্দীপন হয়। কিন্তু new sights and scenes (নূতন দৃশ্য ও দর্শনাদিতে) মনের পরিবর্তন হয়।

দেখ না কি environment (পরিবেশ)! শোকে মা কাতর। মেয়েরা এসে বলছে, ওরে চুল বাঁধ্‌। এমনি করিস্‌ না, তা' হলে স্বামীর অকল্যাণ হবে।

দেখ, এমন কেউ নাই, যে বলে, ও তোর শত্রু ছিল, বেশ হয়েছে। কেন আর এ সংসার! এই সুবর্ণ সুযোগ। আপন পথ দেখ। এই চৈতন্যের কথা বলবে না কেউ।

শ্রীম (একজনের প্রতি)—পশুদের বুঝি শীঘ্রই শোক কমে। তাদের নিজে চেষ্টা করে পেটে দিতে হয়। কে দিবে মিছরী পানা তাদের মুখে!

শ্রীম নীরবে কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারী থেকে হোমিওপ্যাথিক safer (অধিক নিরাপদ); কম responsibility (দায়িত্ব) নিতে হয়। ওদের (চিকিৎসা) বড় drastic (হঠকারী)। একটু কিছু হলো অমনি কাট। (সহাস্যে) হাতে যন্ত্র থাকলে ইচ্ছা হয় একটু কেটে দি। বাড়ীর কর্তার খুব strong common sense (বলিষ্ঠ কাণ্ডজ্ঞান) থাকলে ডাক্তারকে guide (চালিত) করা যায়।

এই যে মেয়েটি গেল—কি দুর্দশা! একে তো পা ধেবড়ে গেছে। তার উপর আবার অপারেশন! দুটো আঘাত। এতেই হার্ট weak (দুর্বল) করে ফেলেছে।

তাই ঠাকুর ডাক্তারদের কিছু খেতে পারতেন না।

আমরা শুনতুম, প্রলেপ-টলেপ দিলে সেরে যায়। তা'তে আবার কাটা।

কত ভাবে ঈশ্বর নিচ্ছেন—ফ্লাডে (বন্যায়), ভূমিকম্পে, রোগে, আবার ডাক্তারের হাতে। এই যে এই মেয়েটি গেল, আমরা কি বলবো? না, তিনি ডাক্তারের হাতে নিয়ে নিলেন।

কাঁচা দাঁত তুলতে ওরা খুব মজবুত। দুই দিন wait (অপেক্ষা) করলে বেদনা যায়। তা' না করে বলে, তুলে ফেল। সেও আবার wrongটা (অর্থাৎ ভালটা) (হাস্য)। ভাববার সময় পায় না ওরা।

আমাদের জানা একজনের, উরুস্তম্ভ হয়েছিল। ডাক্তাররা বললে, অপারেশন করতে হবে, amputate (কেটে ফেলে) করতে হবে। বড় বড় ডাক্তার বলছে এ কথা। তাদের ভিজিটিং ফি বত্রিশ টাকা। তারপর একজন কবিরাজ প্রলেপ দিতে ভাল হয়ে গেল।

কবিরাজী থেকে আবার হোমিওপ্যাথিক ভাল। এ-টি সব চাইতে ভাল।

আমাদের ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথি করে তো বেশ হয়। ওতে কত responsibility (দায়িত্ব) কমে যায়!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ
১৮ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, শুক্লা তৃতীয়া।

একাদশ অধ্যায়

মনে অযুত হস্তীর বল থাকে তো সংসার কর

১

অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম মর্টন স্কুলের ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। তাঁহার সম্মুখে ওপাশে তিন দিকেই বেঞ্চ। তাহাতে বসা ভক্তগণ—জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, গদাধর, ছোট রমেশ প্রভৃতি। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—একবার চেয়ে দেখ না, উপরে কি কাণ্ডটা হচ্ছে। অনন্ত, সব অনন্ত। কুল কিনারা নাই এর। কত লক্ষ লক্ষ বছর চলে যাচ্ছে, কেউ একটা তারারও পাত্তা করতে পারছে না। আজকাল বলছে, এক একটা তারা সূর্য্যের চাইতেও বড়। সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি নক্ষত্র ঘুরছে। তেমনি অনন্ত সূর্য্য। তার চারদিকে অনন্ত নক্ষত্র সব ঘুরছে। অসংখ্য অগণিত সব। আর অসীম অনন্ত এই বিশ্ব।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—বেদে আছে, এ সবই তাঁর মায়াশক্তিতে চলছে। ঋষিরা দেখেছিলেন মায়াকে। 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্'।

ঠাকুরও এই চক্ষে দেখেছিলেন, এই মায়াশক্তি এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করছেন, এই বিশ্ব হয়ে রয়েছেন। অন্তরেও তিনি, বাইরেও তিনি। দেখেছিলেন, এই মায়াই বিশ্বকে সৃষ্টি করছেন। আর একে গ্রাস করছেন। বলেছিলেন, সব তাঁর 'অণ্ডারে'। বলেছিলেন, যতক্ষণ শরীর ততক্ষণ জগৎ, ততক্ষণ তাঁর অধীন, তাঁর এলাকা। কথা কাজ চিন্তা সব মায়া, ঈশ্বরচিন্তা পর্যন্ত মায়া। মায়ার পরে যা তা' মুখে বলা যায় না। সেখানে যেতে পারে কেবল মায়াধীশের সঙ্গে।

মনটি আছে বলে এই জগৎ প্রতিভাত হচ্ছে। মনের নাশে জগৎ নাশ। কিন্তু এ-টি বুঝতে হলে, ঠাকুর বলেছেন, একটি ভাব আশ্রয় করতে হয়—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিংবা সোঽহং।

এ-ও একটা ভাব। তাঁর সঙ্গে এর একটা ভাব দিয়ে পাকা সম্পর্ক পাতাতে হয়। যেটা যার ভাল লাগে, অনুকূল সে ভাবটা বেছে নিতে হয়। সম্পর্ক চাই-ই। কেন এই সম্পর্ক পাতাতে বললেন? তার উত্তর, এই relationshipগুলি (সম্পর্কগুলি) আমাদের মধ্যে রয়েছে কিনা! তাই এই গুলির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া ঈশ্বরের দিকে। মানুষ দেহসম্পর্কিত লোকদের বলে আত্মীয়। 'আত্মীয়' মানে আপনার। কিন্তু সত্যিকার 'আপনা' ঈশ্বর।

যে মাটিতে পতন সেই মাটি ধরেই উত্থান। যে রূপরসাদিতে বন্ধন হয়, সেগুলি ধরেই মুক্ত হয়। মায়ায় বন্ধন, আবার মায়াকে ধরে উত্থান।

ওপারে তো সব 'অবাঙ্মনসগোচরং', সব নিরাকার। সাকার ধরে নিরাকারে যেতে বলেছিলেন গুরু। কারণ, মন সাকার ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। পিতা মাতা সখা, এইসব মধুর সম্পর্ক দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া। এইসব সম্পর্কগুলি মানুষ জানে স্বাভাবিক সম্পর্ক।

তাঁর সাকার রূপ ধরে চিন্তা করতে করতে তাঁর সাকার রূপের দর্শন হয়। ভক্ত যদি চায় তা' হলে ভগবান তাঁর নিরাকার রূপও দেখিয়ে দেন। আবার নিরাকারের উপাসক আছে। এটা কঠিন, বলেছেন গীতায়—'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।'

ঠাকুর বলেছিলেন, যেমন snow (বরফ) পড়ে তূলোর মত ঝুর ঝুর করে, তেমন সব তাঁর রূপ দর্শন হয়।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—মানুষের এইসব দুর্বলতা নিয়েই তাঁর দর্শন হয় তাঁর কৃপায়। কেমন দুর্বল দেখ না। অত তো ফড়্‌র ফড়্‌র করে। কিন্তু যাও না একটু উপরে, দম বন্ধ হয়ে যাবে। উড়ো জাহাজে চড়ে কিছুটা উপরে উঠলে অক্সিজেনের অভাব হয় সেখানে। তখন প্রাণ যায় যায়। এমনতর ব্যাপার।

তাঁর এ সৃষ্টিটি চমৎকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সব অচৈতন্য তাঁর এই খেলার কাছে। 'কোথায়, কোথায় অন্ত'—করে এঁরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু পাত্তা পাচ্ছেন না।

তাই গীতায় ভগবান বলেছেন, আমার এই মায়া 'দৈবী', 'গুণময়ী' ও 'দুরত্যয়া।' কেবল আমাকে ধরলে এ মায়ার হাত থেকে রেহাই। অন্য পথ নাই। ঠাকুর বলতেন, মা বুঝিয়ে না দিলে এ রহস্য বুঝবার শক্তি কারো নাই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম—হাঁ। একজন বলেছিলেন, খেতে খেতে ঠাকুরকে লক্ষ্য করে, আমরা যেন সাগরে মীন। ঠাকুর শুনে বললেন, না, উপমা ঠিক হলো না। বল, সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন। কেমন জান ঐ সচ্চিদানন্দ সাগর? সব জলে জলময়। উর্দ্ধে নিম্নে, ডানে বামে, দশ দিকে সব জলময়। সব সচ্চিদানন্দ! এই অপার অসীম সমুদ্রে জীব মীন হয়ে বেড়াচ্ছে।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)—বুঝতে পারলে কিছু? আর বুঝবার দরকারই বা কি? এই অসীম অনন্তই রূপ ধারণ করে আসেন ভক্তের জন্য। মানুষ হয়ে এসেছেন এই সবে। এখনও তার গরম রয়েছে হাওয়াতে—এত নিকটে। এই সেদিন চলে গেছেন। তাঁকে বুঝতে পারলেই কাজ হয়ে যায়।

তাই ঠাকুর প্রার্থনা করে ভক্তদের শিখাচ্ছেন, মা জানতেও চাই না এসব। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হলেই হল—শুদ্ধা অমলা ভক্তি।

যা-ই অসীম তা-ই ভক্তের জন্য সসীম হয়। যা অনন্ত তাই ভক্তের কাছে হয় সান্ত। যা অতি কঠিন, তাই হয় ভক্তের কাছে অতি সহজ। কি দরকার অত বিচারের? সহজ পথ ধর—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে।' এটা সহজ পথ। ঠাকুরও বলেছেন, 'আমায় ধর।'

একটা পিঁপড়েকে কেউ বুঝতে পারে? কি করে তা'তে প্রাণ এলো? এটা কে করলো? যদি না পার এটা বুঝতে, তবে কেন অত ফড়্‌র ফড়্‌র?

কি করে বোঝে বল? একি দু'য়ে দু'য়ে চার, বলা? Finite things (সসীম জিনিস) নয়। তাই Infiniteকে (অসীমকে)

বুঝতে যেয়ো না সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে। কি করা তবে? না, তাঁর prescription (ব্যবস্থা) নাও। কি সে-টি? মা, জানতেও চাই না এই সব। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও—এই প্রার্থনা কর।

সন্ধ্যা সমাগতা। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন—শান্তি ও মোটা সুধীর, ডাক্তার ও বিনয়, ছোট অমূল্য ও বলাই প্রভৃতি। শ্রীম কথা বন্ধ করিয়াছেন; সকলকে বলিতেছেন, তা' হলে নামাজ পড়া যাক। এই বলিয়া নিজ আসনে বসিয়াই ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পর আসিলেন বড় জিতেন; তারপর একজন পণ্ডিত। তাহার গায়ে নামাবলী চাদর, আর পায়ে খড়ম্—চটর চটর শব্দ করিতেছে। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে আরও কয়েকজন লোক। খড়মের শব্দে ধ্যানে বিঘ্ন হইয়াছে।

ধ্যানান্তে শ্রীম তাহাদের পরিচয় লইতেছেন। নবাগতদের একজনের বাড়ী বাঁকুড়া আর কর্মস্থল আসানসোল। আর একজনের নিবাস বিষ্ণুপুর।

পণ্ডিত চপল। শ্রীমর কথা শোনার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু তিনি মুখ খুলিবার পূর্বেই পণ্ডিত কথা আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁকুড়াবাসীর সঙ্গে সাধ্য-সাধন বিচার চলিতেছে।

পণ্ডিত (বাঁকুড়াবাসীর প্রতি)—সব ছেড়ে অন্তর্মুখ মন না করলে কিছু হবে না। বাইরে মন থাকলে কেমন করে বুঝবে?

বাঁকুড়াবাসী—কেন, পরমহংসদেব তো বলেছেন, বড়লোকের বাড়ীর ঝিয়ের মত সংসারে থাক। সে সংসারের সব কাজ করছে। তার মন পড়ে আছে তার নিজের বাড়ীতে ছেলে মেয়ের উপর, ইত্যাদি।

পণ্ডিত শিষ্টাচারের ধার ধারে না। সে বকর বকর করিতেছে। বাঁকুড়াবাসীর সঙ্কোচ আসিয়াছে। সে আর উত্তর দিতেছে না। কাজে কাজেই তর্কপ্রবাহ হীনবল হইয়াছে। ভক্তগণ উহাদের কথা পছন্দ করিতেছে না। তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা শ্রীমর

কথামৃতের জন্য ব্যাকুল। এইবার শ্রীম ধীরে ধীরে ঠাকুরের কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি)—ঠাকুর কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন, জানতেও চাই না মা, বেদ পুরাণ তন্ত্রে কি আছে। তোমার পাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। বলেছিলেন, কি করে জানবে মা তোমার মানুষ, তুমি তাদের না জানালে ? তোমায় কেউ জানতে পারে না।

মানুষ কেবল নিজের বুদ্ধিতেই যদি ঈশ্বরকে জানতে পারতো, তা' হলে মহাপুরুষগণ কেন বললেন অত সব কথা ? বেদে আছে, 'নৈষা মতিতর্কেনাপনীয়া।' তারপরই আছে, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' 'অবাঙ্মনসগোচরম্।' তাঁকে কি করে জানা যায় ? ঠাকুর বলতেন, এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে এক সেরকে মাপা যায় না। গানে আছে, 'কে তোমাকে জানতে পারে তুমি না জানালে পরে। বেদ বেদান্তে পায় না অন্ত, ঘুরে মরে অন্ধকারে॥' এসব মহাজনদের বাণী। আবার আছে, ন 'প্রবচনেন লভ্যঃ', 'ন বহুনা শ্রুতেন।' এ-ও বেদের কথা।

এ তো আর finite (জাগতিক) বস্তু নয় যে তাকে কিনে আনবে। Infinite (অসীম) যে তিনি! অসীমকে কি করে তুমি জানবে তোমার finite (সীমাবদ্ধ) ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ? এ চেষ্টা কেমন ? না, যেমন পিঁপড়ের চেষ্টা। পিঁপড়ে মনে করেছিল, এবার একদানা চিনি মুখে করে নিয়ে যাচ্ছি। আবার এসে সমগ্র চিনির পাহাড়টা মুখে করে নিয়ে যাব।

তাঁকে জানার একটি মাত্র উপায় আছে। শ্রীকৃষ্ণ সে-টি বলেছিলেন, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে।' কেবল আমাকে ধরলেই আমাকে জানতে পারবে। মায়া উত্তীর্ণ হওয়া মানে ঈশ্বরকে জানা। এই কথাই আবার অন্যভাবে বলেছিলেন—'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।' কেবলমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই তাঁকে জেনে অনন্তকাল স্থায়ী শান্তি ও আশ্রয় লাভ করা সম্ভব। আর পথ নাই।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—পাণ্ডিত্যে তাঁকে লাভ হয় না।

'ন প্রবচনেন লভ্যঃ' 'ন বহুনা শ্রুতেন।' বক্তৃতা দিয়ে বা শুনে তাঁকে লাভ হয় না। না, কেবল মননের দ্বারা তিনি লভ্য—'যন্মনসানমনুতে।' এসব বেদের কথা।

পরমহংসদেবের কাছে বড় বড় পণ্ডিতরা যেতেন কিনা! তাঁরা সব হাত জোড় করে বসে থাকতেন।

এক ঘরভর্তি লোক। ঠাকুর তখন মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন, 'মা পাণ্ডিত্যে কি আছে? পাণ্ডিত্যে তোমায় জানবে, ছি!' (সহাস্যে) এক এক বার হেসে হেসে বলতেন, 'পণ্ডিতগুলো খুব উঁচুতে ওঠে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তাদের ভাগাড়ে'। অর্থাৎ সংসারে, কামিনী কাঞ্চনে।

পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, শশধর তর্কচূড়ামণি, বৈষ্ণবচরণ, এঁরা সব যেতেন ঠাকুরের কাছে। বিদ্যাসাগরকে দেখতে গিছলেন তিনি নিজেই। ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিতও এসেছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল।

শ্রীম (বাঁকুড়াবাসীর প্রতি)—তাঁকে প্রার্থনা করলে তিনি জানিয়ে দেন কি করে তাঁকে লাভ হয়। কিম্বা কারুকে পাঠিয়ে দেন বলে, যাও তাকে বলে এস—এই এই।

একজন ভক্ত খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকছিলেন ঈশ্বরকে। অন্তরে ডাকছেন। সে কথা কেউ জানে না। ঠাকুর আর একটি ভক্তকে দিয়ে বলে পাঠালেন, যাও, তাকে গিয়ে বলে এস, এই এই কর। আর একটি ভক্তের কাছে নিজে গিয়ে হাজির। কেন? না তিনি যে ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলেন, কেঁদেছিলেন। ভক্তটি দেখেই অবাক। বললেন, কোথায় আমি যাব, না, আপনিই এসে উপস্থিত! ঠাকুর হেসে বললেন, হাঁ কখনো ছুঁচও চুম্বককে টানে। তাঁকে বলতে হয় ব্যাকুল হয়ে, তা' হলে তিনি জানিয়ে দেন।

২

ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন, একজন ফকির ছিল। তার কাছে অনেক ভক্ত যায়। তার সাধ হলো ভক্তদের খাওয়াতে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে। সে তখন আকবর শাহের কাছে গেল। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। নামাজান্তে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লা আমায় ধন দাও, দৌলত দাও, রাজ্য দাও। এই কথা শুনে, ফকির চলে যাচ্ছিল। আকবর তা' লক্ষ্য করে হাতে ইসারা করলেন, বসতে। তারপর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন চলে যাচ্ছেন ? ফকির জবাব দিল, আমি সাহায্য চাইতে এসেছিলাম। দেখলাম, আপনিও ভিখারী। তাই স্থির করেছি ভিখারীর কাছে ভিখারী কি চাইব ? তাই চলে যাচ্ছি। স্থির করেছি, চাইতে হয় আল্লার কাছে চাইব।

শ্রীম (বাঁকুড়াবাসীর প্রতি)—এর মানে এই, ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা আন্তরিক হলে তিনি তা' পূর্ণ করেন। হয়তো কাউকে পাঠিয়ে দেন, অথবা মনে চিন্তারূপে এসে বলে দেন।

পণ্ডিতদের তর্কজালে পড়িয়া বিভ্রান্ত না হয় ভক্তরা, তাই কি এই ইঙ্গিত ?

বাঁকুড়াবাসী—আচ্ছা বাবা, কর্মফলে আমরা চলছি, কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলছি ?

শ্রীম—পরমহংসদেব কর্মফলটল মানতেন না। তিনি বলতেন, প্রার্থনা কর। তাঁর ইচ্ছা হলে সব বাধা কেটে যাবে। তিনি গান গেয়ে বলতেন, 'কপালে লিখেছে বিধি তাই যদি হবে। দুর্গা দুর্গা বলে কেন ডাকা তবে ॥'

কর্মফলটলের কথা বৌদ্ধধর্মে খুব আছে। এগুলি philosophical speculations (দার্শনিক বিচার)। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি সব ঠিক করে দেন। আমরা ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনেছি।

বাঁকুড়াবাসী—তাঁকে যে ঠিক ডাকা হচ্ছে তা' কেমন করে বুঝবো ?

শ্রীম—তার জন্যই তো সাধুসঙ্গ করতে ঠাকুর বলছেন। সাধুসঙ্গ করলে বুঝতে পারবেন কতটা নির্ভরতা হয়েছে, অথবা তাঁকে ঠিক ডাকা হচ্ছে কিনা।

আপনি যদি 'ল' (আইন) জানতে চান তবে কোথায় যাবেন ? জজ, উকীল, ব্যারিস্টারদের কাছে যাবেন তো ? তেমনি সাধুরা। ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁরা অধিকারী। তাঁদের কাছে যাওয়া আসা করলে সব বুঝতে পারবেন। তখন অন্য কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। মনেই সংশয় হবে, আবার মনেই তার মীমাংসা হয়ে যাবে।

পণ্ডিত—সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। ছুঁচে মাটি থাকলে চুম্বক টানে না। সাধুসঙ্গে মাটি সাফ হয়। বিবেকচূড়ামণিতে আছে, 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং।'

শ্রীম—পরমহংসদেবকে দেখতুম, সর্বদা প্রার্থনা করছেন, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। বলতেন, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

ইংরেজদের বইয়েতেও (বাইবেলে) আছে। ক্রাইস্ট বলতেন, সর্বদা প্রার্থনা কর, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত প্রার্থনা কর—Pray without ceasing !

পণ্ডিত মাঝে মাঝে শাস্ত্রবুলি আবৃত্তি করিতেছেন। শ্রীমর কর্ণে তাহা পৌঁছিতেছে না।

শ্রীম (বাঁকুড়াবাসীর প্রতি)—একদিন পরমহংসদেবকে একজন বললেন, তা' হলে সকলকে বলে দেওয়া উচিত মূর্তিতে ব্রহ্মের আরোপ করে ব্রহ্মের পূজা করে, কেবল মাটির মূর্তি পূজা নিষ্ফল। অমনি ঠাকুর উত্তর করলেন, এই যা। খালি লেকচার দেয়। ওগো, তোমায় ভাবতে হবে না এ বিষয়। তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন, যার যা দরকার। তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না এ বিষয়ে।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, এই তিন শরীরের আহার তিনি পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। স্থূল-শরীরের আহার, চাল ডাল আটা ইত্যাদি ; সূক্ষ্ম-শরীরের আহার, লৌকিক বিদ্যা আর্ট সায়েন্স ইত্যাদি। আর কারণ-

শরীরের আহার, পূজা পাঠ জপ ধ্যান তীর্থ ইত্যাদি। এইগুলি দিয়ে মহাকারণ অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে যোগ হয়।

এই দেখ না, শস্য উৎপাদনের জন্য তিনি সূর্য চন্দ্র বর্ষাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মানুষের মনে প্রেরণা দিয়ে স্কুল কলেজ বিদ্যালয় করিয়েছেন। আবার মন্দির মঠ আশ্রম সাধু এ সব কারণ-শরীরের আহার দেয়।

সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন। তোমায় এসবের জন্য ভাবতে হবে না। তুমি খালি তাঁকে ডাক, কিসে তাঁর দর্শন হয়। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে বল, ব্যাকুল হয়ে বল, প্রভু দর্শন দাও। সাইনবোর্ড মেরে নয়, কিন্তু এমন ভাবে যেন কেউ জানতে না পায়।

আহা, তাঁর কৃপার অন্ত আছে? সর্বদা কৃপা বর্ষণ হচ্ছে। এই মঠটি (বেলুড়মঠ) হলো কি করে? তিনি কৃপা করে ক'রে দিয়েছেন। তবে তো ভক্তরা গিয়ে সাধুসঙ্গ করবে!

আমরা তো সর্বদা মঠে যেতে পারি না, বুড়ো হয়ে গেছি কিনা। তাই আমাদের ফ্রেণ্ডসরা মঠে যান আর ফিরে এসে সাধুদের সংবাদ আমাদের বলেন। এইসব তাঁর অসীম কৃপা।

একদিন একজন মঠ থেকে ফিরে এসে বললেন, অমুক মহারাজ ভাগবতের দশম স্কন্ধ পড়ছেন মায়ের মন্দিরে বসে। অমুক মহারাজ গঙ্গা থেকে জল তুলছেন বাঁকে করে। অমুক ঠাকুরের পূজার জন্য চন্দন ঘষছেন। অমুক উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছেন। পরমহংসদেবও ঝাড়ু দিতেন। একদিন গিয়ে দেখি, ঠাকুর ঝাড়ু দিচ্ছেন তাঁর ঘরের উত্তর দিকের রাস্তায়। আমায় দেখে বললেন, মা এখানে বেড়ান। তাই রাস্তাটা সাফ করছি। মঠের এই সব সংবাদ পেলে আমাদের বড় উপকার হয়। তুলনা করা যায় ভগবানের জন্য তাঁরা কি করছেন আর আমরা কি করছি। এতে আমাদের চৈতন্য করিয়ে দেয়। সাধুরা ঈশ্বরের জন্য সব কাজ করছেন, সর্বদা করছেন, বাড়ীঘর সব ছেড়ে দিয়ে করছেন।

পণ্ডিত (শ্রীমর প্রতি)—আপনি কোথায় থাকেন, দক্ষিণেশ্বরে কি?

শ্রীম পণ্ডিতের অবান্তর কথার স্রোত বন্ধ করিবার জন্য কোন উত্তর না দিয়া বাঁকুড়াবাসীকে মঠে পাঠাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন।

শ্রীম (বাঁকুড়াবাসীর প্রতি)—তা' হলে আপনি কবে যাচ্ছেন মঠে? ছয় সাত পয়সা খরচা করলেই যাওয়া যায়। আর বেশীক্ষণ নাই বা রইলেন। দু' ঘণ্টা থাকলেই যথেষ্ট। কি দরকার লোকের সঙ্গে আলাপের? যাবেন, প্রথমে গিয়ে ঠাকুরঘরে প্রণাম করবেন। তারপর চরণামৃত নেবেন। এরপর সাধুদের দেখলে প্রণাম করবেন। অমৃত ঘটিতে ঘটিতে খেলেও অমর, আর দুর্বার অগ্রভাগে করে এটুকু খেলেও অমর (হাস্য)! এতো আলাপ পড়াশোনা তো হলো। আর আলাপ নাইবা করলেন কারুর সঙ্গে। সাধুদের দর্শনেই লাভ। দর্শনেই চৈতন্য হয়ে যায়। সাধু কে? না, যে সর্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে।

বাঁকুড়াবাসী (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, চেষ্টা করবো।

শ্রীম—এই যা! পরমহংসদেব একজনকে (পল্টুকে) সাধুসঙ্গ করতে বলায় সে বলেছিল, চেষ্টা করবো। পরমহংসদেব প্রত্যুত্তর করলেন, চেষ্টা করবো কি রে? সে বললে, তা' না হলে যে মিথ্যা কথা বলা হয়।

শ্রীম—ভাল কাজে মিথ্যা কথা বলায়ও দোষ নাই। বলতে হয়, নিশ্চয়ই যাব।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যম্ তক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!' দুর্বলতা ছাড়। ওঠ। একি?

যে উত্তম ভক্ত তার রোখ আছে। করবোই এমন সঙ্কল্প তার। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ তয্যুপপদ্যতে।'

পণ্ডিত—আমার বড় ছেলেটি, বয়স তের বছর, সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছে।

এই কথা শুনিয়া শ্রীম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি এবার প্রসন্ন হইয়া পণ্ডিতের কথার উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম—ও-ও, তাই বলুন। আপনি কত বড় লোক। বলে, সিংহের গর্তে গজমুক্তা পাওয়া যায়। আপনি কত বড় বংশের লোক। সাধু জন্মেছেন বংশে!

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। ডাক্তার বিনয় ছোট অমূল্য গদাধর ও জগবন্ধু শ্রীমর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম পুনরায় ভক্তদিগকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি)—হাঁ, ডাক্তারবাবু, আপনার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করলে কেমন হয়? গরীবের অনেক উপকার হয় তা' হলে। মহেন্দ্র সরকার এ্যালোপ্যাথিতে বেশী অনিষ্ট হয় দেখে বেশী বয়সে হোমিওপ্যাথি শিখেছিলেন।

আর একটা কথা। আপনারা থাকতে বাড়ী থেকে গয়না চুরি হলো, ব্যাগ চুরি হলো। এসব ভাল নয়। এতো আলগা দিয়ে হয় কি করে? রোখ চাই। অযুত হস্তির বল মনে থাকে তো সংসার কর। সংসারে থাকতে হলে সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। দশজনের মত থাকতে হয়। যদি তা' না পার, তবে গাছতলায় যাও। সিধে পথ। সংসারেও থাকব, অথচ আশ্রমধর্ম পালন করবো না, এ কি করে হয়?

একটি ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, বিড়াল আমার পাত থেকে মাছ উঠিয়ে নেয় আমি কিছু বলতে পারি না। ভক্ত মনে করেছিলেন, ঠাকুর বাহবা দিবেন। ওমা, উল্টো! উত্তেজিত হয়ে বললেন, কেন একটা থাবড়া দিলেই বা। ও-তে আর বিড়াল মরে যাবে না।

আলগা হলে সংসার চলে না। লোক ঠকিয়ে নেবে। ভক্তদের পিঠেও দুটো চোখ থাকবে। আর 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' হবে।

সংসারে থাকলে এসব মানতে হয়। ঠাকুর তো সংসার করেন নাই। কিন্তু সংসারের সব কথা তাঁর জানা ছিল। তবেই তো ভক্তদের ঠিক পথে চালাতেন।

মনটি তৈরী করে দিতেন তিনি। এই আলগা অসতর্ক মনকে সর্বদা সজাগ রাখতে হয়। সংসারের এই সামান্য বিষয়ে যে অমনোযোগী, সে কি করে তবে ব্রহ্ম ধ্যান করবে। চেষ্টা করলে এই

দুর্বল মনই বজ্রকঠোর হয়, 'শরবৎ তন্ময়' হয়। তা' দিয়ে অবিদ্যা পক্ষী বিদ্ধ হয়।

এই মন তৈরীর জন্যই যত সাধনভজন। গৃহের কাজেও এই মন তৈরী হতে পারে। তাই তো ঠাকুর বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে।

প্রথমে মন তৈরী করা। তারপর এই মনটি তাঁ'তে লাগিয়ে দেওয়া। তখন নিশ্চিন্তি। তখন তাঁর হয়ে সংসারে থাকা, দাসীবৎ।

অতটা করতে হয় চেষ্টা করে, তবে বাকীটার ভার তিনি নেন। তিনি মানুষকে বুদ্ধি, চেষ্টা দিলেন কেন? এর সদ্ব্যবহার করলে বাকীটার জন্য নিজের ভাবতে হয় না। তিনি দেখেন, তিনি সুবুদ্ধি দিয়ে, শক্তি দিয়ে, করিয়ে নেন। আষ্টেপিষ্টে ধর, তবে ঘোড়ায় চড়।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ
১৮ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, বুধবার, শুক্লা চতুর্থী ১১ দণ্ড। ৩৭ পল।
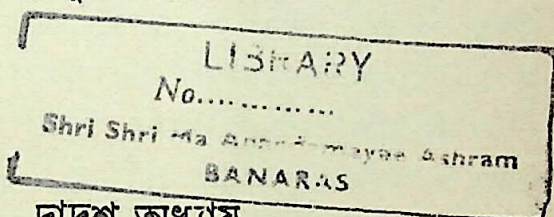
দ্বাদশ অধ্যায়

ভয় পেলে আর হলো না

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। ভক্তগণ শ্রীম-সঙ্গে বসিয়া আছেন। বৃষ্টির জন্য ছাদ ভিজা। বাহিরে বসা সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ভক্তসমাগম হইতেছে। প্রথমে মনোরঞ্জন বিনয় ও বড় জিতেন আসিলেন। বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুইজন বন্ধু। ইহারা সকলেই স্টুডেন্টস্ হোমে থাকিয়া কলেজে পড়ে। তারপর আসিলেন মোটা সুধীর, বলাই

ও শান্তি। তারপর আসিলেন দুর্গাবাবু (হিলিংবাম) ও গদাধর। জগবন্ধু এখানেই থাকেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানের পর আসিলেন ডাক্তার ও ছোট অমূল্য। আজকাল কথামৃত ছাপা হইতেছে। তাই শ্রীম ও জগবন্ধু সর্বদা প্রুফ দেখেন। শ্রীম তাই ক্লান্ত। ধ্যানান্তে তিনি তিনতলায় নামিয়া গেলেন, ভক্তগণকে 'কথামৃত'পাঠশ্রবণে নিযুক্ত করিয়া। মনোরঞ্জন পড়িতেছেন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে আসিয়াছেন। মাস্টার টিফিনের ছুটিতে শ্যামবাজার স্কুল হইতে আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শন করিতে। শ্রীমর নামে কথা রটিয়াছে, ইনি স্কুলের ভাল ছেলেদের লইয়া আসেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করাইতে, ইত্যাদি। আজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ১৯শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। বৃহস্পতিবার, শুক্লা ষষ্ঠী ৫৮।৩৭ পল।

এখন সাড়ে আটটা। শ্রীম নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিয়া উপরে উঠিয়াছেন। আসিয়াই কথা কহিতে লাগিলেন, দাঁড়াইয়া।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই আর কি—আমরা সম্পূর্ণ পরতন্ত্র। কিছুই নিজের ইচ্ছাতে হচ্ছে না। এই দেখ না দেহটা। একটু কল বিগড়ে গেলে আর চলে না। এমন কাণ্ড। তা' হলে কেমন করে বলি, পরতন্ত্র নয়।

তার জন্যই মহামায়ার পূজা। তাঁরই ইচ্ছাতে সব হচ্ছে। তাঁকে তাই তুষ্ট করা, এই আর কি?

ডাক্তারবাবুরা বেশ জানেন, এই শরীরের ভিতর কি সব আছে। কেটে ওঁরা সব দেখেছেন। কত কাণ্ড। Heart, lungs, liver, spleen, auditory nerves, optical nerves—labyrinth of nervous system (হৃদয় ফুসফুস যকৃৎ, প্লীহা, শ্রবণ-নাড়ী, দর্শন-নাড়ী—সব নাড়ীর গোলোকধাঁধা) রয়েছে। কত রকম এইসব চলছে, তবে দেহটি চলছে। এর একটা নিয়ে যাও না—লিভারটা নিয়ে যাও, দেখি কেমন চলে! তখন সব বন্ধ হয়ে আসবে। কত কাণ্ড দেখ না। শরীরটা চালাবার জন্য কত হেঙ্গাম। তা'তে আবার মন-বুদ্ধি, কি আশ্চর্য!

বড় জিতেন—এই জেণ্টলম্যানদু'টি (মন বুদ্ধি) কোত্থেকে এলেন ?

শ্রীম—ওরা (ওয়েস্ট) বলেন, বাইরে থেকে। কিন্তু এদেশের লোকই ঠিক ধরেছে। সাংখ্যে (কপিল) বলেছেন, এরা এই শরীর থেকেই এসেছে। ও-দেশের (পাশ্চাত্যের) leading scientistরা (শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও) এটা স্বীকার করেছেন—Materialistic Theory (জড়বাদ)।

আমাদেরও তাই (অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে) মনে হয়। যদি মন বুদ্ধি (ভিতরে) থাকবে তা' হলে পূর্বে কি ছিলাম তা' স্মরণ হয় না কেন ?

যাকে জীবাত্মা বলে, আমার মনে হয়, ওসব কিছু নাই। থাকলে মনে হতো পূর্বের ঘটনা। পরমাত্মাই আছেন শুধু। বলে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে মন বুদ্ধি থাকে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না।

শরীর একটি যন্ত্রবিশেষ। শরীর দেখে বলা যায় ভিতরে কি আছে। চোখদু'টি আয়নার মত কিনা। সব বোঝা যায়। তাই শরীরে মানুষের ভিতরের চিহ্ন পাওয়া যায়। কে কেমন লোক হবে তা' তার চাল চলন দেখে বলা যায়—চঞ্চল কিনা, ফচ্‌কে কিনা, বাচাল কিনা।

কেউ এমন, ছাদে বেড়াচ্ছে—তা' পাশের ছাদে হাঁ করে চেয়ে রইলে। এর মানে তার স্বভাবই ঐ। তাই তাকে এরূপ করাচ্ছে। এ ব্যক্তি সে কথা জানে না। অপরেও জানে এটা, বুঝতে পারে না। মনে করে, সে দুষ্টুমি করে করছে। না, ঐ তার স্বভাব। সেই করাচ্ছে।

কেউ কেউ রাস্তায় চলছে। খালি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, সব ভোগের জিনিসের দিকে। আবার এমন লোকও আছে, দেখতে পাওয়া যায়, সে কোথাও তাকাবে না। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ভোগের জিনিস সামনে রয়েছে। সে মোটেই চোখ তুলে চাইবে না। রাস্তা দেখার সঙ্গে হয়তো চোখে পড়লো, একটু দেখলে। আর অমনি মনকে চেপে নিচে রেখে দিলে। তাদের সংযম আছে।

যোগীদের এই সংযম থাকে। কোনও দিকে তাদের লক্ষ্য নাই।

এক লক্ষ্য অন্তরে। তাই যোগীর definition (সংজ্ঞা) হল, যে মনের দাস নয়, মন যার দাস।

যোগীর লক্ষণ এই। তার মন সংযত। অন্যদিকে লক্ষ্য নেই—লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরের দিকে।

তপস্যা কেন? না, এই মন সংযত করবার জন্যই। তপস্যার পরীক্ষা হয় মনের সংযম কতটা হলো দেখে। মনের রোখের জন্যই তপস্যা।

একজন (শ্রীম) ছাদে বেড়াতেন। তাঁর কোনও দিকে নজর নাই। অন্য বাড়ীর মেয়েরা ওঁর পরিবারকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের কর্তা ছাদে বেড়ান। কৈ এদিক ওদিক তাকান না তো? আর একজন বললে তাকায়—আড় নয়নে (হাস্য)। পরিবার উত্তর করলে, না, ওঁর স্বভাব, কোনও দিকে চাইবেন না।

যুবক রাখাল দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর জমিদারীতে কাজ করে। সে আসিয়াছে। ছোট নলিনী আজ দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়াছেন, হাতে প্রসাদ। শ্রীম ভক্ত সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে।

শ্রীমর দীর্ঘকালের বাসনা, মা কালীর মন্দিরে নহবত বাজে। বহুকাল পরে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, মন্দিরের রিসিভার ভক্তিমান কিরণ চন্দ্র দত্তের চেষ্টায়। এখন নিত্য চারিবার নহবত বাজিতেছে, যেমন বাজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়।

শ্রীমর আনন্দের সীমা নাই। মন্দিরের খাজাঞ্চি আজ রাখালকে পাঠাইয়াছেন শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিতে। আর বলিতে, আপনার প্রার্থনা মা শুনিয়াছেন। তিনি নিত্য চারিবার নহবত শুনিতেছেন আজকাল। আপনিও আসিয়া উহা শুনিয়া যান। রাখালের মুখে শুনিলেন, আজকাল মায়ের জমিদারীর সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। মায়ের ভোগরাগ পরিপাটির সহিত হইতেছে। পূর্বের ন্যায় কালীবাড়ীতে সাধু, ভক্ত, দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইতেছে। এইসব কথা শুনিয়া শ্রীমর আহ্লাদ ধরে না। তিনি আনন্দে ভগবৎ মহিমা কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঈশ্বরের কাজ মানুষের বুঝবার শক্তি নাই। বিচিত্র তাঁর লীলা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। দেখ না, কি করে এল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভার কিরণবাবুর উপর। কে একজন নালিশ করলো। তার মনে কি ভাব কে জানে? সেই নালিশের সম্পর্কে হাইকোর্টের জজরা বেলুড় মঠকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন? না, জজরা অনুমান করলেন, হয়তো বেলুড় মঠ এতে interested (সংশ্লিষ্ট)। দ্বিতীয়, বেলুড় মঠের reputation (সুনাম) আছে। তাঁদের recommendationএ (সুপারিশে) এটা এল কিরণবাবুর হাতে, মানে মঠেরই হাতে। তবে এই সব হচ্ছে, নহবত হয়েছে। ভোগেরও বন্দোবস্ত ভাল হয়েছে। এখন ভক্তরাও বেশী আসা যাওয়া করছেন।

আবার বেলুড় মঠই দেখ না। কি করে হলো? ওয়েস্টের ভক্তরা টাকা দিলেন, তবে হলো। কি চারদিকে জঙ্গল—কি ম্যালেরিয়া। ই. আই. আর. ঠিক করলে ওখানে কি করবে, মঠের আশেপাশে গঙ্গার ধারে কারখানা কি কি। তাই তারা জঙ্গল সাফ করলো। তা'তে ম্যালেরিয়া অনেক কমে গেল। কিন্তু তারা কিছুই করে নাই। মাঝখান থেকে এই কাজটি হয়ে গেল।

তাই তাঁর কাজ কেউ বুঝতে পারে না। তাই ঠাকুর বলতেন, প্রার্থনা করতে হয়—প্রভো, যাতে ভাল হয়, তাই কর। মানুষ কি বোঝে? কি বলতে কি বলে বসে। তিনিই জানেন কিসে ভাল হবে। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ফেঁদেছেন।

এই দেখ না আমাদের মনটি—বুদ্ধি। অমুক বড় বিদ্বান, বড় বুদ্ধিমান। সাতদিন খেতে না পাক দিকিন, কেমন থাকে তার হামবড়া? কোথায় যায় বুদ্ধি তার নাই ঠিক। এই যে অন্ন, তা' কি আর মানুষ সৃষ্টি করেছে? তিনি করেছেন। এইজন্য অন্নকে ব্রহ্ম বলেছেন ঋষিরা। আবার প্রাণ মন বুদ্ধি এসবও ব্রহ্ম, ছোট ব্রহ্ম। বৃহৎ ব্রহ্ম যিনি, তা' থেকেই এসব এসেছে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য।

কোন্‌টা আশ্চর্য নয়! পিতৃমাতৃ স্নেহ, এটা না থাকলে জগৎ উজাড় হয়ে যেতো। মাতৃস্তনে দুগ্ধ, ভেবে দেখ, কি অদ্ভুত ব্যাপার!

স্তনে মুখ দিতেই দুধ আসছে। যেমন পেটে ছেলে বড় হচ্ছে তেমনি স্তনে দুগ্ধও তৈরী হচ্ছে। তারপর হাওয়া জল, কোন্‌টা আশ্চর্য নয়? আশ্চর্যসাগরে আমরা ভাসছি সর্বদা।

কিন্তু মানুষের নজর নাই এদিকে। ভাবে, এ তো হচ্ছেই। কে করছে, কি করে হচ্ছে, কেন হচ্ছে? সে প্রশ্ন দেখবার অবসর নাই। এমনি মায়া। এদিকে দিনরাত 'আমি আমি' করছে। একটু তলিয়ে দেখছে না, 'আমি' কোন্‌টা। কোথা থেকে এলো। ঘুমিয়ে থাকার সময় কোথায় যায় 'আমি'টা।

এই এক একটা মানুষ এক একটা mud-ball (মৃৎপিণ্ড)। তার কেন অত অহংকার? এই mud-ballগুলি (মৃৎপিণ্ডগুলি) বলছে, আমরা একটা better universe (উন্নততর জগৎ) সৃষ্টি করে দিতে পারি। কি কাণ্ড তাঁর।

'আমি'টা এই আছে। আবার নিদ্রা স্বপ্ন সুষুপ্তিতে অন্য রূপ হয়ে যায়। লুকিয়ে থাকে। সমাধি হলে তখন যায়। কিন্তু নিচে এলে আবার দেখা দেয়। তবে তা'তে আর অন্যায় চলে না। তখন দেখে বড় 'আমি'রই দাস, সন্তান।

বড় জিতেন—মনের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না। কখনও সাকার, কখনও নিরাকার।

শ্রীম (সহাস্যে)—ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বেশ রসিক লোক ছিলেন। বলতেন, মনের সাকার কেমন? না, যখন মন শরীরে—যেমন আমার শরীর, আমার হাত-পা-মুখ (সকলের হাস্য)। কিংবা যখন বাড়ীঘরের রূপ নেয়—যেমন আমার বাড়ী, আমার ঘর (আবার সকলের হাস্য)। আর যখন নিরাকার নির্গুণকে ভাবে তখন নিরাকার (হাস্য)।

তাই মনের যে মালিক তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়—প্রভো, আমার মনকে টেনে নিয়ে তোমার পাদপদ্মে রাখ—'ধিয়ো যো নো প্রচোদয়াৎ।'

নিজের চেষ্টা দরকার। কিন্তু তা'তে কেবল হয় না। মালিককেও

বলা। তাঁর ইচ্ছা হলে মন দমন হয়। যারা মনকে জানে মন তাদের বশ।

২

পরের দিন সকাল আটটা। মর্টন স্কুলের দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের ঘরে শ্রীম বেঞ্চেতে বসা, উত্তরাস্য। অন্তেবাসী সম্মুখে। উভয়েই প্রুফ দেখিতেছেন। অনেকগুলি প্রুফ আসিয়াছে কথামৃতের। অপর দিকে ভক্তগণও আসিতেছেন। কপি অন্তেবাসীর হাতে, আর শ্রীমর হাতে কলম। প্রুফ দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে উহা হইতে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—এই দেখ, বলছেন, কর্ম না করলে জ্ঞান হয় না। তাই তো স্বামীজী মঠে কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। সকলের তো এক ধাত নয়—ভিন্ন ভিন্ন ধাত। যার প্রকৃতিতে কর্ম আছে তা'কে যদি বল, বসে ধ্যান কর, তা' হবে না। তাই নিষ্কাম হয়ে কর্ম কর। তখন শুদ্ধ চিত্তে তাঁর ধ্যান হবে। তাই এ ব্যবস্থা।

প্রায়ই দেখা যায়, কর্ম না করাতেই মন খারাপ হয়। কর্ম নিয়ে থাকলে, হয়তো এ হয় না। বলে, idle brain is the devil's workshop (নিষ্কর্মার ঘাড়ে ভূত চাপে)।

মিস্টার ডাউলিংএর প্রবেশ। ইনি কয়েকবার শ্রীমকে দর্শন করিয়াছেন। প্রথম পরিচয় হয় বেলুড় মঠে, স্বামী অভেদানন্দজীর মাধ্যমে। শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

M. (to Mr Dowling)—Sri Ramakrishna said, meditate on me and me alone, and I will do the rest for you. Who can say these words? This evidently proves that he was the God-incarnate.

Then he said, if you can't meditate, then do pray incessantly. If that is also not possible, then do Niskama work that is, works for God, not for your own enjoyment.

Karma or work is the means. The end is God, Meditation is also a Karma. This also you are to do unselfishly. It is of

course, a higher type of work. But that also binds one equally if one does not do it surrendering the fruits thereof to the Lord.

প্রুফ দেখার বড়ই বিঘ্ন হইতেছে। অন্তেবাসী বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু শ্রীমর চিত্ত অবিক্ষুব্ধ। তিনি প্রসন্ন চিত্তে ঠাকুরের কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে প্রুফ দেখিতেছেন। তিনি যেন মনে করিতেছেন, ভক্তগণকে ঠাকুর পাঠাইয়া দিতেছেন। ভক্তগণকে ঠাকুরের কথামৃত পরিবেশন করা, আর 'কথামৃতের' প্রুফ দেখা, একই কার্য। উভয়ের ফল এক—শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তিলাভ।

আবার কেহ কেহ আসিতেছেন মর্টন স্কুলের পরিচালনের পরামর্শ লইতে। তাঁহাদিগকেও প্রশান্ত চিত্তে উপদেশ দিতেছেন। যাহাই করিতেছেন, সবই বুঝি শ্রীভগবানের সেবাবুদ্ধিতে করিতেছেন। তাই কি এই প্রশান্তি!

এখন সন্ধ্যা। বাহিরে অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। দুই দিন ধরিয়া সমানে বৃষ্টি। তবুও ভক্তগণের আসার বিরাম নাই। বড় জিতেন ছোট রমেশ ও ছোট অমূল্য আসিয়াছেন। তারপর আসিলেন মনোরঞ্জন, বিনয় ও বলাই। জগবন্ধু ও গদাধর এখানেই রহিয়াছেন। সকলে চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসা। শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে

শ্রীম (ডাওলিংএর প্রতি)—শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি কেবল আমার ধ্যান কর, শুধু আমার ধ্যান। তা' হলে, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমার আর যা কিছুর দরকার, সে সবই আমি নিজে করে দিব। কে এ কথা বলতে পারে? এইটেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে দিচ্ছে, তিনি ঈশ্বর—নরকলেবর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, যদি ধ্যান করতে না পার, তা' হলে নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা কর। যদি তা-ও সম্ভবপর না হয়, তা' হলে নিষ্কাম কর্ম কর। অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য কর্ম—তোমার নিজের ভোগের জন্য নয়।

কর্ম উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

ধ্যান ও কর্ম। এই ধ্যানও তোমাকে নিষ্কামভাবে করতে হবে। ধ্যান, অবশ্য উচ্চাঙ্গের কর্ম। কিন্তু এই ধ্যানও সমানভাবেই একজনের বন্ধনের কারণ হয় যদি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে না করা হয়।

উত্তরাস্থ, সিঁড়ির পাশে। একটু পর আসিলেন ডাক্তার বক্সী ও ছোট নলিনী। সারাদিনের কর্মক্লান্তি দূর করিবার জন্য শ্রীম মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণকীর্তনে ব্যস্ত।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—তোমাদের বাড়ীর সব ভাল তো ?

ছোট রমেশ—আজ্ঞে না। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় ভুগছে।

শ্রীম—ম্যালেরিয়ার আসল কারণ কি তা' কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বলে, কারণ মশা। মশা তো কারণ নয়। কি জন্য মশা হয় তাই কারণ।

Logicএ (ন্যায় শাস্ত্রে) fallacy (ভ্রমজ্ঞান) পড় নাই ? এতে আছে invariable (অপরিবর্তনশীল), দু'টো circumstances (ঘটনা) থাকলে অনেক সময় তাদের cause and effect (কার্যকারণ) বলে মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তারা তা' নয়। দু'টোই common effect of the same cause (সমান কার্য অপর একটা কারণের)।

যেমন রাত দিন। রাতের পর দিন, দিনের পর রাত। তা' দেখে বলা যেতে পারে, day is the cause of night and vice versa (রাতের কারণ দিন, আবার দিনের কারণ রাত)। কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। এই দু'টোই অন্য একটার effect (কার্য)। তেমনি মশা আর ম্যালেরিয়া, এ দু'টোই অন্য একটা কারণের effect (কার্য)। একটা আর একটার cause (কারণ) নয়। কারণ হ'ল ঐ জল জঙ্গল।

শুকলালবাবুর বাড়ীটা বড় খারাপ জায়গায়। বেলেঘাটা খালের পার। ভারি দুর্গন্ধ। খালের এই জল থেকে মশা হয়।

এখন theory (কাল্পনিক সত্য) ঐ—মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়। কিন্তু ওদের theory (আনুমানিক সত্য) খুব বদলায়। হয়তো দশ বছর পর বলবে আর একটা। তাই ঐ theoryতে (অনুমানিক সত্যে) বিশ্বাস করতে নাই ষোল আনা। এক, দুই, তিন, কি চার আনা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হয়। এর বেশী নয়।

শ্রীম (ছোট অমূল্যর প্রতি)—ডাক্তারবাবুর খবর কি ? ড্রাইভারকে বলেছেন কি ?

ছোট অমূল্য—আজ্ঞে হাঁ, ওকে ডিস্‌মিস্ করে দিয়েছেন। তার সঙ্গে বচসাও হয়েছে। সে হয়তো কোর্টে নালিশ করবে। গাড়ীর damage (ক্ষতি) করেছে, তার উপর আবার বচসা।

শ্রীম—একজন experienced lawyerএর (প্রবীণ উকীলের) পরামর্শ নেওয়া উচিত—ড্রাইভার liable (দায়ী) কিনা ঐ damageএর ক্ষতির জন্য।

বড় জিতেন—ঝিকে ছাড়িয়ে দিলে এক টাকা বেশী দিতে হয়। চাকরকেও তেমনি কিছু বেশী দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হয়। তা' না হলে হাঙ্গাম করবে। তা'তে কর্ম অনেক বেড়ে যায়। এতে কমে আসে।

মামলা মোকদ্দমা বড়ই ঝঞ্ঝাট। অত বড় বিজ্ঞ lawyer (উকীল) সার রাসবিহারী। তিনিই বলেছেন, Don't go to the court. (আদালতে যেয়ো না)।

শ্রীম—বটে! কিন্তু এদের কথা ideal (আদর্শ) নয়। সে এক দিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু এর (মোকদ্দমার) value (মূল্য) কত! Mentality (মনোবৃত্তি) যে ঐ হয়ে যাবে (ঠকে ঠকে)। তার কি করলে?

ডাক্তার কার্তিক বক্সীর প্রবেশ। পুনরায় শ্রীম বড় জিতেনের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন—'মোকদ্দমা বড়ই ঝঞ্ঝাট।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ইচ্ছা করলেই কর্ম থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। ও (মোকদ্দমা) হচ্ছে কেন? তার যে একটা মস্ত spiritual significance (আধ্যাত্মিক মূল্য) রয়েছে। যে mentality (মনোভাব) নিয়ে ঐ কাজ avoid (পরিত্যাগ) করতে চাইবে, সেই mentality (মনোভাব) নিয়ে কামক্রোধের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।'

অর্জুন কেন যুদ্ধ করতে চান না? মোহ এসেছে, ভয় এসেছে। যে কাজ ভয়ে avoid (পরিত্যাগ) করা হয়, সে কর্মত্যাগ ত্যাগ নয়। বরং উহা আরো কর্ম বাড়িয়ে দেয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কর্মের সঙ্গে মানুষের একটা constant fight (অবিরাম সংগ্রাম) চলছে। যে আস্তিন টেনে লড়তে না চায় কর্ম তাকে ছাড়ে না।

তাই গুরুর দরকার। Muscle (মাংসপেশী) কি করে বাড়বে তার উপদেশ পাওয়া যায় গুরুর কাছ থেকে।

কর্ম ফাঁকি দেবার যো নাই। ভগবানদর্শন হলে তবে হয়। তখন কর্মত্যাগ হয়। তখন কেউ কেউ কর্ম রেখে দেন—যেমন অবতারাদি, লোক শিক্ষার জন্য, জগতের কল্যাণ হবে ভেবে। তাঁরা থাকতে চান ভক্ত নিয়ে। ভ্রমেই একটু থাকতে চান। এর কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ যেন ছেলেদের খেলা। তখন তাঁদের কিছু করতে পারে না। সিদ্ধপুরুষ যা বলেন, সে সব পাকা পাকা কথা। এর অন্যথা হয় না।

দু'টি আছে—কর্মকাণ্ড আর কর্মযোগ। কর্মকাণ্ড হলো হিজি-পিজি কর্ম। আর কর্মযোগ হলো, যে কর্মে চিত্ত শুদ্ধ হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, সেই নিষ্কাম কর্ম।

৩

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম নৈশ ভোজন করিতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে ভাগবত খুলিয়া 'সাধুসঙ্গ ও কর্মত্যাগ' অধ্যায় বাহির করিয়া দিয়া গেলেন।

একজন ভক্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। আর সকলে নিবিষ্ট হইয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুনরায় পঠিত অংশ পাঠ করিতে বলিলেন। এই পাঠও সমাপ্ত হইল। এখন সাড়ে আটটা। শ্রীম এইবার কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই যে বই পড়া, তা' কেন? Daily practice (নিত্য অভ্যাস) করা হবে বলে এই সব পাঠ। তা' ছাড়া অন্য কারণ নাই। বই পড়ে জেনে নেওয়া কি করতে হবে। তারপর

বই ছেড়ে অভ্যাস করা। পড়া সহজ, অভ্যাস কঠিন। অভ্যাসের সময় অনেক কষ্ট করতে হয়। অনেক অসুবিধা আছে। তাকে ভয় করলে আর হলো না। সোনা গালান হলো না। বৃথা জীবনটা কাটান হলো খেয়ে পরে শুয়ে ঘুমিয়ে।

ঠাকুর অধর সেনকে বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি সেরে ন্যাও। মানুষের জীবন যেন পাড়া গাঁ থেকে সহরে আসা কর্ম করতে। কর্ম ফুরিয়ে গেলেই চলে যেতে হবে। বাজী শেষ হওয়ার পূর্বেই এমন কর্ম করতে হয় যাতে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি লাভ হলে তাঁর কৃপায় এজন্মেই ঈশ্বরদর্শন করতে পারে। যদি তা' না হয়, তা' হলেও ক্ষতি নাই। পরজন্মে ঐ ভক্তি কাজে লাগবে। যেখানে ছেড়েছে সেখান থেকে চেষ্টা হতে পারবে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য। লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।

ভয় পেলে আর হলো না। যে কর্মই সামনে এসে পড়ে, কোমর বেঁধে তাই করতে হবে নিষ্কাম ভাবে।

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি)—তাইতো আমরা ডাক্তারবাবুকে বললুম, ললিতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একজন ভাল উকীলের পরামর্শ নিতে। ডাক্তারবাবু এই যে মোকদ্দমায় পড়েছেন তা' করতে হবে না? যদি বল কেন করা, তার উত্তর, এ করলে চিত্তশুদ্ধি হবে। শুদ্ধ চিত্তে ভগবান আবির্ভূত হন। যার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তার কাছে কামক্রোধাদি দমন থাকে। সর্বদা এই যুদ্ধ চলছে মানুষের ভিতর অহরহ। যে কর্মকে ভয় করে সে এই জীবনযুদ্ধে হেরে যাবে।

দেহ আছে বলেই কর্ম। দেহ না থাকলে কিছুই নাই। মুখে বললেই তো হয় না, এসব কিছু নয়! এ তো তোমার শোনা কথা। ধারণা হয়েছে কি? তা' যদি না হয় তবে কেমন করে বলা যায়—এসব কিছু নয়?

এই সংসার মিথ্যা, কর্মও মিথ্যা, দেহও মিথ্যা—এটি বোঝাবার জন্যই এসব আয়োজন, এইসব কর্মের। এখন তো কেবল মুখের বুলি, এই কর্ম হাতে আনতে হবে। অর্থাৎ, নিষ্কামভাবে করে চিত্তশুদ্ধি করতে হবে। তখন তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন হলে বোঝা যায় এই সবই মিথ্যা। খুব উচ্চ কথা।

মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে জয় করা। তখন বোধ হয় এ দু'টোই কিছু নয়।

যে কর্তব্য কর্ম করে না সে কামক্রোধ জয় করতে পারে না। তাই যা সামনে এসে পড়ে তা' অবহেলা করলে ঈশ্বরলাভ হবে না। বড় হোক, ছোট হোক, কাজ অবহেলা করা উচিত নয়।

সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম। একজন বৌদ্ধ সাধু ছাত্র পড়াচ্ছিল। ক্রোধ হলো, আর অমনি বসিয়ে দিলে এক ঘা। আর তাতেই ছেলেটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হলো। জজ বিচার করে rigorous imprisonment (সশ্রম কারাদণ্ড) দিলেন। জজ মন্তব্য করলেন, আমরা জানি আপনি monk (সাধু)। কিন্তু আইনের মর্যাদা রাখতে গিয়ে আপনাকে এই শাস্তি দেওয়া হলো।

ক্রোধ দমন করতে পারলো না। তাতেই এই দশা। তেমনি কাম। তা' দমন না করতে পারলে ছেলেপুলে হয়ে যায়।

দেখ না, কর্ম কেমন! সব ছেড়ে ঐ সাধুটি গেল নিষ্কাম কর্ম করতে। অর্থাৎ কর্ম কমাতে গিছলো। এখন কর্ম আরও বেড়ে গেল। এমন বেড়ে গেল যে কর্মসমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

যেমন, খালে ছিল হঠাৎ গিয়ে সাগরে পড়লো জাহাজ। আর (নিজের শরীর দুলিয়ে) এমন করে দুলছে। কেন এমন হলো? না, সাগরে যে পড়েছে জাহাজ।

তাই গুরু যা বলেন সেই কর্ম করতে হয়। তিনি গুরুরূপ হয়ে এসে যা যা বলে গেছেন তা' পালন করতে হয়। শুধু তাই নয়। প্রথম, তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়। আর দ্বিতীয়, যা বলেছেন তা' আবার চিন্তা করতে হয়। এই দু'টি করলে, তিনি সব বুঝিয়ে দেন।

শুধু মুখস্থ করলে কি হবে? অনেক আছে, তাদের মুখস্থ আছে বেশ। কিন্তু কাজে কিছু করে না। হাতে আনবার চেষ্টা নাই। বাজনার বোল শুধু মুখে বললে কি হবে?

তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর সঙ্গে ভালবাসা চাই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গুরুবাক্য বই উপায় নাই। গুরুবাক্য

যে বিশ্বাস করে না, তাকে ওতে (সংসার সমুদ্রে) হাবুডুবু খেতে হয়।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি ক্ষত্রিয়। তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ রয়েছে। তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। আবার বললেন, যদি আমার কথা না শোন, যদি যুদ্ধ না কর তা' হলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। "(চেৎ) ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি",—এর মানে তোমার soul-এর (জীবাত্মার) বিনাশ হবে, অধোগতি হবে। কর্ম-সাগরে পড়ে যাবে।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—সময়ে ছেলেপুলের যত্ন নিতে হয়। সময়ে যত্ন নেয় না অনেকে। তাতেই শেষে কাজ বেড়ে যায়। নানা ঝামেলা পোয়াতে হয় শেষে। সময়ে যত্ন নিলে হয়তো মানুষ হতো। তা' নিলে না। এখন সে মূর্খ হয়েছে। তার কর্মও তোমায় ভুগতে হবে। ভোগ তা' এখন। কেন যত্ন নিলে না আগে ? যাই neglect (অবহেলা) করবে, avoid (পরিত্যাগ) করবে, তাতেই ভোগ বেড়ে যাবে। আবার বেশী যত্ন নাও, বাড়াবাড়ি কর তাতেও কুফল। সেইজন্য যা কর্তব্য তা' মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কর।

ডাক্তার বক্সী—যদি জপ ধ্যান নিয়ে থাকা যায় সেই ভাল। সেও তো ঈশ্বরেরই কাজ।

শ্রীম—সে তো ভাল, কর না তা'। কিন্তু পারা যায় কৈ ? পারলে তো খুবই ভাল। শান্তরস আস্বাদন—ঋষিদের তা' ছিল। সকল কর্ম ছেড়ে তাঁকে নিয়ে ছিলেন ঋষিরা। কোনও দূর দেশে চলে গেল। ছয়টি ভাব আছে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার। শান্ত ভাব ওর একটি। ঐটি হয় না বলেই তো কর্ম।

বড় জিতেন—এমনও দেখা যায়, কর্ম না করলে কোন great character (সুমহৎ চরিত্র) হয় না।

শ্রীম—না। Intellectual (বুদ্ধি) বিচারের দ্বারা কর্ম করা ঠিক। এ দিয়ে সিদ্ধান্ত করা, এ এক রকম আছে। কিন্তু এ (ডাক্তারের মোকদ্দমা) তা' নয়। এর সঙ্গে highest ideal-এর (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের) যোগ রয়েছে। সে তো আছে এক রকম। আর, এ ভিন্ন

রকম। এ কেমন? না যেমন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে দু'টোই ফেলে দেওয়া।

ক্রাইস্ট যে অত শান্ত, তিনিও বলেছেন, দরকার হলে যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের পূর্বে ধারণা ছিল ক্রাইস্টের সব কাজই non-resistance based (অহিংসামূলক)। কিন্তু ভাল করে তলিয়ে দেখলুম, তা' নয়। তিনিও প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে বলেছেন।

যখন ক্রাইস্টকে ধরতে এলো তখন তাঁর শিষ্যরা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াল। একজন প্রতিপক্ষের একজনের একটা কান অস্ত্রাঘাতে কেটে ফেললো। তখন তিনি বললেন, থাক্ থাক্। তারপর এমন কথা আছে, তাঁর ইচ্ছায় কানটা আবার জুড়ে গেল।

কেন তিনি এটি করালেন? না, principleটা (নীতিটা) assert (সংরক্ষণ) করবার জন্য। নমুনাস্বরূপ এই একটু প্রতিঘাত করিয়ে তারপর বললেন, আহা ক্ষান্ত হও—থাক্ থাক্। শাস্ত্রে সবই আছে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—দেখছ তো, কর্ম করতে হয়। কর্ম না করলে, বেশী কাজে আরও জড়িয়ে পড়বে। এমনও বললেন, বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

তিনি অতন্দ্রিত হয়ে কাজ করতেন, শ্রীকৃষ্ণ—একেবারে (আহার) নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে।

অবতার ছাড়া কর্মের এ রহস্য ভেদ করা কার সাধ্য? শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, তোমার প্রকৃতিতে যা আছে তাই কর নিষ্কামভাবে। ভয়ে মোহে অর্জুন তাঁর প্রকৃতিসুলভ কর্ম যুদ্ধ করতে চান নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভয় দেখিয়ে ও ভরসা দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে নিলেন। তবে তো তিনি সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাজ্য ছেড়ে মহাপ্রস্থান করলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রাজসূয় যজ্ঞ, এ সব না করলেন, তবে তো সংসার মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য—এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তখন হিমালয়ে বরফে শরীর ত্যাগ করলেন।

যে রাজ্যের জন্য অত যুদ্ধ সেই রাজ্য ছেড়ে চললেন মহা-

প্রস্থানে। কেন? জ্ঞান হয়েছে যে, এই সব মিথ্যা। কেবল ব্রহ্ম সত্য। তবে কেন আর এখানে থাকা?

তাই গুরুর অবতারের আশ্রয়ে থেকে কর্ম করলে শীঘ্র হয়ে যায় কর্মক্ষয়। তখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, মনের বাসনার নাশ হয়, আর জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। এরই নাম মুক্তি। এটা সাধারণ নিয়ম।

ঠাকুর আর একটা পথ দেখিয়ে গেছেন এখনকার সময়োপযোগী। বলেছেন, নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে বল, প্রভো, দেখা দাও। এটা সহজ পথ।

ভক্তগণ সকলে বিদায় লইলেন। শ্রীম নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ছোট জিতেন ও অন্তেবাসীও ঘরে গেলেন। শ্রীম ছোট জিতেনের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি, নয়নহাস্যে)—ডাক্তারবাবুকে তাই বলে দিলাম, কর্তব্য (মোকদ্দমা) না করলে কর্ম আরও বেড়ে যাবে। হয়তো পাঁচ সাতটা ছেলে-পুলে হয়ে যাবে। "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"। তাঁকে স্মরণ কর সদা, সঙ্গে কাজ কর। এই পথ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ
২০শে ভাদ্র ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, শুক্লা নবমী ৫৪ দণ্ড। ২০ পল

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ও-ও—গদাইর ভক্ত তুমি

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীমর কক্ষ। এখন অপরাহ্ণ দুইটা। শ্রীম ও জগবন্ধু প্রুফ দেখিতেছেন। শ্রীম বিছানায় বসা দক্ষিণাস্য। সামনে বেঞ্চেতে জগবন্ধু। দেখিতে দেখিতে ভাটপাড়ার শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন, ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চি ও গদাধর একটু পর ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সীর সহিত

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার শ্রীমর ইচ্ছায় এক ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। অন্যায়পূর্বক ডাক্তারের মোটর ড্রাইভার বারবার গাড়ীর লোকসান করিতেছে। মানা করিলেও শুনে না। তাহার এই অন্যায় আচরণের জন্য পুলিশ কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য শ্রীম ডাক্তারকে নানাভাবে উদ্বদ্ধ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীম ডাক্তারকে উপদেশ দিতেছেন—গৃহস্থ আশ্রম কি? তাহার দায়িত্ব কি? কর্মযোগ কি?—এই সব বিষয়ে।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—গৃহে থাকতে হলে এ সব কাজ করতে হয়, অপ্রীতিকর হলেও। নইলে ঘর ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াও। সেখানে এ সবের দরকার নাই। বারবার অন্যায় করছে চোখের সামনে। শক্তি থাকলে তার প্রতিবাদ না করলে পাপ হয়। যদি তা' না হয় তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কত প্রকারে চেষ্টা করলেন যাতে যুদ্ধ না হয়। যে পাণ্ডবগণ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী, তাঁদের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রাম চাইলেন অন্নবস্ত্রের জন্য— পানিপ্রস্থ, শোণিপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, ব্যাঘ্রপ্রস্থ ও তিলিপ্রস্থ। এই সবই দিল্লীর আশেপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। কিন্তু দুর্যোধন বললেন, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিবেন না। ধৈর্য ও নিষ্পত্তির শেষ সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধ অনিবার্য। না করলে পাপ হবে। ন্যায়ের ও ক্ষমার মর্যাদা নষ্ট হবে যুদ্ধ দ্বারা দুষ্কর্মের প্রতিবাদ না করলে। লোকক্ষয়, অর্থনাশ, দেশে অশান্তি, কত সব ঝঞ্ঝাট এই যুদ্ধে। কিন্তু তা' ভাবলে হবে না। সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করতেই হবে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় ডাক্তারকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম—যে কাজ আপনিই এসে পড়ে তা' করতে হয়। নিষ্কামভাবে করলে তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হলে আর ভয় নাই। তখন মন স্থির থাকে সব অবস্থাতে। কারণ লাভালাভ দুই-ই ভগবানের। আমি কেবল তাঁর যন্ত্র, দাস—এই ভাবনা মনের ভিতর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকে। কিন্তু যদি কেহ লাভের প্রত্যাশা করে নিজের জন্য, তবে ক্ষতির

আশঙ্কাও তাকে করতে হবে। তাতেই মন চঞ্চল হয়। যার চিত্ত, মন শুদ্ধ সে স্থিতপ্রজ্ঞ। সুখদুঃখে সে সমান শান্তভাব রক্ষা করতে পারে।

গৃহস্থাশ্রম নিষ্কাম কর্মের স্থান। এখানে থেকেও মোক্ষলাভ হয় যদি নিষ্কামভাবে সংসার করে। ঈশ্বরই এই আশ্রমের মালিক, আমি দাসীবৎ কর্ম করছি তাঁর—এই ভাবনা সর্বদা জাগ্রত্ রেখে কাজ করা।

সকাম কর্মও ভাল। তবে ফল অত উঁচু নয়। সকাম কর্মকেও কৃষ্ণ 'উঁচু ও উদার' বলেছেন। কেন ? না, কর্মীও ঈশ্বরকে মানে।

কঠিন বটে নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু একটু করতে পারলেই মুক্তি-ফল লাভ হবে। গীতায় আছে 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। একটুতেই কাজ হয়ে যায়। ঈশ্বর নিজে এসে উঠিয়ে দেন ভক্তকে। নিজে নিষ্কাম কর্ম করে ভক্তদের উহা শিক্ষা দেন।

ভাববেন না। মনে নিশ্চয় করে লেগে যান। তা' না হলে মনে ঐ গলদ থেকে যাবে। ন্যায় ও সত্যের স্থান অধিকার করবে আলস্য। ধর্মপথ, কর্মপথ—সবাইর মহাশত্রু আলস্য। এই তমোরূপী অসুরকে বধ করতে হবে।

, ইহা ক্ষমা নয় তামসিকতা। ঝঞ্ঝাটের ভয়ে, মোকদ্দমা না করার মানে তমের কাছে পরাজয় স্বীকার করা, তমের বশ্যতা শিরে ধারণ করা। এই মন নিয়ে ঈশ্বরলাভ হয় না।

সত্ত্বগুণের কাজ, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করা, ধর্মের বিজয় ঘোষণা করা। আপনি এই মোকদ্দমা করলে, ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা হয়। এর relative value (আপেক্ষিক মূল্য) কত বড়! এতে মন উঁচুতে উঠবে, ভগবানে বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে।

বাহির হইতে আগত ভক্তগণ বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। জগবন্ধু, বিনয়, গদাধর দাঁড়াইয়া শ্রীমর এই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যসমূহ শুনিতেছেন।

ডাক্তারের চক্ষু স্থির। নির্বাক প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাড়ী যাইবেন, সঙ্গে ভাই বিনয়।

শ্রীম পুনরায় প্রুফ দেখিতেছেন। জগবন্ধুর হাতে কপি। মাঝে

মাঝে গদাধরও কপি পড়িতেছে। প্রুফ দেখা শেষ হইলে শ্রীম দরজা বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। জগবন্ধু বিনয় ও ছোট অমূল্যের সঙ্গে নিচের তলায় বসিয়া আছেন। দুর্গাপদ মিত্র, বড় অমূল্য ও বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাপক স্বামী সদ্ভাবানন্দ আসিয়া তাঁহাদের কাছে বসিলেন। একটু পর সকলে চারতলায় উঠিয়া শ্রীমর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিত্যকার ভক্তগণও আসিতেছেন। সকলের শেষ আসিলেন একটি নূতন ভক্ত। শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী সদ্ভাবানন্দের প্রতি)—দেখ, নূতন ভাবের কি বন্যা এসেছে। এ সবই ঠাকুরের আসার অমৃত ফল। কত সব সোনার চাঁদ ছেলে বাড়ীঘর, পিতামাতা সর্বস্ব ছেড়ে ঈশ্বরলাভের জন্য মঠে এসেছে। এদেশে (বাংলায়) সন্ন্যাসী প্রায় দেখা যেতো না। এখন সব হচ্ছে।

ভগবানের শক্তি যখন কাজ করে তখন সব অন্য রকম। একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব হয়। ভক্তগণ সেই আকর্ষণে একত্র হয়। এরাই অবতারের বার্তাবাহক। মানুষ-বুদ্ধি দিয়ে যে কাজ হয় তাতে এই দৈবী আকর্ষণ থাকে না।

কোথায় গ্রাম্য, প্রায়নিরক্ষর ব্রাহ্মণ আর কোথায় তাঁর নামে জগৎ জুড়ে ধর্মান্দোলন। জগতের মনীষীগণও তাঁর ছত্রতলে আশ্রয় নিয়েছেন। এতেই প্রমাণ হয় তিনি কি ছিলেন। যদি মানুষের করা এই আন্দোলন হতো তা' হলে এই বিস্তার হতো না।

কোথায় ইউরোপ আমেরিকা, আর কোথায় কামারপুকুর দক্ষিণেশ্বর। এই মাত্র আরম্ভ হলো এই আন্দোলন। এর বিস্তার হবে অনেকদিন ধরে। তাঁর নামে অসম্ভব সম্ভব হবে, অদ্ভুত সব কর্ম হবে।

ভক্তগণ ক্রমাগত আসিতেছেন। ঘরে আর স্থান নাই। তাই শ্রীম উঠিয়া আসিয়া বসিলেন সিঁড়ির ঘরে দক্ষিণ-পূর্বাস্য চেয়ারে। ভক্তগণ বসিয়াছেন বেঞ্চেতে উত্তরাস্য পূর্ব পশ্চিম দুই সারিতে। এইবার আসিলেন বড় জিতেন, ছোট নলিনী, বলাই ও মনোরঞ্জন।

তুলসী মহারাজ সম্প্রতি ঢাকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। স্বামী সম্ভাবানন্দ সেই সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

স্বামী সম্ভাবানন্দ—ঢাকায় শক্তি ঔষধালয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলসী মহারাজের তর্ক হয়েছিল। তুলসী মহারাজকে পণ্ডিতরা কেহ কেহ প্রশ্ন করেন। তিনি অপর পণ্ডিতদের উত্তর দিতে বললেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হলো। তিনি বসে বসে মজা দেখছেন। একজন পণ্ডিত ওঁর পক্ষ হয়ে তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষ পণ্ডিতদের হারিয়ে দিল।

শ্রীম (আহ্লাদের সহিত)—দেখলে ঈশ্বরই, ঠাকুর, ঐ পণ্ডিতের মুখ দিয়ে বলালেন।

অনেক কালের কথা। তখন হয়তো ঠাকুরের শরীর আছে। কামারপুকুর গিছলাম। কালীপূজা হবে। বৃদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ তন্ত্রধারক। আশীর উপর বয়স। আমরা ঠাকুরের ভক্ত জেনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'গদাই গদাই' করতে লাগলো। বললো, ও গদাইর ভক্ত তুমি? কি করে তার ভক্ত হলে অত পড়াশোনা করে? ও কোনও শাস্ত্র পড়ে নাই। মূর্খ।

আমরা তখন করলুম কি? তাঁর কাছে যা শিখেছি, তার দুই একটা কথা ছেড়ে দিলাম। বললাম, চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে। কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে, অর্থাৎ যেখানে মরা গরু পড়ে থাকে। তেমনি পণ্ডিতগুলো। বড় বড় কথা কয় বটে, কিন্তু দৃষ্টি কামিনী কাঞ্চনে, ভোগে।

আর একটা কথা বলেছিলাম, মনে হচ্ছে। বলেছিলাম, পাঁজিতে লিখেছে, এবার বিশ আঁড়া জল হবে। কিন্তু পাঁজি টিপলে একফোঁটা জলও পড়ে না। তেমনি পণ্ডিতগুলো শ্লোক আবৃত্তি করে ঝুড়িঝুড়ি। কিন্তু ধারণা নাই। সামান্য শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মুখে লম্বা লম্বা কথা বললে কি হয়? হৃদয় পরিপূর্ণ ঈর্ষা-দ্বেষে।

আর বললাম, বাজনার বোল মুখস্থ করা সহজ কিন্তু হাতে আনা বড় কঠিন। বিষয়বাসনা ছেড়ে ভগবানকে ডাকলে তবে ধারণা হয়, হাতে আসে। পণ্ডিতগুলো কেবল মুখে মুখে বোল ঝাড়ে।

পরে শুনলাম, আমরা চলে আসার পর ঐ পণ্ডিত অনুশোচনা করেছিল। বলেছিল, তিনি ঠিক কথা বলেছেন।

এমন সব জায়গায় এসব কথা ছেড়ে দিতে হয়।

রাত্রি আটটা। শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। পাঠের জন্য ভাগবতের গজমোক্ষণ অধ্যায় বাহির করিয়া দিয়া গেলেন। জগবন্ধু পড়িতেছেন।

আজ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ২১শে ভাদ্র ১৩৩১ সাল। শনিবার, রাধাষ্টমী শুক্লা, ৪৯ দণ্ড। ২৫ পল।

আহারান্তে শ্রীম গজমোক্ষণলীলা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অবিদ্যা কুমীরের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেন, যিনি অবিদ্যার সৃষ্টিকর্তা। আর কারো সাধ্য নাই। যত বড়ই হোক না মানুষ মহামায়ার হাতে পুতুল বই তো নয়। অহংকারই গজ। যতক্ষণ এটা থাকে ততক্ষণই অবিদ্যার অধীন। ঠাকুরের ব্যবস্থা এই অহংকারকে বেঁধে দাও ঈশ্বরের পায়ে। তখন অবিদ্যা ছেড়ে দেয় পথ। তাই সদা প্রার্থনা 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'।

২

পরদিন সকাল সাতটা। মর্টন স্কুলের নিম্নতলে সৎপ্রসঙ্গ সভা বসিয়াছে। ইহা ছাত্র ও শিক্ষকের সাপ্তাহিক ধর্মসভা। শ্রীমর চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। ইনি মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন। আজও উপস্থিত আছেন। তিনি একজন ভক্ত শিক্ষককে বক্তৃতা শিক্ষা দিতেছেন। হঠাৎ বলিলেন, এই ইনি আজ বলবেন। নিরুপায় হইয়া শিক্ষক দাঁড়াইয়াছেন। আজের বিষয় শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার চরিত্রের নানাদিক আছে। শিক্ষকের ভাগে পড়িয়াছে শ্রীরামচন্দ্র কি অবতার ?

শিক্ষক বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, ভগবান যুগে যুগে মানুষ-শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁকে অবতার বলে। তাঁর তিনটি মুখ্য কার্য। প্রথম, সাধুগণের পরিত্রাণ ; দ্বিতীয়, দুষ্টগণের বিনাশ ; আর তৃতীয়, সৎ ধর্ম সংস্থাপন।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 'তাঁর কার্যসমূহ উপরোক্ত মানদণ্ডের অন্তর্ভূক্ত। তাই রাম অবতার, অর্থাৎ নরদেহী ভগবান।

কেবল মানুষের বুদ্ধি কাহারও অবতারত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ। এই বিষয়ের অধিকারী অতিমানবগণ, অপর অবতারগণ। কত দুরূহ অবতারত্ব নির্ণয়, ইহা বর্তমান অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় বাণীর দিক্‌দর্শনে তুলিত হলে সম্যক্ উপলব্ধ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অবতারত্বের প্রমাণস্বরূপে নিম্নলিখিত মহাবাক্যাবলীর অবতারণা করেছেন। 'অচীন গাছ', 'বাউলের দল', 'দীনহীন কাঙ্গালের বেশে ঘুরছে জীবের ঘরে ঘরে,' 'ভক্তের নেমন্তন্ন খেতে আসেন' 'সচ্চিদানন্দ এঁর (নিজের শরীরে) ভিতর থেকে বের হয়ে বললেন, আমি যুগে যুগে অবতার হই'। (নরেন্দ্রকে বললেন) 'এঁর (ঠাকুরের) ভিতর থেকে এই সব (বিশ্ব) বের হয়েছে।' 'একদিন মা নানা অবতারের রূপ দেখালেন। তার ভিতর এটিও (নিজের রূপ) দেখলাম'। 'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে'। আবার সুস্পষ্ট উক্তি আছে। নরেন্দ্রকে বলছেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই-ই ইদানিং রামকৃষ্ণ'।

এই উপরোক্ত উক্তিগুলি আমাদিগকে বলে দেয় যে, মানুষের সাধ্য নাই অবতারকে নিজে চেনা। অবতার যদি চিনান তবেই তাঁকে চেনা সম্ভব।

রাবণ রামের শত্রু কিন্তু জ্ঞানী। তিনি বলেছিলেন, (১) রামরূপ হৃদয়ে চিন্তা করলে কাম ক্রোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন রম্ভা তিলোত্তমাও চিতাভস্ম বলে বোধ হয়। তাই রামরূপ ধারণ করে সীতার নিকট যাই না। (২) রাবণ মৃত্যুর সময় রামকে স্তব করেছিলেন অবতার বলে। (৩) নিকষা ছিলেন রাবণের মা। তাঁর সমস্ত কুল রাম ধ্বংস করলেন সংগ্রামে। তবুও তাঁর বাঁচবার প্রবল ইচ্ছা। এই অদ্ভুত আচরণের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে নিকষা উত্তর

করলেন, রামের নরলীলা দেখবার আরও সাধ। তাই বাঁচবার ইচ্ছা। তাই দূরে পালিয়ে যাচ্ছি। (৪) বিভীষণ রামকে ঈশ্বর জেনে তাঁর পদতলে আশ্রয় নিলেন স্ত্রীপুত্রাদি ছেড়ে। (৫) নারদ ও হনুমান, রামকে অবতার বলে স্তব করছেন। (৬) দ্বাপর যুগে, পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ বিভীষণ ও হনুমানের নিকট রামরূপ ধারণ করলে, উভয়েই শ্রীরামকে অবতার বলে পূজা করলেন। (৭) গুরু নানক ও চৈতন্যদেব রামকে অবতার বলে প্রচার করেছেন। চৈতন্যদেবের হরিনাম প্রচারের অন্যতম বাহক 'রাম' নাম। 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'। (৮) শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা বা বালক রামকে জাগ্রত জীবন্ত দেখেছেন। সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছেন, শুয়েছেন, নাইয়েছেন, খাইয়েছেন, প্রহার পর্যন্ত করেছেন। ভাবে নয় প্রত্যক্ষ। (৯) ভরদ্বাজাদি রামকে অবতার জ্ঞানে পূজা করেছিলেন।

এইসব মহাজন বাক্য ও আচরণ শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্বের প্রমাণ। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ শ্রীরামচন্দ্রের নিজমুখের বাণী আমি অবতার।

শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখের উক্তিও অবতারকে চিনবার দুরূহত্বের অন্যতম প্রমাণ। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' বেদশাস্ত্রাদি পড়ে আমায় জানতে পারে না মানুষ (গীতা ১১।৪৮-৫০)। অর্জুন বলিতেছেন, 'অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে' (গীতা ১০।১৩)। তুমি নিজে বলছো তুমি অবতার। আর ঋষিরাও বলছেন, তুমি অবতার। তোমার নিজের কথাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

এই সকল কারণে রাম যে অবতার ছিলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ রামের নিজের মুখের বাণী—'আমি অবতার'।

দণ্ডকারণ্যের ঋষি তপস্বীগণ রামকে নরোত্তম বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা তোমাকে জ্ঞানী বলে গ্রহণ করি, অবতার বলে না। তুমি বহুগুণসম্পন্ন নরোত্তম। তাতেও তাঁর অবতারত্বের বাধা পড়ে না। অবতার তো নরোত্তমই হন।

যা হোক, অবতার হন বা নরোত্তম হন, রামের জীবন থেকে সকলে বহু শিক্ষা লাভ করতে পারে। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম,

প্রজাপালন। সত্যনিষ্ঠা, আশ্রিত বাৎসল্য, কর্তব্য কঠোরতা, বীরত্ব, সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য আদি গুণসমূহ।

আজ অপরাহ্নে বেলুড় মঠে সাধুদের সভা হয়। তাই শ্রীম ভক্তদিগকে একসঙ্গে বহু সাধুদর্শন করিতে পাঠাইয়া দেন। স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ, নির্মলানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানগণও উপস্থিত ছিলেন ভিজিটার্স রুমে। গৃহ পরিপূর্ণ—ঠাকুরের চরিত্রের নানা দিকের আলোচনা হইয়াছে। পরে ভক্তগণ কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন। দুর্গাপদ মিত্র, (হিলিং বাম) প্রশ্ন করিলেন, ঠাকুরকে 'অবতারবরিষ্ঠায়' কিভাবে বললেন স্বামীজী? স্বামী নির্মলানন্দ উত্তর করিলেন স্বামীজী নিজেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। সত্ত্বগুণের অত বেশী প্রকাশ আর কোনও অবতারে দেখা যায় না, তাই অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। দুর্গাবাবু কুতর্কের অবতারণা করায় সভাস্থ সকলের মনে কষ্ট হইয়াছে। এই কথা মর্টন স্কুলের ভক্তগণ গিয়া শ্রীমকে বলিলেন। তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ছি ছি! সাধুদের আশ্রমে গিয়ে তর্ক? কত বড় আশ্রম! সর্বত্যাগীগণ থাকেন ওখানে। কি যে বলে লোক, কি যে করে তার নাই ঠিক। ওখানে গিয়ে জোড় হাত করে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়—কি করে ঈশ্বরলাভ হয়। নয়তো চুপ করে সাধুদর্শন কর। আবার তর্ক!

মঠ থেকে ফেরার পথে ভক্তগণ জগবন্ধু, বিনয়, ছোট অমূল্য, ছোট নলিনী আদি শ্রীমর আদেশে, রাধাকান্ত সাহার লেনে কীর্তন শুনিয়া আসিয়াছেন। পদকীর্তন বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত। শ্রীম সব শুনিলেন। বলিলেন, এই কথাটি মনে থাকলেই সব হলো। চৈতন্যদেব বলছেন, দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়ে ভগবদ ভজনা কর। বাকী সব মিথ্যা। সব পড়ে থাকবে। ঈশ্বরদর্শনই মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁর ভজন করলে এই জীবনে আনন্দ লাভ হবে পরজীবন পরমানন্দে থাকবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ
২২শে ভাদ্র,১৩৩১ সাল, রবিবার, শুক্লা নবমী ৪৩ দণ্ড। ২০ পল।

চতুর্দশ অধ্যায়

কথামৃত জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় গ্রন্থ

মর্টন স্কুল। চারিতলার শ্রীমর কক্ষ। এখন সকাল আটটা। শ্রীম জগবন্ধুর সহিত কথামৃতের প্রুফ দেখিতেছেন—তৃতীয় ভাগ। শ্রীম খাটে বসা পশ্চিমাস্য। জগবন্ধু বসা শ্রীমর খাটের দক্ষিণে বেঞ্চেতে উত্তরাস্য।

আজ সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ। শ্রীমর গায়ে পাঞ্জাবী, পরনে সাদা পাড় ধুতি। শ্রীম পড়িতেছেন আর আপন মনে হাসিতেছেন। শ্রীমর চক্ষু ও মুখমণ্ডল নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত। এবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—ঠাকুরের বলবার কি মনোমুগ্ধকর বিলাস দেখ। বলরামবাবুর এদিকে কত সুখ্যাত করছেন। কিন্তু দোষ দেখাতেও ছাড়েন নাই। (হাস্যরসে আপ্লুত হইয়া) একদিন বললেন, বলরামের ভাব কি জান? তোমরা নাচ, তোমরা গাও, আমোদ আহ্লাদ কর নিজে নিজে। মানে, কীর্তনিয়া ডাকলে পয়সা খরচ।

একদিন বললেন, বলরামের এই ভাব—ব্রাহ্মণের গরুটি। খাবে কম। নাদবে বেশী। আর দুধ দেবে হুড়্ হুড়্ করে (শ্রীমর কুক্ষি-ভাঙ্গা হাস্য)।

একদিন বলরামবাবু ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়েছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাবেন। রাস্তা দিয়ে সব গাড়ী যাচ্ছে। একজন বললেন, ঐ গাড়ী এসেছে। ঠাকুর বললেন, দূর যা। এ আমাদের গাড়ী নয়। এটা যে ধপ্ ধপ্ করে আসছে। আমাদের গাড়ী হবে—ছে-ড়ে-র ছে-ড়ে-র (হাস্য)।

আর একদিন পাঁচসিকে দিয়ে গাড়ী করে দিলেন। ঠাকুর বললেন, অত কম? তিনি বেণী শার গাড়ী আনেন, আর তিন টাকা দু'আনা দেন। বলরামবাবু বললেন, ও অমন হয়। যেতে যেতে ঐ গাড়ী

আর চলে না। বেদম্ মারছে। ঘোড়া তবুও চলে না। ঠাকুর বললেন, কি রে, কি হলো? গাড়োয়ান বললে, ঘোড়া দম নিচ্ছে কর্তা (হাস্য)। ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া—প্রাণপণ টানছে তবুও গাড়ী নড়ছে না। চলে কি করে, বল? এ ঘোড়ার যে অখন তখন (প্রবল হাস্য)।

আবার আর একদিক দেখ। অন্য কারুর ঠাকুরের সামনে বলরাম-বাবুর নিন্দা করবার যো নেই। একদিন গোলাপ মাকে কি ধমক দিছলেন, কি নিন্দা করেছিলেন। কি বলে ধমক দিছলেন তা' মনে আসছে না। (খানিক চিন্তার পর সহাস্যে) হাঁ, মনে পড়েছে। গোলাপ মাকে বলেছিলেন, এ আট আনার রসগোল্লা এনে হাতে হাতে দেওয়া নয়। বলরামের খরচ কত! উড়িষ্যার কটক, কোঠার ও পুরীতে, আবার কলকাতায়, বৃন্দাবনে কত জায়গায় কত খরচ। ঠাকুরের সেবা সব। বললেই হলো? বললেন, আমাদের এখানে আসতে পারবে বলে কলকাতায় রয়েছে। কখনও বলছেন, বলরামের বড্ড খরচ। শুনতে পাচ্ছি অন্যস্থানে চলে যাবে, জমিদারীতে। ওখানে খরচ কম।

একদিকে নিন্দা অন্যদিকে প্রশংসা। তা' নিজে করবেন। অপরকে প্রশংসা করতে মানা নেই। কিন্তু অন্য কেহ নিন্দে করলে রক্ষে নেই। মা যেমন রক্ষা করেন সন্তানকে তেমনি ঠাকুর রক্ষে করছেন ভক্তদের।

শ্রীম প্রুফ দেখিতেছেন আর কপি ধরিয়াছেন জগবন্ধু। এরই ভিতর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। ভক্তরা কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন। কথায় কথায় ঠাকুরের কথার তিন রকম evidence-এর (সাক্ষ্যর) কথা উঠিল। ঠাকুরের কথা নানা জনে লিখিতেছেন। এই সকল লেখার কাহার মূল্য কত, এ সব আলোচনা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—যে লেখার লেখক নিজ চোখে দেখেছেন, নিজ কানে শুনেছেন ঠাকুরের কথা ও কাজ, আবার সেই দিনই লিখেছেন, উহা ফার্স্ট ক্লাস evidence (সাক্ষ্য)। দুই নম্বর হলো, নিজে দেখেছেন শুনেছেন, কিন্তু অনেক পরে লিখেছেন।

আর তিন নম্বর হলো, যার সংগ্রহ অন্যের কাছ থেকে শুনে। এর সঙ্গে আর এক ক্লাসের evidenceও (সাক্ষ্য) দেখতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। একে ফোর্থ ক্লাস বলা যেতে পারে। লেখকের নিজের দেখা ও শোনা কথা, কিন্তু তৎকালে লিখিত নয়, আর অপরের নিকট হতে সংগ্রহ করা—এই দুইয়ের মিশ্রিত লেখা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—'কথামৃত' এই ফার্স্ট ক্লাস evidence (সাক্ষ্য)। আমরা নিজ চক্ষুতে ঠাকুরের যে কার্য দেখেছি এবং নিজ কর্ণে তাঁর যে মহাবাক্য শুনেছি, বাড়ী এসে তাই ডাইরিতে লিখেছি সেই দিন। কখনও সমানে কয়দিন ধরে লিখেছি। অত বেশী কথা হতো কোন কোন দিন। আমরা 'কথামৃতে' এই সব দেবদৃশ্য ও দেববাণী লিপিবদ্ধ করেছি। মূল গ্রন্থে বিবৃত সমস্ত 'সিনে' আমরা উপস্থিত ছিলাম।

অন্তেবাসী—অশ্বিনী দত্তের স্মৃতিকথা, বরানগর মঠের কথা প্রভৃতিও তো 'কথামৃতে' স্থান লাভ করেছে।

শ্রীম—মূল গ্রন্থে নয়, পরিশিষ্টে লেখা হয়েছে। মূল গ্রন্থে সব direct evidence (যা নিজ চক্ষে দেখেছি নিজ কানে শুনেছি তা'।)

Lawyers (উকীলদের) কাছে ইহা অতি মূল্যবান। ওরা cultured men (সুশিক্ষিত লোক) কিনা। দেখেন নাই, অশ্বিনী দত্ত কি লিখেছেন? বলেছেন, আমি কি আর শ্রীমর মত অত সৌভাগ্যবান যে বার তিথি নক্ষত্র দিয়ে ঠাকুরের কথা লিখে রাখবো? ঠাকুরের কথা লিখবার আগেই apology (ক্ষমা) চেয়েছেন ঐ বলে। আনুন না 'কথামৃত'।

ঈশ্বরভক্ত দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্ত ঠাকুরের সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিখেছেন শ্রীম তাহা পড়িয়া শুনাইতেছেন। উহা 'কথামৃতের' প্রথম ভাগের পরিশিষ্ট।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—এই শুনুন কি বলছেন। লিখেছেন, 'আমি তো আর শ্রীমর মত কপাল করে আসিনি যে, শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক

লিখে রাখবো ! যতদূর মনে আছে লিখে যাই, হয়তো একদিনের কথা আর একদিনের বলে লিখে ফেলবো । আর কত ভুলে গেছি ।'

একজন ভক্ত—স্বামী ভূমানন্দ বলেছিলেন, মাস্টার মশায় তিন রকম evidenceএর (সাক্ষ্যর) কথা লিখেছেন, শরৎ মহারাজের লীলা প্রসঙ্গের অবমাননার জন্য ।

শ্রীম (আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়া) ও কি কথা ? সে কি জানে কি জন্য লেখা হয়েছে ? ওর কথা আমি ধরছি না । ও বলুক না । ওর কথা ও বলবে কে তাকে বাধা দিবে ।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—অন্য কোনও অবতারে এমনটি হয় নাই—world historyতে (জগতের ইতিহাসে) নেই ।*

---

* *Romain Rolland :* The Gospel of Sri Ramakrishna......is the faithful account by M. of the discourses with the Master......Their exactitude is almost stenographic......The book containing the conversations recalls at every turn the setting and the atmosphere. Thanks for having disseminated the radiance of the beautiful smile of your Master.

Aldous Huxley : This enormously detailed account of the daily life and conversations of Sri Ramakrishna......unique, so far as my knowledge goes, in the literature of hagiography......such wealth of intimate detail......set down with so minute a fidelity... its 'essence,' however......intensely mystical and therefore universal......most profound and subtle utterance about the nature of Ultimate Reality......so curious and delightful as a biographical document, so precious, at the same time, for what it teaches us of the life of the spirit.

Radhakrishnan, President of India : For very instructive details about the Life of Sri Ramakrishna we have to consult Sri M's writings. His account has been a mine of information about Sri Ramakrishna's Life and Teachings.

Christopher Isherwood : To be with Ramakrishna was to be in the presence of that *Now* (God). Not everybody that visited Dakshineswar (Ramakrishna) was aware of this. M. was aware, from the first......M. would have been overwhelmed, no doubt, if he could have known that Aldous Huxley would one day

স্বামী বিবেকানন্দ ধরেছিলেন। আমাকে লিখেছিলেন, 'The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public, untarnished by the writer's mind as you are doing.

[এর অর্থ এই, আপনার কথামৃতের রচনাভঙ্গী অপূর্ব ও একেবারে মৌলিক। জগতে ইতিপূর্বে কোনও জগৎপূজ্য মহামানব আচার্যের এরূপ জীবন চরিত লিখিত হয় নাই। লেখকের মনের আবিলতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহা সম্পূর্ণ নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক। আপনি অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন।]

অন্য বই যা বের হয়েছে, সেগুলি সেকেণ্ড ও থার্ডক্লাশ evidenceএ (সাক্ষ্যে) বের হওয়ায়, সেগুলি confused (সংশয়যুক্ত) হয়ে গেছে।

এই বই worldএর (জগতের) ফার্স্ট রেকর্ড এই ভাবের লেখার—একজন অবতারের বাণী ও জীবনচরিত সম্বন্ধে।

আর একটা বড় কাজ হয়েছে এই 'কথামৃত' বের হওয়ায়। ভবিষ্যতে যারা ডায়েরী বা বই লিখবে, এই তিন রকম evidenceএর কথা জানা থাকলে তাদের বড় উপকার হবে। কোনও মতে একটা কিছু লিখে তাতে নিজের মত ঢোকাতে সাবধান হবে।

---

compare him to Boswell and call his *Gospel* 'unique in the literature of hagiography.'......

The service M. has rendered us and future generations can hardly be exaggerated. Even the vainest of authors might well have been humbled, finding himself entrusted with such a task M. was the least vain.

M. embodies Ramakrishna's ideal of the householder devotee. He was a distinguished teacher and scholar, vested with authority and held in honour. Yet he thought of himself always as a servant and the least of men. The world could never win him, even with its love, and every one who met him loved him.

It is said that he would often take his bedroll at night and lie down to sleep in the open porch of a public building among the homeless boys of the city—to remind himself that, like the maid in Ramakrishna's parable, his real home was elsewhere.

Lawyersরা (উকীলরা), Scientistsরা (বিজ্ঞান-বিশারদগণ), আবার Westernersরা (প্রতীচির অধিবাসীগণ), ফার্স্ট ক্লাস evidence (সাক্ষ্য) দিয়ে 'কথামৃত' লেখায়, এই বইয়ের যথার্থ value (মূল্য) কি তা' বুঝতে পারবে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—পড়ুন তো ঐ pageটা (পৃষ্ঠাটা) যাতে এই তিন রকম evidenceএর (সাক্ষ্যের) কথা আছে।

অন্তেবাসী পড়িতেছেন—(মূলাংশ এইরূপ)

১ম Direct and recorded on the same day……এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ তারিখ বার তিথি সমেত।

২য় Direct but unrecorded at the time of the Master……এই জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারে প্রায় এইরূপই হইয়াছে।……লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় Hearsay and unrecorded at the time of the Master……ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন কালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন।……

শ্রীম—আমরা এসব বই (কথামৃত) লিখেছি কত দেখে শুনে। Law of Evidence (সাক্ষ্য বিধি) আমায় পড়তে হয়েছে। ওরা তো তা' জানে না। একটু ভুল যদি বের হয় evidenceএ (সাক্ষ্যে), তা' হলে সবটার value (মূল্য) কমে যায়।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—আপনারা পড়েন নাই Law of Evidence, Criminal Procedure Code (সাক্ষ্যবিধি, ফৌজদারী দণ্ডবিধি) ?

অন্তেবাসী—আজ্ঞে হাঁ, পড়েছি কলেজে যেমন পড়া হয় তেমনি। মোটামুটি পড়া আছে।

শ্রীম—দেখেছেন তো ওতে। সাক্ষীর একটা ভুল বের করতে পারলে সেই caseটা (মোকদ্দমাটা) প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। উকীল বলেন জজকে, "My Lord, he is not reliable" (মহামান্য মহোদয় এই সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য নয়)।

Direct evidence এর যে force (প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের যে শক্তি) অপরের কাছে শোনা কথার সেই শক্তি থাকে না। তাইতো জজ জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজে দেখেছ? নিজে দেখলে, বা শুনলে জোর হয় বেশী। আর যদি বলে, 'শুনেছি' তা' হলে তত জোর হয় না।

আমরা কত কোর্টে যেতাম। এই সব দেখে শুনে তো হয়েছে এ সব। (সহাস্যে) ডব্লিউ, সি, বনার্জী একবার বলেছিলেন, 'My Lord, he is an English-speaking witness' (মহামান্য মহোদয়, এই সাক্ষী ইংরাজীতে কথা কন)। তাদের বড় আদর। তারা বড় reliable (বিশ্বাসযোগ্য)। কেন না, translatorএর (অনুবাদকের) হাতে গেলেই একটু অন্য রকম হয়ে পড়ে, ঠিক ঠিক হয় না।

২

মোহন—আজ (বেলুড়) মঠে যাজ্ঞবল্ক্য অভিনয় হবে। সাধুরা নিজেরাই করবেন। কিন্তু অনঙ্গ মহারাজ বারণ করে দিয়েছেন যেতে।

শ্রীম (সহাস্যে)—এই যে আমাদের একটি নূতন ফ্রেণ্ড আসেন, হোমিওপ্যাথি পড়ছেন, কি নাম?

মোহন—উপাধ্যায়।

শ্রীম—উনি বেশ করেছিলেন। কার সঙ্গে দেখা করবেন তাই গেছেন। একজন বলছে, না, দেখা হবে না। উনি বললেন, না, আপনার কথা তো শুনবো না। ওঁর একজন বড় শিষ্য আমায় বলে দিয়েছেন দেখা করে যেতে। আপনার কথা শুনবো কেন? আহা, বেশ সরল লোকটি। বললেন, আপনার কথা শুনবো কেন (হাস্য)?

ঠাকুরকে কালী-ঘরে ঢুকতে দিবে না দারোয়ান। ঠাকুর এক ঘুষি

মেরে ঢুকে গেলেন। খাতাঞ্চি লিখলো বাবুদের, ছোট ভট্চাযমশায় কথা শোনেন না। মথুরবাবু বলে পাঠালেন, 'ওঁকে কেউ কিছু বলো না'। এক ঘুষি মেরে ঢুকে পড়লেন (হাস্য)।

শ্রীম (জনৈকের প্রতি)—মঠে রাত্রিতে লোক থাকলে ওঁরা খুব ভাবিত হন। এখন আবার বর্ষাকাল। তাই এমন বলেন। যারা চলে আসবে তাদের কোনও আপত্তি হয়তো হবে না।

একজন ভক্ত—ওঁদের দেখলে ভয় হয়, critical look (সমালোচকের দৃষ্টি)। আমাদের সম্বন্ধে কোনও কিছু ভাব পোষণ করেন।

শ্রীম—পাছে আবার কি সব কথা বলেন।

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ। ওঁদের দেখে যখন মনে এমন ভাবনা হয়, নিশ্চয়ই ওঁরা আমাদের সম্বন্ধে কোনও কিছু ভাব পোষণ করেন।

শ্রীম—এ সব তো হলো। কিন্তু যো সো করে নিজের কার্য উদ্ধার করা চাই। জগতে কি আর সব এক রকম হয় ? অপরের দোষ না দেখে নিজের কাজ করা এটি হল আসল কথা। কুল খেতে গেলে কাঁটার ঘা লাগতে পারে। এ সব ভেবে চিন্তে জগতে চলতে হয়। অপরের দোষ দেখতে নেই। আর ঠাকুরকে প্রার্থনা করা, আমায় সৎসঙ্গ করিয়ে দাও। সমুদ্র শান্ত হবে না। এর মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে। ব্যাকুলতা থাকলে ঠাকুরই সব পথ সোজা করে দেন।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন বিছানায় পশ্চিমাস্য। ধ্যান করিতেছেন। গৃহ অর্গলবদ্ধ। ভক্তগণ ছাদে বসা। কেহ কেহ পাশের ঘরে বসিয়া শ্রীমর প্রশান্ত ধ্যানস্পর্শ উপভোগ করিতেছেন, নীরবে। অনেকক্ষণ ধ্যানের পর তিনি গান গাহিতেছেন। কি মধুর স্বরমাধুরী—যেন প্রাণ গলিয়া বাহির হইতেছে।

গান। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা মা।

গান। তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।

গান। শংকর শিব শংকর।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি।

গান। কে জানে কালী কেমন, ষড়-দর্শনে না পায় দরশন ॥

তারপর অনেকগুলি ঈশ্বরীয় নাম গুনগুন করিয়া গাহিলেন। 'শিবশংকর ভোলা' 'সচ্চিদানন্দ শিব', 'আত্মারাম শিব'। এবার ছাদে ভক্ত-মজলিশে আসিলেন। শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। শ্রীমর সম্মুখে ও দক্ষিণে বামে ভক্তগণ বসা বেঞ্চেতে। শ্রীমর ডান হাতে দুই সারি বেঞ্চ রহিয়াছে উত্তর দক্ষিণ লম্বমান। সম্মুখে এক সারি। বাম হাতে জোড়া বেঞ্চ। তাহাও উত্তর দক্ষিণ লম্বমান। শ্রীমর ডান হাতের দ্বিতীয় সারিতে বসিয়াছেন, দক্ষিণ হইতে মনোরঞ্জন, জগবন্ধু, দুর্গাপদ মিত্র ও বলাই। সম্মুখের সারির পশ্চিম থেকে বসা শান্তি, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ছোট অমূল্য ও অন্য একজন ভক্ত। শ্রীমর বাম হাতের জোড়া বেঞ্চেতে বসিয়াছেন দক্ষিণ দিক হইতে ছোট জিতেন, বড় অমূল্য ও বড় জিতেন।

শ্রীম একটু পরই ঘরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তেবাসীও ঘরে গেলেন। ডাক্তারও তারপর আসিলেন। অন্তেবাসীর হাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ দিয়া উভয়ে পাশের ঘরের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছেন। তখন ডাক্তার শ্রীমর সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন। ড্রাইভার বারণ সত্বেও মোটর চালাইয়া উহার ক্ষতি করিয়াছে। সংস্কার করাইতে এক হাজার টাকা লাগিয়াছে।

ডাক্তার—আজ্ঞে, উকীল এই চিঠি ড্রাফ্‌ট্ করেছেন।

শ্রীম—পড়ুন তো শুনি।

শ্রীম (পাঠান্তে)—Neglect of duty intentionally (স্বেচ্ছায় কর্তব্যে অবহেলা) এ সব কথা খাটবে না। এই রকম করে দিলে হয়তো কাজ হতে পারে—'তুমি কেন persue (অনুসরণ) করলে না? আর আমি যাতে offenderকে (অপরাধীকে) ধরতে পারি তার কোনও উপায় রাখলে না?'

আজ বেলুড় মঠে সাধুরা যাজ্ঞবল্ক্য অভিনয় করিতেছেন। তাই শ্রীম বলিলেন, আমাদের এখানেও পাঠ হউক। আপনারা সকলে শুনুন। বড় অমূল্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে তিনটি ব্রাহ্মণ পাঠ করিলেন—জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ ও জনক-সভা। এবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (আকাশ দেখাইয়া আনন্দে)—এই আমাদের 'ড্রপ সিন্' (হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি গম্ভীর ভাবে)—কি পড়া হলো কিছুই বুঝতে পারলুম না। দুই একটি কথা মাত্র বোঝা গেল। একটি কথা 'মৃত্যু' আর একটি 'অমৃত'। এখন বুঝুন ঠাকুর কি জিনিস দিয়ে গেছেন সহজ সরল কথায়।

রাত্রি নয়টা, ভক্তগণ অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন বসিয়া আছেন—বড় জিতেন, দুর্গাপদ, ছোট জিতেন, বলাই ও জগবন্ধু। পূর্ব কথারই অনুবৃত্তি চলিতেছে।

দুর্গাপদ (হিলিংবাম)—কথামৃত যাঁরা পড়েছে তাদের এসব ভাল লাগবে না। কি জন্য এসব পড়বে? কিছু বোঝা যায় না। আমি সমস্ত উপনিষদ্ একবার পড়েছি।

শ্রীম—না, পড়তে হয়। তবে ওতে (কথামৃতে) আরও শ্রদ্ধা হবে। দেখা না হলে মনে হয় কিনা উপনিষদে না জানি কি আছে। পড়লে বুঝতে পারবে, অনেক চেষ্টার পর একটু একটু সার পাওয়া যাচ্ছে। আর ঠাকুরের কথায় সবই সার।

দুর্গাপদ—এসব উপনিষদ্ পড়ে দেখা গেছে এতে কিছুই বেশী নাই। বরং ঠাকুর যা সোজা করে বলে গেছেন তার সমানও নাই। আজকাল উপনিষদ্ পড়ে লোকে নেয়, আগে ষাঁড় খাওয়া হতো (পুত্র মন্থ যজ্ঞে) এইসব কথা।

শ্রীম—সকলেই কি একভাবে নেবে? Antiquirian (প্রত্ন-তত্ত্ব বিশারদ) এক ভাবে নেবে। Historian, Philosopher, (ঐতিহাসিক, দার্শনিক) এক একজন এক এক ভাবে নেবে।

ঠাকুর একটি গল্প বলতেন, এক জায়গায় মেলা হচ্ছে। অনেক দেব দেবীর মূর্তি আছে। যে যেমন votary (উপাসক) সে তেমন ছবিটিই দেখছে। এক জায়গায় আছে একটি স্ত্রীলোক। সে নাংকে ঝাঁটা মারছে। একজনের ঐটিই ভাল লেগেছে। সে ঐখানে দাঁড়িয়ে যত সব লোককে ডেকে এনে দেখাতে লাগলো, আয় রে আয়, এই

দেখ কেমন মজা (সকলের হাস্য)। যার যেমন ভাব সে ভাবেই সব দেখে।

দুর্গাপদ—আচ্ছা, এসব (উপনিষদাদি) অত শক্ত, লোকে বুঝতো কি করে ?

শ্রীম—তার জন্যই তো কর্মকাণ্ডে দেশ ছেয়ে গিছলো। এই জন্যই অবতার এক একবার আসেন। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন, তিনি গীতা বলে সমস্ত বেদ উপনিষদের সার এক স্থানে দিয়ে গেলেন। কর্মের সার কি তা' বলে গেলেন। ঈশ্বরই যুগে যুগে এসে সর্বশাস্ত্রের মর্ম কথা উদঘাটন করে দিয়ে যান। এইবার ঠাকুর এসে ঐ কার্যটি করে গেলেন 'কথামৃত' মুখে।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি)—আপনি কি আজকাল মঠে গিছলেন ? তুলসী মহারাজ এসেছেন দেখা হয় নাই ?

দুর্গাপদ—আজ্ঞে না, আর যাওয়া হয় নাই। ঐদিন যা কথাবার্তা মঠে হয়েছিল।

শ্রীম পূর্বেই ভক্তদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন দুর্গাবাবু সেদিন সাধু ভক্তদের সভায় বেলুড় মঠে তুলসী মহারাজের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত আছেন। আজ দুর্গাবাবু নিজ মুখেও ঐ কথা বলিলেন। তিনি ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সাবধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি)—মঠে যেতে হয় দীন হীন ভাবে। সাধুদের সঙ্গে যুক্তি তর্ক করতে নেই। ওঁদের কেবল জিজ্ঞাসা করতে হয়, কিসে ভগবানকে পাওয়া যায়, এই এক কথা।

দুর্গাপদ—একজন জিজ্ঞাসা করেছিল এই কথা। তুলসী মহারাজ উত্তর করলেন, আমার কি ভগবানদর্শন হয়েছে যে বলব, কি করে তাঁকে পাওয়া যায় ?

শ্রীম—ওঁরা আবার সব কথা সকলকে বলেন না। একা একা জিজ্ঞাসা করলে, কৃপা করে বলতে পারেন।

দুর্গাপদ—ঠাকুর বলেছেন, যত মত তত পথ—all religions

are true—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, Fetishism religion (পাথরপূজা ধর্ম) কিনা, আর true (সত্য) কিনা, যেমন সাঁওতালদের নুড়িপূজা।

এরা নুড়িপূজা করে শস্য ভাল হবে, পশুরা ভাল থাকবে বলে। এতে ঈশ্বরের কোনও conception (ধারণা) নেই। যে religionএ (ধর্ম) ঈশ্বর নেই সেইটাও true (সত্য) কি?

শ্রীম—তা' কেমন করে হয়? সকাম পূজা করলেও একটি ঈশ্বর চাই। তা' না হলে কি করে religion (ধর্ম) হয়?

দুর্গাপদ—তিনি তা' স্বীকার করলেন না।

মোহন—ম্যাক্সমুলার কিন্তু বলেছেন, নুড়ি পূজা যারা করে তারাও একটি superior beingকে (উত্তম পুরুষকে) মানে। তিনি বর্ষা শস্য শিকার আদি দেন। তিনি আরও বলেন, এইরূপ একজনকে মানা মানুষের একটা necessity (প্রয়োজন)।

দুর্গাপদ—উত্তম পুরুষকে যে মানে তার প্রমাণ কি?

মোহন—মানে না যে তারই বা কি প্রমাণ? ম্যাক্সমুলার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁর রিপোর্টারদের উক্তি থেকে। এঁরা ওদের সঙ্গে থেকে বুঝেছেন, সাঁওতালরাও একজন superior being (উত্তম পুরুষ) মানে, মুখে না বললেও। তাই ঐ কথা বলেছেন, এইরূপ মানা একটা প্রয়োজন।

শ্রীম—যদি একজন শক্তিমান পুরুষকে মানে তা' হলেই তো ধর্ম হলো, মুখে না বললেই বা, অন্তরে থাকলেও হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, শিশু বাপকে ডাকতে পারছেনা বাবা বলে। তার ভিতরও বাপের জন্য ভালবাসা আছে। কেবল করতে পারছে না। ভাব আছে ভাষা নেই।

শ্রীম—কাঁকুড়গাছী সুরেশবাবুর বাগানে ঠাকুর গিছলেন। প্রতাপ মজুমদারকে সংবাদ দিয়ে আনিয়েছিলেন। তখন তিনি ওয়েস্ট থেকে ফিরেছেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওদেশের ওদের কেমন দেখলে? প্রতাপ মজুমদার উত্তর করলেন, ওরা নাস্তিক। ওরা

একটা শক্তি মানে। শুনে, ঠাকুর বললেন, তবে নাস্তিক নয়। যারা সায়েন্স নিয়ে আছে তারা যদি একটা superior (উচ্চ) শক্তি মানে কি করে নাস্তিক হবে ? শক্তির কাজ ও অস্তিত্ব স্বীকার করলে নাস্তিক বলা চলে না। ঐ শক্তির বিশেষ পরিচয় জানে না—undeveloped, এই তফাৎ।

মোহন—ওদেশের বৈজ্ঞানিকদের ভিতর কেহ কেহ ঐ শক্তিটাকে 'unknown X' (অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত পদার্থ) বলে। সেটি সর্বশক্তিমান। কিন্তু মানুষ তাকে ধরতে পারবে না। ঐ শক্তিটি, বুদ্ধি আদিতে লোকের আদর্শ। ধরতে পারবে না বটে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য সে শক্তির parallel (সমান্তরাল) চলবে—যেমন দু'টি রেল লাইন। কিন্তু কখনও ধরতে পারবে না। মানুষ ক্ষুদ্র, ঐ শক্তি বৃহৎ। একে বলেন ওঁরা Philosophy of infinite progress (অনন্ত উন্নতি দর্শন)। যদি মানুষ তাঁকে আদর্শ না করে আর তাঁর সমান্তরাল না চলে তবে সমাজ নিম্নগামী হয়ে পড়বে। এটা অবশ্য প্রয়োজন। কুয়েণ্টাম থিওরির আবিষ্কর্তা জার্মানীর ম্যাক্স প্লাঙ্ক এই দলের একজন প্রধান পুরোহিত।

দুর্গাপদ—এঁদের এ মতকে তো ধর্ম বলা চলে না—এঁরা যদিও এই শক্তির অস্তিত্ব ও প্রয়োজন মানেন। এঁরা চেষ্টা মানছেন, কৃপা মানেন না। তুলসী মহারাজ কৃপা স্বীকার করেন না।

মোহন—শংকর, "যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' এই মন্ত্রে তো বলছেন, যে সাধক তাঁকে লাভ করতে দৃঢ়সংকল্প তিনিই লাভ করবেন, তাঁর নিকট আত্মা প্রকাশিত করবেন নিজেকে। এখানেও তো কৃপা নাই, চেষ্টাই রয়েছে।

শ্রীম—আমরা কিন্তু ঠাকুরের মুখে শুনেছি কৃপা বই উপায় নেই। হাঁ, এও শুনেছি, যদি তাঁকে লাভ করার প্রবল ইচ্ছা থাকে, মরণপণ চেষ্টা থাকে, তবে তাঁর কৃপা হতে পারে। বলেছিলেন, এই চেষ্টাও তাঁর দান, তাঁর কৃপা। চেষ্টা ও কৃপা একই বস্তু—প্রকার ভেদে। চেষ্টাই কৃপায় রূপান্তরিত হয় শেষে। চেষ্টার শেষ কৃপা।

এই সব বিচার শ্রীমর ভাল লাগিতেছে না। ভক্তরা সাধুদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। বলেন, এতে পিছে পড়ে যায় লোক।

শ্রীম—সাধুসঙ্গ ছাড়া উপায় নাই আমাদের। ঠাকুরের কথার আদি মধ্য অন্ত ঐ এক কথা—সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ করতে হয়। তাঁদের কাছে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেতে হয়। আগে থেকেই প্রার্থনা করতে হয়—তর্ক ফর্ক করবো না। দর্শন করবো, প্রণাম করবো, সেবা করবো। তাঁদের দেখলেই আমাদের চৈতন্য হয়—কিনা, এঁরা সর্বস্ব ছেড়ে তাঁর জন্য পথে দাঁড়িয়েছেন। আর আমরা সংসারে পড়ে আছি। অনেকগুলি ফ্রেণ্ডস্ আগে মঠে যেতেন নিত্য সকালে তাঁদের দর্শন ও প্রণাম করতে। এখন আর যাচ্ছে না বুঝি।

দুর্গাপদ—কোথায় যাবে?

শ্রীম—কেন সাধুদর্শনে।

দুর্গাপদ—কোনও fascination (আকর্ষণ) নেই।

একজন ভক্ত—Personality (আকর্ষণকারী ব্যক্তি) নেই, কোথায় যাবে? এসব কথা যা তাঁরা বলেন, এসব তো পুঁথি পুস্তকেই রয়েছে। তা' হলেও personality (সিদ্ধ পুরুষ) চায় লোক।

শ্রীম—তা' মহাপুরুষদের স্থান বলে যেতে হয়। স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, এঁদের সব স্থান। এখনও তারক মহারাজ রয়েছেন।

দুর্গাপদ—তা' হলে দক্ষিণেশ্বরই ভাল। ঠাকুরের স্থান। ত্রিশ বছর লীলা করেছেন ওখানে।

শ্রীম—না। ও তো আছেই। এ-ও (মঠ) একটি স্থান। তাঁর কথা মূর্তি নিয়ে এখানে রয়েছে। ঠাকুর বলেছিলেন, সব ছেড়ে তাঁকে ডাকতে হয়। এখানে সব তাই করছেন। সর্বত্যাগের মূর্তি সাধুরা। তাঁদের দেখতে হয়। তা' না হলে দূরে পড়ে যায়। মঠের সাধুরা কি নিজের ইচ্ছায় ওখানে আছেন? ঠাকুরই এঁদের সব

ছাড়িয়ে এনেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য—যারা গৃহে আছে। মঠে যাওয়া উচিত।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ
২৩শে ভাদ্র ১৩৩১ সাল। সোমবার, শুক্লা দশমী ৩৭ দণ্ড : ৩ পল

পঞ্চদশ অধ্যায়

তোমাকে ভাগবত শোনাতে হবে

১

শ্রীম জগবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চানন ঘোষের লেনে প্রবেশ করিতেছেন। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। আজ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, শুক্লা একাদশী ৩১ দণ্ড। ৪৮ পল।

শ্রীম পার্শিবাগান যাইবেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিতে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় অসুস্থ, জীবন সঙ্কটাপন্ন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও শ্রীগুরুর, 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মহামন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক। এলাহাবাদে 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাব' স্থানান্তরিত হইলে শরৎচন্দ্র ইহার প্রধান সংরক্ষক হন। আর 'গুরুবৎ গুরুকার্যেষু' শ্রদ্ধাবান হইয়া তাহার সেবা করিয়া উহাকে সজীব করিয়া তোলেন। এই ক্লাবটি স্বামী বিবেকানন্দের আজ্ঞায় প্রথমে মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। কর্মে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পার্শিবাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাবিধ লোকহিতকর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্ম পরিবারের প্রিয়জন শরৎচন্দ্র ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া ইষ্ট ও গুরুর চিরসুখানন্দময় অভয়পদে আশ্রয় লইবেন সকলেই ইহাই অনুমান করিতেছেন।

শ্রীম শরৎচন্দ্রের অসুখে বিচলিত হইয়াছেন। তাই নিত্য সেবকদের পাঠাইয়া সংবাদ লইতেছেন। আজ নিজেই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন। শ্রীম সায়েন্স কলেজের সম্মুখ দিয়া চলিতেছেন দক্ষিণ দিকে। এর পরই শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি। শ্রীম সমিতি-গৃহে প্রবেশ করিলে শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর কুমারব্রতী সত্যেশ তাঁহাকে আবাহন ও প্রণাম করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র শয্যায় শায়িত। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম নিজের হাতে সস্নেহে শরৎচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত লইয়া, সত্যেশের নিকট অসুখের নানা সংবাদ লইতেছেন। অসুখ মারাত্মক। এ যাত্রায় রক্ষা হইবে না। শ্রীম আধঘণ্টা ধরিয়া স্নেহস্পর্শে শরৎচন্দ্রকে উদ্দীপিত করিয়া নির্বাক গম্ভীরভাবে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। চক্ষু ছল ছল। অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, ঠাকুর ও স্বামীজীর অবতারলীলা প্রকাশের একটি সুদৃঢ় একনিষ্ঠ স্তম্ভ। সারাটা জীবনই সেবা ও প্রচার করিতেছেন। সারাটা জীবনই গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। সায়েন্স কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সত্যেশচন্দ্র ও অপর ভক্তদের বিদায় দিলেন।

সন্ধ্যা সাতটা। মর্টন স্কুলের ছাদে ভক্তসঙ্গে শ্রীম বসিয়া আছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, আপনারা কেউ কেউ যান ভূতানন্দ উৎসবে। নিমন্ত্রণ এসেছে।

বিনয়, জগবন্ধু ও ছোট অমূল্য রওনা হইলেন। 'হিলিংবামের' সত্ত্বাধিকারীর বাড়ীতে প্রতি বৎসর উৎসব হয় ভূতানন্দজীর। হিলিংবামের ম্যানেজার দুর্গাপদ মিত্র মর্টন স্কুলের ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। খুব ফুলের সাজ ও বৈদ্যুতিক আলোতে গৃহ শোভিত। একস্থানে প্রচুর পাউডার ছড়াইয়া রাখিয়াছে। উহাতে নাকি পায়ের ছাপ পড়ে। মনোরঞ্জন ও বলাই ইতিপূর্বেই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। পরিতোষপূর্বক ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াইলেন বাড়ীর লোক। ভক্তরা দশটায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমর জন্য প্রসাদ দিয়াছেন দুর্গাপদ মিত্র। খুব গুরুভক্তি বাড়ীর মালিকদের। প্রতি বৎসর এই উৎসব করেন।

পরদিন সকাল আটটার সময় শ্রীম কথামৃত পঞ্চমভাগের পরিশিষ্ট ধ্যানস্থ হইয়া বলিতেছেন আর জগবন্ধু লিখিতেছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে বিছানায় উপবিষ্ট দক্ষিণাস্য আর জগবন্ধু সম্মুখে বেঞ্চে বসা। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' নামক প্রবন্ধের চতুর্থ স্তবক শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, ঠাকুরের মুখে স্বামীজী শুনেছিলেন, তাই তাঁর অনুপম ভাষা ও ভঙ্গীতে জগতের সামনে ধরে দিয়েছেন। অপরের মুখে এ কথা শুনলে লোক তত আগ্রহে নেবে না। স্বামীজী যে কৃতী! তাঁর মুখে শুনলে এর ফল হয় সহস্র গুণ—হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন তিনি। আমেরিকার ভক্তরা (ফক্স সিস্টাররা) এখানে এসে বলেছিলেন, স্বামীজীর কথা শুনতে আমরা যেতাম না। তাঁকে ভাল লাগতো তাই যেতাম। আর তাঁর তুষারধবল নির্মল চরিত্রে আমরা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আর বলেছিলেন, তাঁর কথার ভিতর এমন একটা শক্তি ছিল, যা আমাদের মনকে সবলে আকৃষ্ট করে এক দৈবী আনন্দময় ভূমিতে উঠিয়ে দিত।

অন্তেবাসী—এই শক্তিটা কি অবতারের, ঠাকুরের দেওয়া শক্তি?

শ্রীম—তাঁরই শক্তি। অবতারের শক্তিতেই ধর্মপ্রচার হয়। তাই ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন। এবার ঠাকুর অবতার। তিনি বলেছিলেন, এটা (নিজের শরীর) দিয়ে রজের কাজ হবে না। একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব কিনা তাই। ওটা (নরেন্দ্রের শরীর) দিয়ে মা তাঁর কাজ করাবেন। তাইতো স্বামীজীর ওয়েস্টে গমন। স্বামীজী ইচ্ছা করেছিলেন শুকদেবের মত সমাধিস্থ হয়ে থাকবেন। ঠাকুর বললেন, মায়ের কাজ কর। এও দিবেন, তার উপরের অবস্থাও দিবেন। আমেরিকা থেকে ফিরে বলরামবাবুর বাড়ীতে আমাদের বলেছিলেন, একেবারে কাঁদ-কাঁদ হয়ে। বলেছিলেন, আমার তো ইচ্ছাই ছিল গান গেয়ে কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা' হলো কৈ, এই ক'টা বছর বাঁদরের নাকে রশি দিয়ে যেমন নাচায়, তেমনি তিনি নাচিয়েছেন। আমার ইচ্ছা ছিল Himalayan silenceএ (হিমালয়ের নির্জন বক্ষে) একটি আশ্রম হবে, ভাল লাইব্রেরী হবে। সেখানে ধ্যান করবো, পড়বো

আর গান গেয়ে কাটিয়ে দেব সময়। তা' আর হতে দিলেন কই।

আশ্রম তো হয়েছে মায়াবতীতে কিন্তু স্বামীজী আর নাই।

অন্য ভক্তদেরও দশা এই। একজনকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন তোমায় মার (অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া) এইটুকু কাজ করতে হবে। একরকম আহারনিদ্রা ছেড়ে দিয়ে পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ চলেছে। কিন্তু অবসর দিচ্ছেন না। এই ভক্তটিকেই বলেছিলেন, মা আমায় বলেছেন, তোমাকে ভাগবত শোনাতে হবে। ভাগবতের পণ্ডিতকে মা একটা বন্ধন দিয়ে ঘরে রেখে দেন। এই ভক্তটি সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করলে ধমক দিয়ে বললেন, মা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন। অবতারের শক্তিতেই ধর্ম প্রচার হয়—কেবল বিদ্যা বুদ্ধি বক্তৃতায় নয়। এ সবের প্রভাব দু'দিন থাকে। আর ঐ শক্তির প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ঐ ভক্তটিকে মাকে বলে এক কলা শক্তি দিয়েছিলেন।

অবতারলীলা বিচিত্র। ব্রহ্মা ইন্দ্র এঁদের বুদ্ধির অগোচর। ব্রহ্মাও চিনতে পারেন নাই অবতারকে—শ্রীকৃষ্ণকে। গোবৎস চুরির পর অনেক তপস্যা করে তবে চিনতে পেরেছিলেন যে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দই শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। কিন্তু ব্রজের গোপগোপীরা চিনতে পেরেছিলেন তাঁর কৃপায়। কেবল ভালবেসে এই সকল গোপগোপী তাঁকে জেনেছিলেন গ্রাম্য অশিক্ষিত অসংস্কৃত হয়েও। তাইতো কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, 'গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য।' যাও উদ্ধব, তাঁদের সংবাদ নিয়ে এসো। তাঁদের ভালবাসার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না, তাঁরা নিজে ঋণমুক্ত না করলে। যখন আমার কোনও ঐশ্বর্য ছিল না, তখন তাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ভালবেসেছেন পতিপুত্রকন্যা ধনজন সকল সমাজবন্ধন ছিন্ন করে।

অন্তেবাসী—অনেক সময় কথার ভিতর সংসার থেকে যায়। সে অবস্থায় কথা বলা উচিত কি ?

শ্রীম—না, যেখানে সন্দেহ হয়, সেখানে আগে verify (পরীক্ষা) করতে হয়। তারপর বলতে হয়। কথায় যদি একটু ভুল হয় তবে

মূল্য কমে যায়। পড়েন নাই Law of Evidenceএ (সাক্ষ্য বিধিতে), একটা ভুল বের হলে সমস্ত সাক্ষ্যটা বাতিল হয়ে যায়? তাই কথা বলা বড় শক্ত। ভক্তরা (শ্রীম) যে কথা বলেন, ঠাকুর কণ্ঠে বসে তিনি নিজে বলান। তা' নইলে হয় না ধর্মপ্রচার। ঠাকুর বলেছিলেন, 'শালা বলে কি? যিনি রসস্বরূপ তাঁকে কিনা বলছে নীরস।' হেসে বলতেন, 'এ কেমন? না, একজন বলেছিল আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া, যেমন।' ধর্মকথা তাঁর আদেশ হলেই বলা যায় আর তাতে কাজ হয়। লোকে শোনে। এই শক্তিটি কেবল অবতারে আছে।

অন্তেবাসী—ভাগবতের অবতারলীলার ব্যাখ্যা বড় সুন্দর। ঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলে। ইন্দ্র, ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারেন নাই প্রথমে। তপস্যার পর চিনেছিলেন। ঠাকুরও বলেছিলেন, 'অচেনা গাছ' 'বাউলের দল'। আবার চৈতন্যদেবের গানে বলেছিলেন, নিজের সম্বন্ধে—"ও তোরা তাঁরে (চৈতন্যদেবকে) চিনলি না রে। সে যে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে॥"

শ্রীম—কি করে লোক চিনবে বল? যোগমায়াকে আশ্রয় করে অবতার লীলা হয়। তিনি সব ভেলকি লাগিয়ে দেন। মা পরদা তুলে ধরলে তবে চেনা যায়। দেখ না ঠাকুরকেই—মন্দিরের পূজারী; ছ' টাকা তাঁর বেতন, দরিদ্র! ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। আবার ল্যাংটা হয়ে বেড়াচ্ছেন। কখন একটা ল্যাজ বেঁধে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছেন। আবার কাঁধে একটা বাঁশ। আবার পূজার সময় নিজের মাথায়ই সব ফুল ঢেলে দিলেন। বিড়ালকে ভোগের লুচি খাওয়ালেন। এদিকে দেখ, তাঁর কৃপাতে নড়েভোলা সব লোক জগদ্‌গুরু। তিনি চিনেছিলেন ভক্তদের। আর তিনি চিনিয়েছিলেন নিজেকে ভক্তদের কাছে। কাজেই প্রকাশ পায় যে তিনি অবতার। কোথায় ঐ দরিদ্র পূজারী, আর কোথায় আজ তাঁর জগৎ জুড়ে পূজা!

অন্তেবাসী—দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন। রামকে তাঁরা অবতার বলে চিনলেন না। এতে কি তাঁদের মুক্তির কোন বাধা হলো?

শ্রীম—তা' কেন হবে ? তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধিবান। তাতেই তাঁর মুক্তি হয়ে গেল। অবতার বলে চেনার পর ভগবানের অবতার-লীলার মাধুর্যরস, প্রেমরসও আস্বাদন করলেন। একজন ঋষিদের উপর আক্ষেপ করেছিল, রামকে চিনেন নাই বলে। ঠাকুর তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, ও কথা বলো না, যার যা পেটে সয়। তিনি protest (আপত্তি) করলেন। তা' না হলে যে একঘেয়ে হয়ে যাবে। তবে কারু-কারুকে তাঁর সাকার নিরাকার, দু'-ই দেখান। নরেন্দ্রকে নিরাকার দেখালেন প্রথমে। তারপর তাঁকে সাকার রূপ দেখালেন। সে যেদিন মায়ের সাকার রূপ মানলো সেই দিন খুব খুশি হয়ে ভক্তদের বলেছিলেন, নরেন মাকে মেনেছে। কিন্তু অবতাররূপে ঠাকুরকে দেরীতে বুঝেছিলেন।

আমরা বলেছিলাম, একাধারে দু'টি হয় না কি, জ্ঞানও ভক্তি ? ঠাকুর উত্তর করলেন, হবে না কেন ? একই আকাশে চন্দ্র সূর্য দেখা যায়। প্রহ্লাদের নাম করলেন। তাঁর দু'টিই ছিল। তাঁর কৃপায় আমাদেরও এইটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান, আবার ভক্তিও ছিল। যাদের বড় 'ঘর' তাদেরই এই দুটো হয়। ঠাকুরের ভক্তদের (শ্রীমকে) তিনি এই দু'টোই দেখিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই।

অন্তেবাসী—অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

যদি এটি সত্য হয়, তবে তো মনে হয় ঋষিরাও 'মূঢ়া'র ভিতর পড়েন, যাঁরা কেবল নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক।

শ্রীম—রামকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন নাই। রামকে তাঁরা জ্ঞানী বলে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্মান করেছিলেন। এখানে সাধারণ অজ্ঞানী লোকদের কথা বলা হয়েছে। ঋষিদের কথা আসে না। ঋষিরা রামকে বলেছিলেন, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলেন। কিন্তু আমরা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। তোমাকে আমরা জ্ঞানী বলে জানি। জ্ঞানীরা অবতার মানে না কি না ! ঈশ্বরকে তো মানছেন, তবেই 'মূঢ়া' বলা চলে না। নরেন্দ্র কি অবমাননা করলেন

ঠাকুরকে যখন বললেন, 'গিরিশ ঘোষ বলুক, আমি যতক্ষণ না বুঝবো অবতার বলে নোবো না।' জ্ঞানী বলে তো নিয়েছিলেন, গুরু বলেও নিয়েছিলেন! স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞানের উপাসক, সপ্ত ঋষির এক ঋষি—ঠাকুর বলতেন। ঠাকুরের কৃপায় যখন অবতার বলে বুঝলেন তখন দেখ কি সব স্তবস্তুতি আরতি লিখলেন। শাস্ত্রে অমন দেখা যায় না।

২

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম একা বাহির হইলেন। আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে বেড়াইতেছেন।

সাড়ে পাঁচটার সময় স্বামী কমলেশ্বরানন্দ আসিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ব্রাঞ্চ, ভবানীপুরস্থিত গদাধর আশ্রমের মহন্ত। শ্রীমকে খুব ভালবাসেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইয়া গিয়া গদাধর আশ্রমে রাখেন।

অন্তেবাসী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমর সন্ধানে রাস্তায় বাহির হইলেন। মেছুয়াবাজার ক্রসিংএর নিকট শ্রীমর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিলেন।

মর্টন স্কুলের অঙ্গনে শ্রীম বসিলেন বেঞ্চেতে রাস্তার দিকে মুখ করিয়া। শ্রীমর ডান হাতে ও বামে দুইখানা বেঞ্চে। ডান হাতের বেঞ্চেতে বসা স্বামী কমলেশ্বরানন্দ। আর বাম হাতের বেঞ্চেতে বসা অন্তেবাসী।

মর্টন স্কুলের একটি ছাত্র, সুধীর চাটার্জী, একটি পুস্তক ফেরৎ দিতে আসিয়াছে। সে ফুটপাথ হইতে চুপি দিতেছে দেখিয়া একটি যুবক শিক্ষক তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিলেন। ভিতরে আসিলে তাহার কানে কানে প্রণাম করিতে বলিলেন। ছেলেটি একে একে সকলকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। শ্রীম প্রসন্ন চিত্তে ছেলেটিকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বা, সুন্দর। খুব ভক্ত তো! সাধুদের প্রণাম করলে ভাল, পরমহংসদেব বলেছিলেন কেশব সেনকে। কি ভাল বল তো? ছেলেটি উত্তর করলো, ঈশ্বরে ভক্তি হয়। শ্রীম বললেন, বা, তুমি তো বেশ বুঝেছ!

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই এক ফোঁটা জল পড়িতেছে। এখন প্রায় ছয়টা। সকলে উঠিয়া গিয়া দোতলার বারান্দায় বসিলেন পূর্ব ধারে। সন্ন্যাসী বসিলেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য! তাঁহার ডান হাতের জোড়া বেঞ্চেতে বসিয়াছেন শ্রীম। শ্রীমর সম্মুখে অপর জোড়া বেঞ্চেতে বসা জগবন্ধু ও অপর ভক্ত কেহ কেহ। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (সন্ন্যাসীর প্রতি)—তোমার ঐ একটা বড়ই সুবিধে হয়েছিল —কাশীতে হরি মহারাজকে ভাগবত শুনিয়েছিলে। মহাপুরুষদের শোনালে শাস্ত্রের অর্থ বোধ হয় শীঘ্র। এ সব সুযোগ ভাগ্যে থাকলে হয়। আমাদেরও একটু শোনাও না, যদি মনে থাকে।

দেখিতে দেখিতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ছোট অমূল্য, শান্তি, বিনয়, ডাক্তার বক্সী প্রভৃতি।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ভক্তিমান প্রেমের সন্ন্যাসী। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের চিহ্নিত অতি বিশিষ্ট পার্ষদ। 'মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে ঘরে রেখে দেন'। তাই শ্রীম শ্রীজগদম্বা ও ঠাকুরের আদেশে তাঁহাদের দেওয়া 'এককলা' শক্তি লইয়া অতন্দ্রিত হইয়া দিবানিশি অবতারলীলার গুণগান কীর্তন করিয়া আসিতেছেন বিগত চল্লিশ বছর ধরিয়া। শ্রীমকে ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পার্ষদরূপে চৈতন্য সংকীর্তনে দর্শন করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন 'তোমার চৈতন্য-ভাগবত পাঠ শুনিয়া চিনিয়াছি তুমি কে'। ঠাকুরের আর একটি কথা আছে শ্রীমর সম্বন্ধে—ঠাকুর, অবতার, যেন 'পিতা', আর শ্রীম পার্ষদ, পুত্র। সন্ন্যাসী শ্রীমর এই সকল পরিচয়ের কথা চিন্তা করিতেছেন।

আরও চিন্তা করিতেছেন. শ্রীমই পার্ষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঠাকুরের নির্দেশে তাঁহার জন্মস্থান ৺কামারপুকুর ধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁর কৃপায় চিন্ময় বৃন্দাবনের মত কামারপুকুর ধামকেও চিন্ময় দর্শন করিয়াছিলেন। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মানুষ সব চিন্ময় দেখিয়াছিলেন। রাস্তায় যাহাকে দেখেন তাহাকেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন। একটি বিড়ালকে চিন্ময় দেখিয়া একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপায় ৺দক্ষিণেশ্বর ধামকেও চিন্ময় দর্শন

করিয়াছিলেন। ওখানকার প্রতি ধূলিকণা, surcharged with spirituality (জীবন্ত জাগ্রত ও চৈতন্যময়) বলিতেন। শ্রীম তাই ৺দক্ষিণেশ্বরের বৃক্ষলতাকেও দেবতা ও ঋষিরূপে দণ্ডায়মান অবতারলীলার সম্ভোগের জন্য, বলিয়া দর্শন করিতেছেন। তাই গদগদ চিত্তে তাহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন।

সুপণ্ডিত মেধাবী মর্মজ্ঞ সন্ন্যাসী এই সকল কথা স্মরণ করিতেছেন। আরও স্মরণ করিতেছেন, যিনি শ্রীচৈতন্য তিনিই ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি মনে করেন শ্রীম ভাগবত-রচয়িতা ব্যাসতুল্য 'কথামৃত'-কার রূপে। আর নারদতুল্য অহর্নিশ শ্রীরামকৃষ্ণ গুণ সংকীর্তনে। তাই সন্ন্যাসী স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী ভাগবতের ব্রহ্মার স্তবকুসুমাঞ্জলি দ্বারা শ্রীমর হৃদয় রঞ্জন করিতে লাগিলেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—বালক শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত কর্ম করিতেছেন। ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া তাঁহার শক্তি পরীক্ষার জন্য গো ও গোপালদিগকে এক নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া মায়ানিদ্রাতে শায়িত করিয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ঐরূপে আর এক দল গো ও গোপাল সৃষ্টি করিয়া গোকুলে প্রেরণ করেন। এক বৎসর এই ভাবে কাটিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, এই নূতন গো ও গোপাল কোথা হইতে আসিল? তিনি স্তম্ভিত হইয়া ধ্যানে জানিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ ব্রহ্ম। তখন তিনি স্তবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। (দশম স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায়)।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত !
জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং॥ ভাগবত—১০।১৪।৩

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ভাগবত—১০।১৪।৩২

তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি
কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥
ভাগবত—১০।১৪।৩৪

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন ! তে জনাঃ ॥

ভাগবত—১০।১৪।৩৬

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো !—ঐ, ১০।১৪।৩৭

অর্থ—হে অজিত, যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহে, অথচ জ্ঞান লাভের অপর সকল উপায় ছাড়িয়া দিয়া, সাধুগণ কীর্তিত আপনার গুণগাথা শ্রবণ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই আপনাকে বশ করিয়া থাকে। তাহারা নিজ স্থানে বসিয়া কায়মনো-বাক্যে কেবল আপনার কথাই শ্রবণকীর্তন করে, অন্য কিছুর আশ্রয় লয় না।

নন্দ, গোপ ও সকল ব্রজবাসীগণের অহোভাগ্য। কারণ, পরমানন্দময় পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম তাহাদের সহায় ও মিত্র।

ব্রহ্মা কহিতেছেন, আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে চাই, কোন বনভূমিতে। সকল বনের ভিতর বৃন্দাবনে জন্মলাভ করিতে পারিলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিব। কারণ, বৃন্দাবনবাসীগণ অহর্নিশ তাহাদের মিত্র কৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। আপনার ও তাহাদের চরণরজে ব্রজভূমি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। সেই চরণরজ আমার শিরে লাভ করিয়া ধন্য হইব। বেদও এই চরণরজের জন্য লালায়িত।

হে কৃষ্ণ, যতদিন মানুষ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণময় না হয়, ততদিন তাহাদের স্নেহাদি বৃত্তি চোরের ন্যায় তাহাদের সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করে। ততদিন তাহাদের গৃহ কারাগার সদৃশ হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদের পাদদ্বয় মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে।

হে প্রভো, পৃথিবীতে আপনার অবতারশরীর গ্রহণ কেবল শরণাগত জনের আনন্দরাশি বৃদ্ধির জন্য। আপনি স্বরূপতঃ নিষ্প্রপঞ্চ।

জগদম্বানিযুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারলীলার দৈব ব্যাখ্যাতা শ্রীম কি

অবতারলীলারসে নিমগ্ন হইয়া গেলেন ? তাঁহার মুখ উজ্জ্বল, নয়নদ্বয় স্থির, অন্তরে নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃশ্চল বসিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীম বলিলেন, আর একটু শোনাও।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ আনন্দোৎসাহে বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুনের স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন মধুর স্বরসংযোগে। কতকাংশ এইরূপ ঃ

"কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎতৎপরং যৎ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

অর্জুন বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, হে মহাত্মা, তুমি আদিকর্তা ব্রহ্মার পূজনীয়। তুমি অনন্ত, দেবগণের প্রভু, জগতের আশ্রয়। তুমি ব্যক্ত অব্যক্তের পরস্থিত অক্ষর পরম পুরুষ। হে অনন্তরূপ, তুমিই পরম ধাম।

কিছুক্ষণ পর শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধু ভক্তদের প্রতি)—ব্রহ্মা ও অর্জুন যাঁকে স্তব করলেন তিনিই দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। ভক্তসঙ্গে লীলা করলেন। কৃষ্ণের বাল্যলীলা গোকুলে। তাঁর কামারপুকুরে। ব্রহ্মাই বল, আর অর্জুনই বল, কি করে তাঁকে চিনবে তাঁর কৃপা ছাড়া ? সব যে তাঁর মায়ার অধীন! সব তার 'অণ্ডারে', ঠাকুর বলতেন। তারপর এবার আবার সম্পূর্ণ ছদ্মবেশ। ঐশ্বর্যের ধার দিয়েও গেলেন না। একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব। দীনহীন কাঙ্গাল। পরনের কাপড়খানাও রাখতে পারেন নাই গায়ে, মাটির ঢেলা হাতে করে দু' পা এগুতে পারেন নাই। অমন ত্যাগ! আবার মন্দিরে সামান্য পুরোহিত। তাঁকে যাঁরা ভালবেসেছেন ঐ অবস্থায়, তাঁরা কে গো ?

ব্রহ্মার ঐ কথাটি বড় সুন্দর—ব্রজে বাসের বাসনা নরশরীর ধারণ করে। কেন ? না, ওখানকার ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণচিন্তা নিরন্তর করে করে কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। তাঁদের চরণরজ মস্তকে পড়লে ব্রহ্মা কৃতকৃত্য হবেন। ব্রহ্মা বেশ বললেন, শরণাগত জনের আনন্দদানের জন্য অবতার-শরীর।

আমরা তাই ধন্য। তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি, তাঁকে ভালবেসেছি, তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, নিজ হাতে তাঁর চরণ ধরেছি, তাঁর প্রসাদ খেয়েছি, চক্ষুতে তাঁকে দর্শন করেছি, কানে তাঁর কথা শ্রবণ করেছি, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকার নিরাকার রূপ দর্শন করেছি, মৃত মানুষ অমৃত হয়েছি, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রাপ্ত হয়েছি, আমরা ধন্য। তোমরাও ধন্য তাঁর কথা শুনে, না দেখে তাঁকে ভালবেসেছ। তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়িয়েছ। তাঁর ভক্ত যারা ঘরে আছে তারা কেহ সংসারী নয়, ঠাকুর একথা বলেছিলেন।

রাত্রি প্রায় আটটা। সাধু মিষ্টিমুখ করিবেন। শ্রীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ ললিত মহারাজ, তুমি মিষ্টি খাবে? সেদিন বলেছিলে ঘিয়ের জিনিস খেলে অসুখ করে। সাধু বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, তা'হলে পুরাণবাজার থেকে মিষ্টি নিয়ে আসুন। (মিষ্টি দেখিয়া) মনোরঞ্জন বলিলেন, এখানে ভাল সন্দেশ ও রসগোল্লা পাওয়া যায়। সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীমও উঠিয়া পড়িলেন। চারতলের ঘরে যাইতে যাইতে অন্তেবাসীকে বলিলেন, দেখ কি কাণ্ড। ব্রহ্মাও চিনতে পারে নাই অবতারকে—কৃষ্ণকে। ধ্যানে জানলেন। রজোগুণ প্রধান কিনা! ধ্যান মানে, সত্ত্বে ঈশ্বরে মনোসংযোগ করে বুঝতে পারলেন, যাকে আমি ধ্যান করছি তিনিই বালক কৃষ্ণ।

এ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, যাঁরা ঠাকুরকে চিনতে পেরেছিলেন আর তাঁকে ধরে সারাজীবন কাটাচ্ছেন তাঁরা কত বড়, তাঁরা কে! ব্রহ্মাও তাঁদের চরণরজের জন্য লালায়িত। ঠাকুর অবতার।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
২৫শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল বুধবার। শুক্লা একাদশী ২৬ দণ্ড, ৪৬ পল।

ষোড়শ অধ্যায়

গৌড়ীয় মঠে শ্রীম, প্রথমবার

পরেশনাথের মন্দিরের কাছে গৌড়ীয় মঠ। এখানে উৎসব। মর্টন স্কুলের একজন শিক্ষক শ্রীমর আদেশে ঐ উৎসবে যোগদান করিতে রওনা হইলেন। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা। আর একজন শিক্ষক জগত্তারণও সঙ্গী হইলেন।

আজ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৬শে ভাদ্র ১৩৩১ সাল। বৃহস্পতিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী ২২ দণ্ড। ২৬ পল।

উৎসবক্ষেত্রে বহু লোকসমাগম হইয়াছে। একদিকে কীর্তন হইতেছে, অপর দিকে প্রসাদ বিতরণ। ভক্তগণ বসিয়া খিচুড়ি তরকারী আদি প্রসাদ পাইতেছেন। শিক্ষক দুইজনকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। তারপর তাহারা উৎসবক্ষেত্র দর্শন করিতেছে। বাহিরের নাটমন্দিরের দেওয়ালে বৈষ্ণবশাস্ত্রের বহু মহাবাণী লেখা আছে। শিক্ষকদ্বয় উহা পাঠ করিতেছেন। বেশ উদ্দীপন হয়। এই মঠের সাধুগণ গৈরিকবস্ত্র পরেন। ব্রহ্মচারীগণ পরেন শুভ্র বস্ত্র। সকলের হাতে মালার ঝুলি। সর্বদা জপ করেন। এখানে একলা গৌরাঙ্গের পূজা হয়, আর শাস্ত্রালোচনা হয়।

পাশেই পরেশনাথের মন্দির। ইহা জৈনদের তীর্থ। বহু অর্থ ব্যয়ে এখানে দুইটি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার একটি দর্শনীয় স্থান। শিক্ষকদ্বয় এই স্থান দর্শন করিয়া পুনরায় উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছেন। একজন শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। জগত্তারণ রহিয়া গেলেন।

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। দুর্গাপদ মিত্র, ডাক্তার কার্তিক বক্সী, বিনয়, ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, ছোট জিতেন, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমর অপেক্ষা করিতেছেন।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম ঠাকুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি জগবন্ধুর নিকট হইতে গৌড়ীয় মঠের উৎসবের সকল সংবাদ শুনিলেন। এবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আপনারাও গেলে ভাল হতো। ভগবানের উৎসবে যেতে হয় কষ্ট করে। তাতে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে প্রসাদ থাকলে আরও বেশী হয় (সকলের হাস্য)। না, এ হাসবার কথা নয়। মানুষের শরীরটা এই ধাতে তৈরী। এতে একটু খাবার পড়লে ভিতরের আত্মা জাগ্রত হয়। না পড়লে শরীর থাকে না। আবার বেশী পড়লেও চাপা পড়ে যায়।

শ্রীম (একটি যুবক ভক্তের প্রতি)—ঠাকুর চোখে এমনি একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন, তাই সকল ধর্মমতকেই আপনার বলে মনে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, আবার শাক্ত শৈব বৈষ্ণব, কোন ভেদই রাখতে দিচ্ছেন না। তিনিই নানারূপে খেলা করছেন। যার যা পেটে সয় সে তাই নেবে বেশী। কিন্তু অন্য মতের উপর তাচ্ছিল্য বা অবহেলা রাখবে না। শ্রদ্ধা রাখতে বলেছেন। কেন? না, সবই তাঁর কিনা তাই। যে কেবল নিজের মতকে ভালবাসে, অপর মতকে নিন্দা করে—সে ঈশ্বরকে যথার্থ ভালবাসে না, বুঝতে হবে।

তিনি কি খালি এই ধর্মমত কয়টি দেখছেন? সমগ্র বিশ্বটি দেখছেন। এই বিশ্বের সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, আবার বিনাশও করছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, একবার আমার ইচ্ছা হল, দিগন্তহীন মাঠে কি করে জীবজন্তু থাকে দেখতে। দেশ থেকে আসতে গরুর গাড়ী থেকে নেমে দৌড়ে মাঠের মধ্যে চলে গেলেন। দেখতে পেলেন, ঐ বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে পিঁপড়ের সারি চলছে, মুখে শস্যের টুকরো। ভক্তদের এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে পরে বলেছিলেন, দেখ, তিনি সমস্ত বিশ্বকে কি করে পালন করছেন। সকলের সকল রকম আহার যোগাচ্ছেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরের।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—আর একটা light (আলো) পাওয়া গেল। এটা খুবই important (প্রয়োজনীয়)। মাউন্ট এভারেস্ট

expeditionএ (অভিযানে) যাঁরা গিছলেন, তাঁদের একটা evidence (সাক্ষ্য) পাওয়া গেল। তাঁরা বলছেন, একুশ হাজার ফুট উঁচুতে তাঁরা একটা black spider (কাল মাকড়সা) দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানে কোনও vegetation (উদ্ভিদ্ জীবন) নেই। তাঁরা অনেক খুঁজেও subsistenceএর (জীবনধারণের) কোনও উপায় দেখতে পেলেন না। যাঁরা গিছলেন, তাঁরা খুব scientific men (সুশিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক)। অনেক research (গবেষণা) করলেন, কি খেয়ে বেঁচে আছে ঐ black spider (কাল মাকড়সা) তা' বলতে পারেন নাই।

আর সতর হাজার ফুটে অনেক পোকা দেখতে পেয়েছেন। যেই খানিকটা বরফ খুঁড়তে আরম্ভ করলেন, অমনি দেখতে পেলেন অসংখ্য পোকা বরফের নিচে কিলবিল করছে।

দেখ কি আশ্চর্য ! এখন কি বুঝবে এই বিচিত্র বিশ্বের ? কোথাও কিছু নাই খাবার, তবুও বেঁচে আছে। একে কি বলবে ? এখানে evolution theory (ক্রমবিকাশবাদ) খাটবে না। আর একটা creation (সৃষ্টি) করতে হবে।

কেমন করে খাটবে ? দেখ না, জল জমে বরফ হয়ে গেল। কিন্তু তার নিচের জল গরম। আর তাতে মাছ থাকে। এভারেস্ট এইটুকু, তার কথাই জানতে পারছে না। আর এই অনন্ত বিশ্বের কি জানবে ?

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, আকাশ দেখাইয়া)—এইসব তিনিই হয়ে রয়েছেন, Mars, Venus (মঙ্গল, শুক্র) এই সব। এরা তো হলো আমাদের Sunএর (সূর্যের) নক্ষত্র। (অসংখ্য তারা দেখাইয়া) আর ঐ দেখছ অগণিত তারা। এক একটি তারা এক একটি সূর্য। তাদেরও গ্রহ, (Satellites) আছে। অগণিত, অগণিত সব—সব অনন্ত। মানুষ কি বুঝবে এর, বিচার করে, হিসাব করে ? হিমালয়ের এভারেস্ট—হিমালয় আট শ' ভাগের এক ভাগ পৃথিবীর তুলনায়।

বিগত কয়দিন হইতে শ্রীম রাত্রি দুইটার সময় ছাদে আসিয়া

অনেকক্ষণ ধরিয়া তারা দেখিতেছেন—তুই ঘণ্টার উপর। ভক্তদেরও প্রায়ই বলেন, দেখুন উপরে একবার চেয়ে, কি কাণ্ডটা চলছে! আজ পর্যন্ত এর একটা তারার পাত্তা করতে কেউ পারে নাই। অহংকার, কর্তাগিরি তা' হলে টিকছে না। শ্রীম কখনও তাঁহার বালক পৌত্রদের বলিতেন, তোমরা তারা দেখ না কেন? বল, কখন আসবে ছাদে তারা দেখতে।

অন্তেবাসী আজ খুব পরিশ্রান্ত। তাই অদূরে দক্ষিণ দিকে বেঞ্চের উপর লম্বমান। ছোট জিতেন মঠে গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রসাদ আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। শ্রীম ভক্তিভরে প্রসাদ কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন পায়ের চটি জুতা ছাড়িয়া। বলিতেছেন, প্রসাদ কেন নিই? ঠাকুর বলেছিলেন, না নিলে মা রাগ করবেন।

২

পরের দিন অপরাহ্ন ছয়টা। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম বেড়াইতেছেন, হাতে একটি লাঠি। মাঝে মাঝে তুইটি বালক পৌত্র, তোতা আর ভোলার সঙ্গে তুইটি-একটি কথা কহিতেছেন। তাহারা তুই ভাই ছাদের উত্তর দিকে 'তপোবনের' কাছে ঘুড়ি উড়াইতেছে। বালকদের সঙ্গে আধ আধ ভাষায় কথা কহিতেছেন—হাঁ, তোমরা জুতো পর না কেন? জুতো পর আর ঘুড়ি উড়াও। কথা কহিতেছেন আর তুই চার পা চলিতেছেন—মন অন্তর্মুখ। আবার বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা তারা দেখতে আস না, রাত্রে? কখন আসবে বল? আবার বেড়াইতেছেন উত্তর দক্ষিণ, আবার বলিতেছেন, তারাগুলো কেমন সুন্দর ঝুলছে যেমন নাট মন্দিরে বিজলীর বাতি ঝুলে। রাত্রে এসে দেখতে হয়। আবার বেড়াইতেছেন, আবার কথা কহিতেছেন, তারাদের বাড়ী অনেক দূরে। এই যে দেখছ সূর্য, এর চাইতেও দূরে। আর এর চাইতেও বড়। এরা কি করছে বল দিকিন? এরা ভগবানের গুণগান করছে, পূজো করছে। আবার বেড়াইতেছেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলিতেছেন, ভগবানের পূজো করা ভাল, কি বল? উভয় বালক

উত্তর করিল, আজ্ঞে হাঁ। শ্রীম বলিলেন, তোমরাও সকাল সন্ধ্যায়, ভগবানকে নমস্কার করবে। নমস্কারও পূজো।

শ্রীম এইবার বিস্তৃত ছাদের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়াছেন। এখানে একটা বেঞ্চের উপর অন্তেবাসী লম্বমান হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। কাছে আসিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার শ্রীমর সহিত কথা কহিতেছেন।

অন্তেবাসী—শ্রীহট্টের ভক্ত রজনী দে পত্র দিয়েছেন।

শ্রীম—পড়ুন তো কি লিখেছেন। ভালয় ভালয় দেশে পৌঁছে গেছেন। এ খুব ভাল হ'ল।

(পত্রপাঠ শুনিবার পর) বেশ করেছেন চলে গিয়ে। এখানে অসুখ করলে কে সেবা করবে ? তাই চলে গেছেন। এ সময়টা ভাদ্র মাস, খারাপ। সাধুর মত ভাব, সাধু লোক। আপনি লিখে দিন আমাদের নাম করে—আপনার শরীর ভাল হলে আপনি এসে ৺দক্ষিণেশ্বর ও ৺কামারপুকুর দর্শন করে যাবেন। বসন্তকালে ৺কামারপুকুর ভাল। আপনার শুভ ইচ্ছা খুব ভাল! সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আসবেন।

রজনী শ্রীহট্ট হইতে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। স্কুলবাড়ীতেই অন্তেবাসীর সঙ্গে থাকিতেন। মাস কয়েক থাকিয়া অসুস্থ হইয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন সম্প্রতি।

শ্রীম এবার জগবন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—আচ্ছা, কাল গৌড়ীয় মঠে কি হলো ?

জগবন্ধু—ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা হ'ল। আমরাও বসে সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেলাম। সঙ্গে ছিলেন জগত্তারণ। ওঁরা কতকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে ঈশ্বরীয় কথা লিখে বিলি করেছিলেন।

শ্রীম—কৈ, আনলেন না আপনারা ?

জগবন্ধু—(পাশের নিজের ঘর হইতে লইয়া আসিয়া) এনেছি, এই।

শ্রীম—(পকেটে রাখিয়া) বেশ হলো পরে দেখবো।

জগবন্ধু—নাট মন্দিরের দেয়ালে চৈতন্যদেবের উপদেশ লেখা আছে।

যেমন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।' 'জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন'—ইত্যাদি।

শ্রীম—একবার গেলে হয়। ডাক্তারবাবুর মোটরে যাওয়া যায়। আচ্ছা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন নামাজ পড়ি।

শ্রীম বেঞ্চেতে বসিয়াই ধ্যান করিতেছেন দক্ষিণাস্য। পাশে একটি ভক্ত বসা। একটু পরে ছোট রমেশ ও উপাধ্যায় প্রভৃতি আসিলেন। তাঁহারাও বেঞ্চেতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

শ্রীম (ধ্যানান্তে উপাধ্যায়ের প্রতি)—অনেকদিন দর্শন হয় নাই। কোথায় কোথায় সাধুসঙ্গ হলো?

উপাধ্যায়—কেন, গত রবিবার এসেছিলাম।

শ্রীম (সহাস্যে)—তা' তো হল। তারপর? আসুন না, এখানে বসুন।

উপাধ্যায় কিঞ্চিৎ কালা। উঠিয়া গিয়া শ্রীমর বেঞ্চেতে বসিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজ মঠে তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) সাধু ব্রহ্মচারীদের খাওয়াবেন। কেউ গেলে বেশ হতো। এখন too late (দেরী হয়ে গেছে)। সাধুদের সঙ্গে থেকে এসব আনন্দলাভ করা বড়ই ভাল। ভাল সংস্কার থাকলেই এতে মানুষের ভিতরের আনন্দ-স্বরূপ জাগ্রত হয়ে ওঠে। বাইরের আনন্দ ভিতরের আনন্দকে টানে। আবার ভিতরের আনন্দও বাইরের আনন্দকে টানে। এসব কি আগে আমরা জানতুম? ঠাকুর এই সব কৌশলে দেখিয়ে গেছেন। সাধুদের সঙ্গে থেকে এসব আনন্দ লাভ করা বড়ই ভাল।

কি আর করা যায় এখন। মনকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। আহা, ঠাকুর কি মন্ত্র শিখিয়ে গেছেন—মনকে পাঠালেও হয়। যেখানে অনেকক্ষণ ধরে মন থাকে সেখানকার রঙ্গে মন রঙ্গিয়ে যায়। সব সাধুরা আনন্দ করেন। এমন occasion (সুযোগ) কি পাওয়া যায় সর্বদা? ওসব স্থানে গিয়ে সাধুদের সেবা করতে হয় তখন। যে সেবা করবে সেও সাধু হয়ে যেতে পারে।

দেখুন না, মন তৈরী করার জন্য কত আয়োজন। ছবি, প্রতিমা সব—সবই মন তৈরীর জন্য।

আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছে।

শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, চলুন সিঁড়ির ঘরে গিয়ে বসা যাক্। জল পড়ছে।

শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য সিঁড়ির সম্মুখে। শ্রীমর সম্মুখে পূর্ব-পশ্চিম লম্বমান দুই সারি বেঞ্চ। তাঁহার বাম হাতে ঐরূপ আর এক সারি। ভক্তগণ ঐসব বেঞ্চেতে উপবিষ্ট। পূর্বের চিন্তাস্রোতই শ্রীমর ভিতর প্রবাহিত।

শ্রীম (গদগদভাবে ভক্তদের প্রতি)—কি একটা দেখতেন, ঠাকুর। তাই এ সব ভাল লাগতো না।

বলেছিলেন, রাখাল বলে, তোমায় এখন ভাল লাগছে না। পরিবারের কি হবে তাই ভাবে।

উনিও কি একটা দেখতেন। তাই বলতেন, বিষয় ভাল লাগে না।

একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) বলছেন, কি আর হবে বাড়ী গিয়ে? এখানে থাক। ভক্ত বললেন, বাড়ীতে এই এই অসুখ বিসুখ রয়েছে। উনি উত্তর করলেন, আচ্ছা এমন কিছু বিপদ যদি ঘটেই বা, পাড়ার লোক এসে দেখবে। তুমি থেকে যাও। কি একটা দেখে একথা বলতেন।

আহা, সদ্‌গুরু ভগবান ছাড়া কে একথা বলতে পারে? তিনি সর্বদা দেখতেন একমাত্র ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। তাই ঈশ্বরের কাছে থেকে যাও। যাকে আপনার বলছো, এ অনিত্য বস্তু তো থাকবে না। দু'দিনের আপনার এরা। ঈশ্বর অনন্তকালের আপনার। সেই ঈশ্বর ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ক্রাইস্ট একবার একস্থানে রয়েছেন ভক্তসঙ্গে। ভক্তরা তাঁর চার দিকে ঘিরে রয়েছেন। একজন গিয়ে বললো, প্রভো, আপনার মা এসেছেন। উনি তখন ঈশ্বরের ভাবে ছিলেন। অবাক্ হয়ে তিনি উত্তর করলেন, মা, এ কি বলছো? তোমরাই যে, ভক্তরাই যে, আমার মা ভাই বন্ধু সব।

আহা, তাঁরা কি একটা দেখেন আর পাগল হয়ে যান। তাই ঠাকুর সর্বদাই 'মা মা' করে পাগল। অন্যে বুঝবে কি করে একথা ?

ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বিনয়ের ভাই, ছোট জিতেন, প্রভৃতি আসিয়াছেন। অন্তেবাসী ডাক্তারের কানে কানে বলিলেন, শ্রীমর গৌড়ীয় মঠে যাইবার ইচ্ছা। ডাক্তার তাই শ্রীমকে বলিলেন, মোটর এসেছে, গৌড়ীয় মঠে চলুন।

শ্রীম—হাঁ, ভাবছিলাম গেলে গৌরাঙ্গদর্শন হতো। জল পড়ছে যে।

শ্রীম নিচে নামিতেছেন। ভক্তগণও বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। এখন রাত্রি আটটা।

শ্রীম আসিয়া মোটরে বসিলেন পিছনের সিটে ডান হাতে। জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, বিনয়ের ভাই ও ডাক্তার সঙ্গে চলিলেন।

মাণিকতলা দিয়া সাহিত্য পরিষদের রাস্তায় গাড়ী চলিতেছে। পরেশনাথের মন্দিরের পাশে গাড়ী থামিয়াছে, গৌড়ীয় মঠের দরজায়। শ্রীম নামিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া মঠে ঢুকিলেন পূর্বাস্য হইয়া। খুব অল্প বারিবিন্দু পড়িতেছে বাহিরে। শ্রীম অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন, "গৌর গৌর"। ঠাকুরঘর বাম হাতে। শ্রীম দর্শন করিতেছেন যুক্ত করে। আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের রাজবেশ। বিগ্রহ দক্ষিণমুখী। শিরে মুকুট, পরনে বেনারসী সিল্কের কমলা রঙ্গের চিত্রিত চেলী। আর স্কন্ধে শুভ্র ভাঁজকরা চাদর দুই পার্শ্বে লম্বমান। এই মঠে পূজা হয় একলা গৌরের।

শ্রীম গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। একটি বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী, হাতে তাঁহার জপের মালার আধারী। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মচারী অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে ? অন্তেবাসী বলিলেন, 'কথামৃত'-কার শ্রীম। ব্রহ্মচারী আহ্লাদে কহিলেন, আমিও অনুমানে ঠাওরিয়েছি তাই।

শ্রীম পশ্চিম-উত্তরের দরজা দিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। উহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান। মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা। শ্রীম উহাতে বসিলেন দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ বসিয়াছেন শ্রীমর ডান দিকে ও বামে।

শ্রীমর স্কন্ধে খদ্দরের ভাঁজ করা চাদর। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আবৃত। তাঁহার পশ্চাতে অন্তেবাসী।

এই সতরঞ্চির উপর দক্ষিণের দিকে ভাগবত পাঠ হইতেছে। গৈরিক বস্ত্রধারী একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি পশ্চিমাস্য। তাঁহার সম্মুখে জলচৌকির উপর ভাগবত। আর তিন দিকে কয়েকটি বৈষ্ণব ভক্ত, ব্রহ্মচারী ও সাধু বসা। সকলের কপালে তিলক, মস্তকে শিখা, আর হাতে মালার আধারী। কেহ কেহ মুণ্ডিত-শির। ব্যাখ্যাতা বেশ লম্বা চওড়া লোক। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। মুখে চাপদাড়ি, মস্তকে কেশ।

গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা চলিতেছে। গুরু ভগবানের রূপ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ। গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ভগবল্লাভে গুরুশক্তির একান্ত প্রয়োজন। এমন একনিষ্ঠ ভক্তি থাকিলেই ভক্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে ভগবান-লাভে তিনি প্রতিবন্ধক হন, তবে তিনিও ত্যাজ্য। অসুররাজ বলি গুরু শুক্রাচার্যকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে, 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥' ইত্যাদি।

শ্রীম একটু ব্যাখ্যা শুনিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গদর্শন ও পুনরায় প্রণাম করিলেন। তখন ঐ মঠের দুইজন গৃহী ভক্ত শ্রীমকে চিনিতে পারিলেন এবং সবিনয়ে প্রসাদ পাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীম বলিলেন, দিন আমাদের হাতে হাতে দিন। তাঁহারা শ্রীমর হাতে একটি খুরিতে বুঁদে ও দুইটি মালপোয়া আনিয়া দিলেন। শ্রীম যুক্ত করে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঐ খুরিটি অন্তেবাসীর হাতে দিলেন।

বাহিরে ঝুরি বৃষ্টি। শ্রীম গাড়ীতে উঠিলেন ভক্তসঙ্গে। যে পথে গাড়ী গিয়াছিল সেই পথে চলিল। মাণিকতলার নিকট শ্রীম বলিলেন, বেশ উদ্দীপন হলো। এঁদের দেখলে চৈতন্য-গোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। পুরীতে এমন করে নেড়া-মাথা ভক্তবৃন্দে পরিবৃত থাকতেন। বেশ

ভক্তির উদ্দীপন হয়। সবটাই কি আর খাঁটি? যেখানে যেটুকু খাঁটি সেইটুকু নিতে হয়।

মোটর আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়া দাঁড়াইল। মর্টন স্কুলের সামনে বলাই ফুটপাথে পায়চারী করিতেছেন শ্রীমর অপেক্ষায়। শ্রীম নামিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। ছোট জিতেন সকলকে প্রসাদ দিতেছেন। ভক্তগণ বিদায় লইলেন। শ্রীম অন্তেবাসীর সহিত উপরে উঠিতেছেন। বলিলেন, সব রকমের ভক্তগণকে দর্শন করতে ইচ্ছা হয় এক সময়ে। সকলেই তাঁকে ডাকছে। এইটাই সত্যিকার জীবন। মধুকর হয়ে মধুটুকু নিতে হয়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ
২৭.শ ভাদ্র ১৩৩১ সাল। শুক্রবার; শুক্লা অনন্ত চতুর্দ্দশী, ১৯ দণ্ড। ২ পল।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিকারের রোগী সব

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বৈঠকখানা। শ্রীম বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। এখন সকাল সাতটা। জগবন্ধু ও ছোট জিতেন কথামৃতের প্রুফ দেখিতেছেন। ঢাকা হইতে একজন ভক্ত ডাক্তার আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার বাড়ীঘরের সংবাদ লইতেছেন।

এখন আটটা। শ্রীম উত্তরের বারান্দার পশ্চিম দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন। অন্তেবাসী শ্রীমর ঈশ্বরীয় কথার ডায়েরী রাখেন।

অন্তেবাসী—আমার বুক কাঁপে। একটু strain (অতিরিক্ত পরিশ্রম) করলে বুক দুরদুর করে। হলো কি?

শ্রীম (সহানুভূতির স্বরে)—ও হবে না! কেমন strain

(অতিরিক্ত পরিশ্রম)! আপনি যা করছেন, কম ব্যাপার! আমি জানি। আমারও হয়েছিল। আমার হার্ট এমন হয়েছিল। ঐ সব (কথামৃতের) ডায়েরী রাখতে গিয়ে ওতেই অমন সব হলো।

সর্বদাই একটা ধ্যান চলছে কি না! ধ্যান কি শুধু এক রকম? এ-ও ধ্যান।

এর এক ঔষধ—খালি ঘুমানো। আর তফাৎ থাকা ও (ডায়েরী লেখা) থেকে। আর দুধ খাওয়া যতটা হজম হয়। ঠাকুর এই কথা আমায় বলেছিলেন।

আমি অনেক দিন তফাৎ ছিলাম। তাই তখন pulse-এর (নাড়ীর) intermittent (ক্ষীণ অনিয়মিত) গতি ডাক্তার আর দেখতে পান নাই।

কিন্তু যেই strain (অতিরিক্ত পরিশ্রম) হতো অমনি বাড়তো। Rest (বিশ্রাম) হলেই কম হতো। তাই তো আজও এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতে পারছি।

নয়টার সময় শ্রীম চারিতলায় উঠিতেছেন।

এখন অপরাহ্ণ দুইটা। শ্রীম চারিতলার নিজের কক্ষে বসিয়া আছেন বিছানায় পশ্চিমাস্য। বেহালা হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহার নাম রাজেন রায়। সঙ্গে পুত্র। বয়স হইবে ত্রিশ-বত্রিশ। রাজেনবাবু ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। এখন ইহার বয়স সাতষট্টি। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবত লিখিয়াছেন। উহারই কিছু কিছু অংশ পড়িয়া তিনি শ্রীমকে শুনাইতেছেন। খানিকটা শুনিয়া শ্রীম নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। বলিলেন, একজন একখানা history (ইতিহাস) লিখেছেন। আমরা suggest (পরামর্শ প্রদান) করলাম authority (নজির) দিতে। Authority (নজির) quote (উদ্ধৃত) করলে value (মূল্য) বেড়ে যায়।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শনিবারের ভক্তরা আসিয়া শ্রীমর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন অনেকক্ষণ হইতে। কেহ কেহ চলিয়াও গিয়াছেন রেলের যাত্রীরা। শ্রীম আসিয়া বেঞ্চেতে বসিয়াছেন পশ্চিমাস্য। ভক্তগণ

শ্রীমর সম্মুখে ও বামে বেঞ্চেতে বসা—ভোলানাথ মুখার্জী, ছোট নলিনী, লক্ষ্মণ প্রভৃতি। ছোট নলিনী মুড়ি ও ছোলাভাজা আনিয়াছেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ পাইতেছেন। শ্রীম দুই এক দানা মুড়ি মুখে দিলেন। তাঁহার দাঁত নাই।

অন্তেবাসীকে শ্রীম ব্যবস্থা দিয়াছেন খুব ঘুমাইতে। তিনি তাঁহার কুটিরে নিদ্রিত ছিলেন। ভক্তদের কথাবার্তা শুনিয়া বাহিরে আসিলেন ছাদে। শ্রীম তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম—শুনছেন জগবন্ধুবাবু, আপনার যে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করছে তা' কেন হচ্ছে জানেন? এ যেন কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকেছে। কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকলে তোলপাড় করে তোলে।

আমরা যে কথা কই, এ তো আমাদের কথা নয়, সব তাঁর কথা। ঠাকুর কণ্ঠে বসে কথা কন। এখন এ সব কথা কত পড়েছে আপনার মনে। পাহাড়ের মত স্তূপাকার হয়ে আছে। কিম্বা island (দ্বীপ) যেমন সাগরের মধ্যে। কোরাল দ্বীপ সৃষ্টি হয়, সমুদ্রের জলে সংখ্যাহীন পতঙ্গ পড়ে পড়ে।

আপনি কত কথা শুনছেন, মনে রাখতে চেষ্টা করছেন—এরপর এই, তারপর এই। কম strain (চাপ)! এর উপরও আবার লেখা রাত জেগে জেগে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমাগত লেখা, বছরের পর বছর। এদিকে শুতে হয়ে যায় এগারটা, আবার তিনটায় বসে তাঁর চিন্তা করা। (গণনা করিয়া) চারঘণ্টা। এই সময়টাই নিদ্রার সময়। এটা যাচ্ছে লেখায়। কত pressure (চাপ) পড়ছে মনে। মন থেকে brain-এ (মস্তিষ্কে), তা' থেকে nerves-এ (স্নায়ুতে)।

আপনারা একটু চেষ্টা করছেন কিনা তাঁর কথা লিখে রাখতে। তাঁর একটা দু'টো কথাই লিখে রাখাই কত শক্ত। খুব তেজিয়ান কথা সব কিনা। তার উপর রাশি রাশি কথা মনে ধারণ করতে চেষ্টা হচ্ছে। স্তূপাকার হয়ে মনের উপর চাপ পড়েছে। সেই চাপ এসেছে nerves-এ (স্নায়ুতে)। তাই nerves (স্নায়ু) কাঁপছে। তাই বুকে ধড়ফড়ানি।

আমাদেরও এমন হয়েছিল। ঠাকুর থাকতেই এমন হয়-—না, পরে ? থাকতেই হয়। একদিন বাদুড়বাগানে রাস্তায় বসে পড়েছিলাম অজ্ঞান হয়ে, বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ীর সামনে। তারপর একজন গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিল। হাঁ, ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, ঘুমোও আর দুধ খাও। আর কিছু দিন লেখা বন্ধ কর। আপনাকে যা বললাম, এ ঠাকুরেরই prescription (ব্যবস্থা)।

কেশব সেনকে দেখতে গিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমার কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকেছে। আপনারও সেই অবস্থা। কেশববাবুর তখন খুব অসুখ।

ভাটপাড়ার ললিত রায়ের প্রবেশ। তিনি প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। এবার কথাবার্তা চলিতেছে।

ললিত—কোথাও জলে ভাসছে আর কোথাও জলহীন।

শ্রীম—এ সব কর্মচারীদের negligenceএর (কার্যে অবহেলার) জন্য হচ্ছে। বেদে আছে, ঋষিরা দর্শন করেছিলেন, ঈশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, এই তিন জনকে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ, এই তিন কাজে নিযুক্ত করে রেখেছেন। তাদের আবার নিচের কর্মচারী সব আছে। যেমন Viceroy (বড়লাট)। তাঁর কত লোক। সব কাজই কি ঠিক ঠিক হচ্ছে ? কত ভুল হয়ে যাচ্ছে। তেমনি এ সব—অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি। কর্মচারীদের দোষে এসব হচ্ছে।

ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। শ্রীম সকলকে লইয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। ডাক্তার ও বিনয়কে বলিলেন, আপনারা এবার উঠুন। জল পড়া বাড়লে মোটর চলবে না। রাস্তায় জল দাঁড়াবে। এখন ওঠাই ভাল। কাশীপুরের রাস্তায় জল দাঁড়ায়। ডাক্তার ও বিনয় বিদায় হইলেন।

শ্রীম এখন আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় ছোট নলিনীর হাতে একখানা ভাগবত দিয়া বলিলেন, একজনে পড়ুন, আর সকলে শুনুন।

এখন সন্ধ্যা হয় হয়। জগবন্ধু দুধ আনিতে বাহির হইলেন। তিনি ঠনঠনের কালীবাড়ীতে মাকে প্রণাম করিয়া শীতলা বস্ত্রালয়ে গেলেন।

সেখান হইতে ফেরার পথে দুধ লইয়া ফিরিয়াছেন। এতক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। জল পড়া বন্ধ হইয়াছে।

রাত্রি আটটা। শ্রীম আসিয়া ছাদে বসিলেন দক্ষিণদিকে চেয়ারে পশ্চিমাস্য। শ্রীমর ডান হাতে বসিয়াছেন বড় জিতেন বেঞ্চেতে। শান্তি, বলাই, জগবন্ধু প্রভৃতিও আসিয়াছেন। সকলেই শ্রীমর সামনে ডাইনে বামে বসা বেঞ্চেতে। শ্রীম কথা কহিতেছেন। জগবন্ধু বাহির হইতে আসিয়া শুনিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যে বুঝতে পেরেছে কত বড় লোকের ছেলে, তার কি সামান্য জিনিসে মন যায়? কেন যাবে? সে যে দেখতে পাচ্ছে, তার পিতার অতুল ঐশ্বর্য। সমগ্র বিশ্বটাই তার পিতার। আবার সচ্চিদানন্দের ছড়াছড়ি। তাই নিচের জিনিসগুলো নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য তার পিতার ঘরে দীপক হয়ে জ্বলছে। সে দেখতে পাচ্ছে আর বলছে—"কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।" তাই মানুষ যার জন্য পাগল সে সেগুলোকে অতি তুচ্ছ মনে করে। সে কেবল জ্ঞান ভক্তি চায়—সচ্চিদানন্দ-রসের রসিক। কেন নেবে অন্য জিনিস? কিছুই যে থাকবে না। থাকবেন কেবল তিনি, সচ্চিদানন্দ।

২

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া একটা ঠেলাগাড়ী যাইতেছে। তাহার বিকট শব্দ হইতেছে। ইহাতে শ্রীমর মনোযোগ আকর্ষণ করাইলেন বড় জিতেন। ভক্তগণ শব্দ সম্বন্ধে নানা গবেষণা করিতেছেন। শ্রীম কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শব্দ? এ তো এই—কত দূর আর? Atmosphere-এর (বায়ুমণ্ডলের) কতদূর জানি? ফরটি-ফাইভ মাইলের মধ্যেই শব্দ।

ঠাকুর বলেছিলেন, আর এক রকম শব্দ আছে। সে শব্দ যোগীরা শোনেন। তার medium air নয়, ether ও নয় (বাহক বায়ু নয়,

সূক্ষ্ম বায়ুও নয়)। সে আবার এ আকাশে নয়, চিদাকাশে। যোগীদের যোগ-কান, যোগ-চক্ষু হয়। তা' দিয়ে যোগীরা ঐ শব্দ শুনতে পান গভীর রজনীতে। ঠাকুর পাগলের মত দৌড়াতেন গঙ্গার পোস্তার উপর রাত তখন ছ'টো তিনটে—ঐ শব্দ শুনে। অনাহত শব্দ উহার নাম। অন্য পদার্থে আঘাত পেয়ে নয়। তাই অনাহত। এই শব্দ আকাশে আহত হয়ে হচ্ছে। ঐ শব্দ অমনি হচ্ছে।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—গৌড়ীয় মঠে কাল গিছলুম। বেশ উদ্দীপন হলো। যেন চৈতন্যদেবের ঘর দেখে এলাম। নেড়া মাথা, হাতে হরিনামের ঝুলি। অনেকগুলি ভক্ত বসে আছেন। ভাগবত পাঠ শুনছেন। আবার গৌরাঙ্গদর্শন হলো। পুরীতে এইরকম ভক্ত নিয়ে থাকতেন চৈতন্যদেব।

ঠাকুর বলতেন, যে গরু বেছে বেছে খায় সে চিড়িক্ চিড়িক্ করে দুধ দেয়। আর যে গরু যা পায় তাই খায় সে হুড়্ হুড়্ করে দুধ দেয়। যদি বল দুধে একটু গন্ধ হয়, তার উপায়ও বলে দিছলেন। একটু আওটে নেবে। তা' হলে আর গন্ধ থাকবে না। অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা বিচার করে নেবে। কষ্ঠি পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে।

বড় জিতেন (সঙ্গে সঙ্গে)—কষ্ঠি পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে (শ্রীমর হাস্য)।

কিরণ ও কানাইয়ের প্রবেশ। ইহারা বিনয়ের ছোট ভাই। উভয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিল। কিরণের হাতে রাখাল বাঁড়ুয্যের বাংলার ইতিহাস।

শ্রীম (কিরণের প্রতি)—দেখি দেখি কি, কি বই ?

শ্রীম বইখানা হাতে লইয়া প্রথম পৃষ্ঠা পড়িতেছেন। তারপর পাতা উল্টাইতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজকাল research (গবেষণা) হচ্ছে কি না। এর বড্ড value (মূল্য)। Authority (অধিকারীদের নাম) দেওয়ায় আরও valuable (মূল্যবান) হয়ে গেছে।

দেখুন, মানুষ কি করছে। কি বুদ্ধি তিনি মানুষকে দিয়েছেন! তামার পাত দেখে, এই সব থেকে পুরানো ইতিহাস হচ্ছে। তার জন্যই কিছু পড়াশোনা করে নিতে হয় আগে। তবে বুদ্ধি sharpened (তীক্ষ্ণ) হয়। Culture (মার্জিত বুদ্ধি) থাকলে ঐ তত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্বও) ফস্ করে ধরে নিতে পারে।

বুদ্ধিটাকে একটু শানিয়ে নেওয়া এই আর কি। এটাও (বুদ্ধিটাও) মিথ্যা। ওটাও (বুদ্ধির কার্য—সাংসারিক বস্তুজ্ঞানও) মিথ্যা।

এই জন্য পড়াশোনা। বুদ্ধিটাকে শানিয়ে নেওয়া। তা' হলে ঐ তত্ত্বও (ব্রহ্মতত্ত্বও) ফস্ করে ধরে ফেলতে পারে। তাই ঠাকুর বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে।

কিরণ স্টুডেণ্টস্ হোমে থাকিয়া কলেজে পড়ে। সে ও কানাই এবার ফিরিয়া যাইবে।

শ্রীম (কিরণের প্রতি)—ওঁরা কবে ফিরে যাবেন (বিদ্যাপীঠে) হেমেন্দ্র মহারাজ? তুলসী মহারাজও (স্বামী নির্মলানন্দ) কি যাচ্ছেন ওখানে? বোধানন্দ অনেক দিন ধরে রয়েছেন আমেরিকায়।

কিরণ ও কানাই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতেছে।

শ্রীম—আহা এমন করে কেন? (যুক্ত কর দেখাইয়া) এমন করে করলেই হলো। ও রকম করে কেন অত কষ্ট করা?

কিরণ ও কানাই চলিয়া গেল।

শ্রীম (চিন্তা করিয়া)—বোধানন্দরা তখন কলেজে পড়ে এফ্. এ। বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গিছলো কিছু চাঁদার জন্য। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে উৎসব হবে। তাই কিছু কিনে দিবে ঠাকুরকে ভিক্ষা করে। বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, বেশ তো, তোমাদের কিছু দিতে ইচ্ছা হয়, তা রোজগার করে দাও না (হাস্য)। মানে, এঁরা এই সব মানেন না। গরীবকে হয়তো দিবেন। ওসবে বিশ্বাস নাই।

তারপর তারা চাল ভিক্ষা করে সেই চাল বেচে। তখন ফল—আম কিনে নিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর মশায় কিছুই দিলেন না। বিশ্বাস নাই যে ওতে।

পি. সি. রায়ও শুনতে পাই ঐ রকম। পার্শিবাগানে শরৎকে দেখতে গিছলাম। ওরা বললে (সমিতির) ঘরে এসে ডাক্তারখানা দেখে গেলেন। কিন্তু যে দিকে ঠাকুর আছেন সেদিকে গেলেন না।

তা' কি করবে, সবাই কি এক রকম হবে? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। বিদ্যাসাগর, পি. সি. রায়—এঁরা তো ফেলনা লোক নন্। এঁদের যেকালে এই ভাব, বুঝতে হবে তিনিই এইরূপ করেছেন। Division of labour (শ্রমবিভাগ)। কতকগুলি লোককে এক একটা ডিপার্টমেণ্টে রেখে দিয়েছেন।

আবার একটা ডিপার্টমেণ্ট আছে। সেখানে কেবল ঈশ্বরকে চায়। অন্য কিছু না। তাই কারুকে দেখে নাক সিটকানোর যো নাই।

রাজেন্দ্র দত্ত এমন ছিলেন। ইনি ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখতে যেতেন। ওঁরই দেওয়া জুতা মঠে পূজো হয়—ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। ফোরটি ইয়ার্স ধরে পূজো হয়ে আসছে।

উনিও বলতেন, আমি ভক্তি-ফক্তি বিশ্বাস করি না। এই বলে একটা গল্প বলতেন। একজন বাবুর একটা বাগান ছিল। তাতে দু'জন মালি আছে। একজন বাবুকে দেখেই বলতে শুরু করে, আহা আপনি কি সুন্দর, কি সুপুরুষ, ইত্যাদি। আর এদিকে বাগান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আর একজন ওসব কিছু বলে না। নীরবে সে বাগান পরিষ্কার করে। বাবু এখন কা'কে ভালবাসবে বেশী—একে না ওকে? (হাস্য)। ওঁদের এই মত ছিল।

কিন্তু তাঁরই দেওয়া পাদুকা পূজো হচ্ছে মঠে ফোরটি ইয়ারস।

অন্তেবাসী (খুব আস্তে)—খুব ভাগ্যবান।

অক্রূর দত্তের সঙ্গে আমাদের একবার আলাপ হয়েছিল। ওঁর ছেলে আমাদের ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিল। একবার তাঁর কি অসুখ দেখতে গিছলাম। ছেলে আমায় introduce (পরিচয়) করিয়ে দিলে। আমার সঙ্গে ঠিক যেন বাড়ীর ছেলের ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলেন।

ইনিই বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ in Calcutta (কলিকাতার) ইনিই মহেন্দ্র সরকারকে শিখান। সে কবে? এইটিন সেভেনটি ওয়ানে

(১৮৭১)। তা' হলে বায়ান্ন বৎসর হলো—only (মাত্র) ফিফ্‌টি-টু ইয়ারস্‌। এঁরা সকলেই ঐ দলের লোক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজ কি পূর্ণিমা? পূর্ণিমায় কি পূজো হয়?

বলাই—সত্য নারায়ণের পূজো।

শ্রীম—লোক কত আনন্দ করছে ঈশ্বরকে নিয়ে। তোমার পেটটা একটু পিট পিট করছে বলে অন্যরা আনন্দ করবে না?

বড় জিতেন—ঐটে কেন হয় মশায়? সর্বদাই কেন পূর্ণিমা থাকে না? অমাবস্যা কেন হয়? সহজানন্দ কেন হয় না?

শ্রীম—সে হয়। তাঁকে দর্শন করলে হয়। তখন কি হয়, শোন।

শ্রীম প্রশান্ত গম্ভীরভাবে গাহিতে লাগিলেন, স্বামীজীর রচিত প্রলয় সমাধির গান।

গান। নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াদল ছবি বিশ্ব চরাচর। ইত্যাদি।

'ছায়াদল' মানে এই সুখ দুঃখ—সংসার। সুখ দুঃখ কষ্ট, এ থাকবেই। এটা যাবে না যাবৎ শরীর আছে। কেবল যায় যখন ঐ অবস্থায় তিনি রাখেন, যা এই গানে আছে। সেখানে অহং নাই। তাই দুঃখ কষ্ট নাই। সুখও নাই,—এই বিষয় সুখ।

ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকলে এই সবই আছে। তাই ভক্তদের দুঃখ কষ্ট আছে। তবে এই দেখা—'আমি'টা কর্তা না হয়। 'আমিটা' ভক্তের 'আমি' দাস 'আমি' হয়ে থাকে—'আমি' তাঁর সন্তান।

বড় জিতেন (শ্রীমর কথা শেষ না হইতেই)—'উদারা মুদারা তারা তারাতে মিশায়।'

শ্রীম (বিরক্ত হইয়া)—মানুষগুলি লম্বা লম্বা কথা কয় কি জন্য? এই তো শরীর। তাতে আবার লম্বা লম্বা কথা কি করে কয়? এর ভিতর থেকে আবার লম্বা লম্বা কথা!

যদি বল, কেন বার হয় (লম্বা লম্বা কথা)? তার উত্তর বিকারের রোগী যে। বলে, এক জালা জল খাব। কেমন করে

বলে ? তেমনি এই। সকলেই বিকারগ্রস্ত। কামক্রোধাদিতে এই বিকার।

যদি বল, কেন সর্বদা ঠিক ঠিক কথা কয় না ? তার উত্তরও ঐ—বিকার !

কি আশ্চর্য ! মানুষগুলি মনে করে একটু কিছু হতে না হতেই আমার বুঝি সব হয়ে গেছে। এ-ও বিকার। যেমন পিঁপড়ে এক দানা চিনি মুখে করে নিয়ে যেতে যেতে মনে মনে ভেবেছিল, আবার এসে সমস্ত চিনির পাহাড়টা নিয়ে যাব (নয়ন হাস্য)।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমার একবার কলেরা হয়েছিল। তখন ওদিকে (শ্যামবাজার) স্কুলে পড়াই। ঠাকুর তখন অসুস্থ হয়ে শ্যামপুকুর এসেছেন। আমরা তখন মথুরবাবু ডেপুটির বাড়ীতে ছিলাম বাইরের ঘরে। ওঁদের বাড়ীতেও ছাত্র ছিল কিনা। তাই ওখানে আছি।

ছাত্ররাই সেবা করতো। একজন ছাত্রকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের বাড়ী কোথায় ? সে বললে, মধুপুরে। আমি বললাম, তোমাদের ওখানে পাহাড় আছে ? সে বললে, হাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ঝরণা আছে ? সে উত্তর করলে, হাঁ। বললাম, আমায় নিয়ে যাবে ? আমি ঝরণার নিচে মাথা রাখবো। আর মাথায় জল পড়বে। নিয়ে যাবে তো ? সে বললে, হাঁ (হাস্য)।

ছেলেটি ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে বিকার থেকে এসব বলছে। তা' নইলে অমন ditto (বার বার সম্মতি) দিয়ে গেল ?

আর একটি ছেলে ব্রাহ্মণ। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের বাড়ীতে অনেক রান্নাবান্না হয় ? আমায় খেতে দিবে ? সে-ও জলীয় জিনিসেরই কথা সব (হাস্য)।

আর একটি ঘটনা। একদিন বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। কেউ নাই কাছে। একজন লোক এলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বাড়ী কোথায় ? তিনি বললেন, সিলেট। আমি বললাম আপনাদের

ওখানে কমলা লেবু পাওয়া যায়? উনি উত্তর করলেন, হাঁ। আমি বললাম, আমায় কয়টা দিবেন? উনি হয়তো শুনেই অবাক। বেলেঘাটার ওখানে থাকতেন। শেষে কারও সঙ্গে দেখা হলে, হয়তো আমার প্রকৃত অবস্থার কথা জেনে থাকবেন।

এমন অবস্থা আমাদের। এর ভিতর থেকে মানুষগুলি কি করে আবার লম্বা লম্বা কথা কয়? আশ্চর্য হয়ে যাই, দেখে।

বড় জিতেন (আস্তে আস্তে)—মশায় নিরুপায়।

শ্রীম (নয়ন হাস্যে)—হুঁ! জাগা থাকতেই এই অবস্থা। আবার নিদ্রায় কি হয় দেখ না। ঠাকুর বলতেন, তখন মুখে মুতে দিলেও টের পায় না, হুঁস নাই। আবার লম্বা লম্বা কথা (হাস্য)। তখন হয়তো চা খাচ্ছে বলে, একটু একটু খেয়েও ফেলে (শ্রীম ও ভক্তদের হাস্য)।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমরা কি করে এসব বুঝতে পারছি? (আকাশ ও তারা দেখাইয়া) ঐ রয়েছে বলে। দেখুন দেখুন, কি আশ্চর্য! ঐ (ঈশ্বরের) সম্বন্ধে আমাদেরও যা দশা এদেরও তাই। 'দাদারও ফলার।'

আমরা বলে দিলুম, দেখবেন এ কথা ঠিক কিনা। যখন ওখানে (ঊর্ধ্বলোকসমূহে) যাবেন (হাস্য), তখন দেখবেন, 'দাদারও ফলার।'

আমরা এইটা বুঝেছি, ওখানেও তাই। মিলিয়ে নেবেন তখন (হাস্য)।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
২৮শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। শনিবার, পূর্ণিমা ১৬ দণ্ড। ৩৯ পল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জৈন মন্দিরে ও পুনরায় গৌড়ীয় মঠে শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। নিম্নতল। রবিবাসরিক সৎপ্রসঙ্গ সভা শেষ হইয়াছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে ডাকাইয়া আনিলেন শান্তিকে দিয়া। অন্তেবাসী রাস্তার অপর পারের মেসে গিয়াছিলেন। এখন সকাল সাড়ে নয়টা।

কথামৃত তৃতীয়ভাগ ছাপা হইতেছে। প্রুফ আসিয়াছে ১৮৫-২০০ পৃষ্ঠা। অন্তেবাসী শান্তির সহিত প্রুফ দেখিতেছেন। সিঁড়ির ঘরে এগারটার সময় ঐ প্রুফ লইয়া অন্তেবাসী শ্রীমর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম খাটে বসা পশ্চিমাস্য।

শ্রীম অন্তেবাসীকে কতকগুলি কথামৃত দিলেন দ্বিতীয় ভ্যগ। এইগুলি অসম্পূর্ণ। তাই অতিরিক্ত ফর্মা ছাপান হইয়াছে। সেইগুলি সংযুক্ত করিয়া বইগুলি complete (সম্পূর্ণ) করিতেছেন অন্তেবাসী। ইনি বসা বেঞ্চেতে শ্রীমর বিছানার দক্ষিণে। বেলা দুইটায় ঐ কাজ শেষ হইয়াছে।

অন্তেবাসী ছাদে নিজের কুটির টিনের ঘরে বিশ্রাম করিতে ঢুকিয়াছেন। অমনি আসিল দপ্তরী। তাহাকে লইয়া পুনরায় গেলেন শ্রীমর ঘরে। শ্রীম বলিলেন, আপনি kindly (দয়া করে) লিখে রাখুন কোন ফর্মা ক'টা কম হয়েছে।

এখন অপরাহ্ন ছয়টা। প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছাত্র আসিয়াছে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। বাড়ী ভাটপাড়া। শ্রীম ছাদে আসিয়া ছেলেটিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্বিতলে নামিয়া গেলেন হাত মুখ ধুইতে। একটু পর আসিলেন সুরেন গাঙ্গুলী, হাতে এক প্যাকেট ধূপ। তিনি যখন আসেন ধূপ লইয়া আসেন।

কিছুক্ষণ পর বেয়ারা দিলচাঁদকে দিয়া শ্রীম বলিয়া পাঠাইলেন

ছেলেটি যেন নিচে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করে। অন্তেবাসী বুঝিলেন শ্রীম হয়তো কোথাও যাইবেন। অথবা রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইবেন। তিনি তাই সকলকে লইয়া নিচে গেলেন।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে ফটকের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন আসিলেন ডাক্তার ও বিনয় মোটরে। ডাক্তার বলিতেছেন, গতকাল তাঁহারা গৌড়ীয় মঠে গিয়াছিলেন।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাথ দিয়া শ্রীম দক্ষিণ দিকে চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ। মেছুয়াবাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। বলিতেছেন, আজ আবার গৌড়ীয় মঠে গেলে হয়। তা' হলে 'প্রভু'কে দর্শন হয়। তাহাই স্থির হইল। ফিরিয়া আসিয়া মর্টন স্কুলের ফটকের সামনে মোটরে বসিলেন। সুরেন গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা কখনো গৌড়ীয় মঠে গিয়েছেন কি? তা' না হলে একবার যাবেন। ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাটপাড়ায় আমাদের কেউ ললিত রায় মশায়কে জান? ছেলে বলিল. আজ্ঞে হাঁ। শ্রীম কহিলেন, তাঁকে আমাদের নমস্কার দিও। আর তুমি আবার এসো। ছেলে বলিল, আজ্ঞে আচ্ছা। সে চলিয়া গেল।

মোটরে শ্রীম বসিয়াছেন পিছনের সিটে ডান হাতে, ডাক্তার বাম হাতে। বিনয় ড্রাইভারের পাশে। জগবন্ধু বসিলেন পিছনে বেবি-সিটে শ্রীমর সম্মুখে। মোটর মাণিকতলা দিয়া চলিতেছে। তারপর গৌড়ীয় মঠের সামনে দিয়া জৈনতীর্থ পরেশনাথের মন্দিরের ফটকে গিয়া দাঁড়াইল। বহু অর্থব্যয়ে রাজা বদ্রীদাস এই মন্দির স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীম দক্ষিণ দিক দিয়া ঢুকিলেন। এইবার পশ্চিমে ফিরিয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছেন। ডান হাতে একটি বালকের প্রস্তরমূর্তি। শ্রীম উহা দেখিয়া বলিলেন, বাঃ বেশ সুন্দর তো! এখন জুতা নিচে রাখিয়া সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়াছেন। শ্বেত মর্মরে মোড়া সব।

মন্দিরের ভিতরে পরেশনাথের মর্মর মূর্তি, পূর্বাস্য। শ্রীম যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর প্রদক্ষিণের পথে দক্ষিণের জানালা দিয়া পার্শ্ব হইতে দর্শন করিলেন। এখন সম্মুখে আসিয়া

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বুঝি বা সঙ্গী 'ইংলিশম্যান' ভক্তদের শিক্ষার জন্য এই প্রণাম। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'— মহাপুরুষগণের ইহাই সনাতন রীতি।

সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া শ্রীম দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন। ঠিক বাম হাতে মোড়ে একটি ১৪।১৫ বছর বয়স্ক বালক দাঁড়াইয়া আছে। বালকটি দেখামাত্রই শ্রীম ও ভক্তদের সকলকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেছে। অন্তেবাসী বলিতেছেন, এ মর্টন স্কুলে পড়ে, থার্ড ক্লাশে, নাম মলয় দাস। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে সস্নেহে কথা কহিতেছেন। বলিলেন, তুমি গৌড়ীয় মঠে যাও না ? ছেলে উত্তর করিল, এই উৎসব হয়ে গেল, তখন গিছলাম। শ্রীম আবার বলিলেন, শুধু উৎসবে যাও ? অন্য সময়ও মাঝে মাঝে যেতে হয়।

শ্রীম পূর্বমুখী চলিতেছেন। কোণে একটি প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া তিনি বলিলেন, এসব বিলিতি ছবি। বাঁ দিকের উদ্যানের মধ্যে প্রথম রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিয়া আর একটি প্রস্তরমূর্তি দেখিতেছেন। ইহা একজন দারোয়ানের মূর্তি। সে যেন দিবানিশি মন্দির ও উদ্যান পাহারা দিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইলে অন্তেবাসী বলিলেন, ঐ রাজা বদ্রীদাসের স্ট্যাচু। শ্রীম কাছে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিতেছেন।

ইহার পর শ্রীম উত্তর পার্শ্ব দিয়া সোজা পুকুরের সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর উত্তর দিক দিয়া পুকুর প্রদক্ষিণ করিয়া অপর মন্দিরে যাইবেন শ্রীম। ইহাও জৈন মন্দির। বাগানের পূর্ব-উত্তর কোণে খেলিতেছে ছেলেমেয়েরা পরমানন্দে। ইহা দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, বাঃ, লোককে খেলতেও দিচ্ছে এখানে! বাগানের পূর্ব-উত্তর কোণে টবে অনেক বৃক্ষলতা দেখিতেছেন শ্রীম। বলিলেন, রাত্রে এরা কি বের করে —কারবন—কি ডাক্তারবাবু ? ডাক্তার বলিলেন, কারবন-ডায়ক্সাইড। শ্রীম ফটকের কাছে গিয়া দেখিলেন উহা বন্ধ। তাই ঘুরিয়া দক্ষিণ দিক দিয়াই বাহির হইলেন রাস্তায়।

পূর্বদিকে আর একটি বাগান আছে। তাহাতেও মন্দির। শ্রীম সেই বাগানে প্রবেশ করিলেন। জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ডান

ও বাঁ হাতের ছোট ছোট ঘরগুলি সব কি? জগবন্ধু উত্তর করিলেন, এ সব বিশ্রাম-ঘর, যাত্রীদের জন্য। এখানে রেঁধে খেতেও পারে। ডানের ঘরগুলি পুরুষদের জন্য। আর বাম-হাতের ঘরগুলি মেয়েদের জন্য। আপনি সেদিন কোথায় দেখেছিলেন, লোকেরা বসে খাচ্ছে, উৎসব হচ্ছিল?—শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। জগবন্ধু বলিলেন, এই ডান হাতের ঘরে। শ্রীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, শুধু বঙ্গালীরাই ছিল? জগবন্ধু বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ, কেবল বাঙ্গালীরাই ছিল।

উত্তরের সিঁড়ি দিয়া শ্রীম মন্দিরে আরোহণ করিলেন। বেশ উঁচু। এখানে গুরু-পাদপদ্ম পূজা হয়। শ্রীমর সহিত ভক্তগণও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মুখে অস্ফুট বাণী 'গুরুদেব গুরুদেব! শ্রীগুরু!' অল্পক্ষণ পর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়া শ্রীম নিচে নামিতেছেন। সম্মুখে মন্দিরের দারোয়ান। সে ভক্তিভরে যুক্ত করে শ্রীমকে প্রণাম করিল। তাহার শিরে রাজস্থানী পাগড়ী একনেত্র, বয়স পঞ্চাশ। অন্তেবাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাইয়া, অন্দর যা সকৃতা, কেয়া?—নেহি বাবুজী, দারোয়ান জানাইল।

নামিয়া সকলে জুতা পরিলেন। তারপর পুকুরের পাশ দিয়া পশ্চিম দিকের শেষ বীথিপথ দিয়া প্রথমে উত্তরে পরে পূর্ব দিকে সকলে চলিতেছেন—পুরোভাগে শ্রীম, তারপর জগবন্ধু, ডাক্তার ও বিনয় পর পর চলিতেছেন।

দ্বিতীয় মন্দির। ভিত্তি খুব উঁচু। শ্রীম ক্লান্ত হইয়াছেন। তাই সিঁড়ির নিচে বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। একটু পর সিঁড়ির নিচে দাঁড়াইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দর্শন হইল না। তখন ভক্তদের বলিলেন, যান আপনারা গিয়ে দর্শন করে আসুন। শ্রীম নিচে বসিয়াই ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। ভক্তগণ ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, চেষ্টা করে দেখা যাক্। এই বলিয়া খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন, ধীরে রেলিং ধরিয়া, পশ্চিমাস্য। জগবন্ধু, ডাক্তার ও বিনয় শ্রীমর সঙ্গে পুনয়ায় উঠিতেছেন।

এই মন্দিরও পূর্বাস্য। শ্রীম বারান্দায় বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

প্রণাম করিতেছেন। জগবন্ধু বলিলেন, ভিতরে আসুন। শ্রীম নাট-মন্দিরের ভিতর দিয়া গিয়া একেবারে বিগ্রহের পাশে দাঁড়াইয়াছেন, দর্শন করিতেছেন। জৈন মন্দির এ-টিও। এখানেও বিগ্রহ তীর্থঙ্কর পরেশনাথ মহাবীরই। শ্বেতমর্মর মূর্তি, কিন্তু দিগম্বর। দেয়ালে বিজলী জ্বলিতেছে।

চৌকাঠের পাশে একটি প্রণামী-বাক্স। তুইটি কর্মচারী প্রবেশ-দরজার তুই পাশে বসা। দক্ষিণ দিকে পুরোহিত আর উত্তরে ওড়িয়া মালী বসা। কিসের হিসাব-নিকাশ হইতেছে। পুরোহিতের হাতে একটি পুস্তক। ঢুকিবার সময় মালী হাতে ইসারা করিয়া বলিল, এখানে দাঁড়াইয়া দর্শন করুন—প্রণামী বাক্সের সামনে।

শ্রীম নিচে নামিয়া আসিলেন। সিঁড়ির নিচে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, বৃদ্ধ ও ক্লান্ত দেহে কেন বারবার এই ভূমিষ্ঠ প্রণাম! কেবল কি ভক্তদের শিক্ষার জন্যই এই দেহ-কষ্ট স্বীকার করিতেছেন? শ্রীমর মুখমণ্ডল দেখিয়া তো তা মনে হয় না? দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর সম্মুখে কিংবা ঠাকুরের বাসগৃহে প্রণাম করিবার সময় যে সরস আনন্দময় প্রেমপূর্ণ ভাব মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় এখানেও দেখিতেছি ঠিক সেই ভাব। তিনি কি মহাবীরের ভিতরও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেছেন!

শ্রীম ফটকের দিকে চলিয়াছেন। ফটকের তুই পার্শ্বে তুইটি ইষ্টক-নির্মিত বেঞ্চ। পূর্বদিকের বেঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তে বসিলেন শ্রীম পশ্চিমাস্য। ঐ বেঞ্চের উত্তর প্রান্তে বসিলেন অন্তেবাসী। পশ্চিমের বেঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তে বসিয়াছেন ডাক্তার কার্তিক বক্সী পূর্বাস্য, আর বিনয় বসিয়াছেন উত্তর প্রান্তে।

শ্রীমর শরীর ক্লান্ত। কিন্তু আনন্দময়। বুঝি বা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত। ধীরে ধীরে একটি ভক্তকে বলিতেছেন, ঠাকুর এমনি একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন তাতে সবাইকে আপন মনে হয়। কোথায় পর? কে পর? সবই যে তিনি! তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

আবার তিনিই জীবজগৎ। আবার তিনিই মানুষ হয়ে আসেন যুগে যুগে। এখন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। কার সাধ্য তাঁকে চেনা! তিনি কৃপা করে তাঁর স্বরূপ দেখিয়েছিলেন ভক্তদের। ভক্তরা দেখে অবাক্। ধাঁধা লেগে গিছলো। এক দিকে এই মানুষ, পুরোহিত আবার ল্যাংটা। আর অন্য দিকে—সচ্চিদানন্দ। এ রূপ দেখলে আর কিছুই ভালই লাগে না। তাই দেখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু জীব-জগৎকেও ভাল লাগে। কারণ তাঁকেই যে দেখতে পায় এ সবার ভিতর। তাই এখানে নিয়ে এসেছেন। এ সবই তাঁরই বিভূতি। তাই অত আপনার বলে বোধ হচ্ছে।

পাশেই গুরুমন্দির। ঘড়িতে দেখা যাইতেছে সাতটা বাজিয়াছে। শ্রীম ফটকের বাহিরে আসিয়াছেন রাস্তায়। পশ্চিমের দিকে চলিতেছেন। ডান হাতে পরেশনাথের মন্দির। বাম হাতে একটি মন্দির। এখানে আরতি হইতেছে। শ্রীম বলিলেন, আরতি হচ্ছে। এই বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। পায়ের কাল চটি-জুতা পা হইতে আলগা হইয়া গেল। রাস্তায় দাঁড়াইয়া যুক্তকরে আরতি দর্শন করিতেছেন। কিছুকাল দর্শন করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন— সম্মুখেই মোটর। শ্রীম ও ভক্তগণ মোটরে চড়িলেন। মোটর গৌড়ীয় মঠের দ্বারে উপস্থিত।

২

গৌড়ীয় মঠ। দক্ষিণ দরজায় সামনে দাঁড়াইয়া আছে মোটর। একটি বৈষ্ণব সাধু 'ডোর লাইট' (door light) জ্বালাইয়া দিল। ডাক্তার আগে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। শ্রীম গাড়ী হইতে নামিয়াছেন। হাতে ধূপের প্যাকেট। কিছুক্ষণ পূর্বে সুরেন গাঙ্গুলী এই ধূপ দিয়াছেন। শ্রীম বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দরজা দিয়া। যিনি আলো জ্বালিয়াছিলেন সেই সাধুর হাতে ধূপের প্যাকেট দিয়া বলিলেন, গৌরাঙ্গকে দিবেন। তাহার পর ঐ ঘরের উত্তর দিকের পশ্চিমের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গ্যালারীতে দাঁড়াইয়া সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন

করিতেছেন। অনেক লোকের ভীড় হওয়ায় শ্রীম ডানপাশে সরিয়া গেলেন। আর মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেবদর্শন করিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি এক গজ লম্বা। কাষ্ঠ বিগ্রহ। সুন্দর রঙ করা। আর একদিন রাজবেশ ছিল। আজ সে বেশ নাই। আরতি হইবে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। পূজারী ব্রহ্মচারী। প্রথমে ধূনা, তারপর শঙ্খজল, চামর, পাখা, পঞ্চ প্রদীপ ও গন্ধপুষ্পে পরপর আরতি সমাপ্ত হইল। দুইটি খোল ও কয়েক জোড়া করতাল বাজিতেছে। একজন খোলবাদক মত্ত হইয়া নানা ঢং-এ খোল বাজাইতেছে। আরতি শেষ হইলে শ্রীম ও ভক্তগণ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন।

শ্রীমর ইচ্ছা মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুকে দর্শন করেন। একজন সাধু একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। শ্রীম ঘরে গিয়া শতরঞ্জির উপর বসিয়াছেন। সাধু ব্রহ্মচারীগণ বন্দনা পাঠ করিতেছেন। ঘরে গরম। শ্রীম ঘামিতেছেন।

প্রথমে চৈতন্যদেবের স্তুতিপাঠ হইল। তারপর গুরু পরম্পরার প্রণাম। তারপর নরোত্তম দাসের পদাবলী। জগবন্ধু ও বিনয় উঠিয়া গিয়া 'প্রভু'র দর্শনের ব্যবস্থা করিলেন। একজন সাধু সঙ্গে করিয়া শ্রীম ও ভক্তগণকে দ্বিতলে লইয়া গেলেন।

প্রভুর বাসগৃহ অতি সুন্দর ও সৌষ্ঠবযুক্ত। পশ্চিমদ্বারী। দক্ষিণে ছাদে যাইবার আর একটি দরজা আছে। গৃহের পূর্বদিকে দুইটি ও উত্তরে একটি জানালা, কিন্তু বন্ধ। ঘরের দেয়ালে নীল আস্তর। বিজলীর আলোকে গৃহ উজ্জ্বল।

পূর্বদিকের টেবিলে পুস্তক ও একটি আয়না। আর দেশলাইর বাক্স। পাশে একটি দামী কুশন চেয়ার। গৃহের উত্তর দিকে 'প্রভু'র পালঙ্ক। তাহাতে গদী, তাহার উপর শীতল-পাটি। পালঙ্কে মশারী খাটান রহিয়াছে। বিছানার উপর একটি তাকিয়া আর পশ্চিমে শিয়র-বালিশ। বিছানার পশ্চিম দরজার পাশে সুইচ, দেয়ালে ক্যালেণ্ডার নদীয়ার ভাগবত প্রেসের। উপরে একটি সিলিং ফ্যান। গৃহের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। তাহার উপর টেলিফোন। বিছানার সামনে ছোট দামী একটি

কার্পেট। তাহাতে 'প্রভু' বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। তাঁহার হাতের পাশেই একটি চলমান বৈদ্যুতিক ল্যাম্প। আর ডান হাতে চৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থ পূর্ব-পশ্চিমে সাজান রহিয়াছে। দোয়াত কলমাদি লিখিবার সরঞ্জামও হাতের কাছে রহিয়াছে। তাঁহার পিছনে টেবিলের নিচে তোষকাদি বিছানার মোড়ক।

প্রভুর মস্তক মুণ্ডিত। হাতে হরিনামের ঝুলি। কপালে চন্দনের তিলক, কণ্ঠে পাঁচলহর তুলসীর মালা। মালাগুলির রং প্রায় কাল। গায়ে একটি পাবনাই গেঞ্জি। গলার যজ্ঞসূত্র গেঞ্জির ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। পরণে গৈরিক। এক টুকরা গৈরিক বস্ত্র উত্তরীয়রূপে দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্ন দিয়া বাম স্কন্ধের উপর গ্রন্থিবদ্ধ।

তাঁহার শরীর পাতলা কিন্তু দীর্ঘাকৃতি। গায়ের রং শ্যাম বর্ণ। বয়স পঞ্চাশের উপর। উপরের মাড়িতে দাঁত নাই। তিনি কার্পেটে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন।

শ্রীম ও ভক্তগণ 'প্রভু'কে প্রথমে যুক্তকরে, তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম বসিলেন দক্ষিণ ও পশ্চিম দরজার মাঝখানে প্রভুর সম্মুখে। 'প্রভু' যুক্তকরে প্রতিনমস্কার করিলেন। বিনয় ও ডাক্তার বসিলেন পশ্চিম দরজার নিকট উত্তরাস্য। আর জগবন্ধু বসিয়াছেন শ্রীমর ডান হাতে। দক্ষিণ দরজার সামনে বসা একজন নেড়া বাবাজী। তাঁহার পূর্বদিকে বসা একজন যুবক, গৌরবর্ণ। বয়স ত্রিশ। হাতে রিস্টওয়াচ আর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। আর পূর্ব দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন একজন স্থূলকায় বৈষ্ণব। তাঁহার বয়স চল্লিশের উপর। মুখটি গোলাকার। তাঁহার ভুঁড়ির উপর দিয়া যজ্ঞসূত্র লম্বমান। তাঁহার হাতেও হরিনামের ঝুলি। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের দক্ষিণপ্রান্তে একজন যুবক ব্রহ্মচারী বসা। তিনিও সশিখ মুণ্ডিতশীর্ষ। চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। রং বেশ ফরসা। উপবীত ভুঁড়ির উপর ধবধব করিতেছে। সকলেই শান্ত। ব্রহ্মব্রতী। হাতে হরিনামের ঝুলি। মনে মনে জপ চলিতেছে। টেবিলের দক্ষিণে একজন যুবক ব্রহ্মচারী। তাঁহারও চক্ষুর উপর রোল্ডগোল্ডের চশমা। দরজার বাহিরে অনেকগুলি

সাধু ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেই উৎসুক, কথামৃতকারের সঙ্গে কি ঈশ্বরীয় কথা হয় তাহা শুনিবার জন্য। এইবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (প্রভুর প্রতি)—দু' বৎসর পূর্বে আর একবার আপনাকে দর্শন করেছিলাম।

প্রভু—আজ্ঞে হাঁ, কৃপা করে এসেছিলেন। (মুখে মৃদু জপ চলিতেছে।) আপনার ওখানে (মর্টন স্কুলে) শিক্ষক ছিলেন মহেন্দ্রবাবু। তিনি এখন এখানকার সাধু। সম্প্রতি তিনি তীর্থ করতে বের হয়েছেন। আজকাল দক্ষিণে রামেশ্বর গেছেন।

চশমাপরিহিত ব্রহ্মচারী যুবক—সঙ্গে আমাদের আরও তিন জন সাধু রয়েছেন।

শ্রীম—হয়তো চৈতন্যদেব যে যে স্থানে গিছলেন সে সব স্থান দর্শন করবেন।

প্রভু (সহাস্যে)—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম—আহা, আপনাদের দেখলে চৈতন্যদেবের সময়ের একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যায়। আপনারা এই মঠটি করায় লোকের কত উপকার হচ্ছে।

পরমহংসদেব বলতেন, কারো ঘড়ি ঠিক চলে না। এক সূর্য ঠিক। কিন্তু সকলেই বলে আমার ঘড়ি ঠিক। তবুও আপনাদের দেখলে একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যায় ঈশ্বরের।

এই কলকাতা সহরের বড়ই উপকার হচ্ছে। আপনাদের দেখে উদ্দীপন হচ্ছে। আপনাদের দেখলে কি মনে হয় ? না, এঁরা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে খালি ঈশ্বরকে ডাকছেন।

রিস্ট-ওয়াচওয়ালা ভক্ত—যাদের মন ঈশ্বরেতে গেছে তাদের অন্য সব ভাল লাগবে না।

মোটা ভক্ত—তারা বিষয় নিয়ে থাকলেও অন্য লোকের মত নয়।

শ্রীম—চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর কথা অত শুনেও কেন তা' ধারণা করতে পারে না। চৈতন্যদেব বললেন, তারা যে যোষিৎসঙ্গ করে। তাই ধারণা করতে পারে না।

আপনারা কত সব ছেড়েছেন তাঁকে ডাকবেন বলে। আপনাদের দেখে ঈশ্বরের উদ্দীপন হবে না তো কি ?

আশ্রমবাসী একজন কতকগুলি রিপোর্ট ও মঠ-সাহিত্য শ্রীমর হাতে দিলেন। তিনি ঐগুলি প্রণাম করিয়া হাতে রাখিলেন।

শ্রীম (প্রভুর প্রতি)—পরমহংসদেবের সঙ্গে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মিলন হয়েছিল কি ?

প্রভু—আজ্ঞে হাঁ। একবার দেখা হয়েছিল রাম দত্তের বাড়ী।

শ্রীম—আজ্ঞে হাঁ। রামচন্দ্র দত্ত পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

প্রভু—এই মঠ প্রতিষ্ঠার বিশেষ কারণ আছে। আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্তাভজা, নবরসিক, এইরূপ নানা দল দ্বারা চৈতন্যদেবের ভাব বিকৃত হয়েছে দেখে, তাঁর ঠিক ঠিক ভাব প্রচারের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শ্রীম—কলকাতার বড়ই উপকার হলো। আপনাদের দেখে চৈতন্যদেবের উদ্দীপন হবে।

অন্য লোক কি নিয়ে আছে কি করছে! কেহ পাণ্ডিত্য, কেহ নাম যশ, কেহ অন্য কিছু নিয়ে রয়েছে। আপনারা তা' নন। আপনারা সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে রয়েছেন।

পরমহংসদেব বলতেন, চিল শকুন খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে। তেমনি পণ্ডিতগুলো। বড় বড় কথা কয়, অনেক বুলি আওড়ায়। কিন্তু, দৃষ্টি ভাগাড়ে, মানে কামিনীকাঞ্চনে।

প্রভু হাতের মালাতে জপ করিতেছেন। ঠোঁট নড়িতেছে। মাঝে মাঝে কথাও কহিতেছেন।

প্রভু (শ্রীমর প্রতি)—যারা ভগবানকে যথার্থভাবে ডাকে এই প্রকার লোক সহরেও আছে, আবার পল্লীগ্রামেও আছে। পল্লীগ্রামেই ঐ ভাব যথার্থ হবার কথা হলেও যে-সে খানে সর্বস্থানেই এবম্প্রকার লোক পাওয়া যায়, তা' নয়।

আজ কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচার ধারা।

প্রভু—শ্রীপ্রবোধানন্দ বলে একজন রামায়তী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি শ্রীরঙ্গমে থাকতেন। তাঁর নিবন্ধের শেষে বলেছেন, শ্রীচৈতন্যের কৃপা না হলে, ভক্তি প্রেম কিছুই হবে না। তিনি চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে বন্দনা করেছেন। ইহাই জীবের লক্ষ্য।

সাংখ্যদর্শনকার কপিল ইহা বুঝতে পারেন নাই। সাংখ্যবাদীদের মত—প্রকৃতিকে পুরুষে মিলিয়ে দেওয়া। এটাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্যগণ তা গ্রহণ করেন না।

শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব) বলেছেন এই প্রকার cessation of conception and perceptionই (সকল প্রকার কল্পনা ও বস্তুজ্ঞানের অবসানই) পরম পুরুষার্থ। ইহাই মানুষের চরম লক্ষ্য বলে তিনি নির্দ্ধারিত করেছেন। বাসনার নিবৃত্তি তাঁর মতে কাম্য। এই জগৎ কিছু নয়, ভক্তও কিছু নয়। এই মতও প্রবোধানন্দ গ্রহণ করেন নাই।

পাতঞ্জল-দর্শনের মত—কৈবল্যমুক্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য। এই মতও বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন না। যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম ধ্যানধারণা সমাধি ইত্যাদিতে কিছু হয় না, ঈশ্বরের সেবা না করলে শুধু এসবে কিছুই হবে না। তাঁর সেবা করতে করতে তাঁ'তে প্রীতি হয়। এই ভালবাসাই চরম লক্ষ্য। শুষ্ক যমনিয়মাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ চরম লক্ষ্য হতে পারে না। বৈষ্ণবগণ এ ভাবের বিচারও গ্রহণ করেন না।

আবার যারা সকামভাবে গণেশের পূজা করে, কি শক্তির পূজা করে, তারাও ঠিক পথ দেখতে পায় না। তারা ভোগের জিনিস চায়। এই সব পূজা দ্বারা মুক্তি চায়। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তা' চান না। তাঁরা

মুক্তি চান না। মুক্তিও সকাম। এই সব সকাম পূজক ঐশ্বর্য নিয়ে ব্যস্ত।

আবার শঙ্করাচার্য বলছেন, রূপরসাদির বাইরে চলে যাওয়াই চরম লক্ষ্য। ইনি উহাকে সমাধি নাম দিয়েছেন। জীবের ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি বলেছেন একে। সমাধি কি? সেও যে সকাম।

শ্রীচৈতন্য জীবের স্বরূপনির্ণয় করেছেন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।' একজন মানুক, আর নাই মানুক সে কৃষ্ণের নিত্য দাস।

শ্রীপ্রবোধানন্দ এই সিদ্ধান্ত করেছেন সব পথ বিচার করে। শ্রীচৈতন্যদেব যা বলে গেছেন তা' ছাড়া জীবের উপায় নাই।

প্রভু খুব সাধু ভাষায় কথা কন। বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ। দাঁতের ফাঁক্ দিয়া বায়ু নির্গত হইয়া উচ্চারণ কখন বিকৃত হইয়া যায়। যথেষ্ট পড়াশোনা আছে। মাঝে মাঝে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। কখনও অতি সহজ ও সরল ভাবটি শব্দারণ্যে পড়িয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

প্রভু—বেদান্তে উপনিষদে যা বলা হয়েছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদি, তাও শ্রীচৈতন্যদেবের পথ নির্দেশ করতে পারে নাই। এই প্রকার শ্রীপ্রবোধানন্দ বিচার করেছেন।

শ্রীম—শ্রীরামপ্রসাদ বলেছিলেন, 'ভুক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি।'

প্রভু—না, সে যে আর এক রকম বিচার। ওঁরা যে শক্তি, বৈষ্ণব নন।

প্রভু—Empericist-দের (প্রত্যক্ষবাদী) বৈষ্ণব প্রবোধানন্দ মানেন নাই। কি করে তারা ভগবানের বিষয় জানবে? Idealist-দেরও (মায়াবাদী) বৈষ্ণবগণ মানেন না। কি করে ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে?

শ্রীচৈতন্যদেব চরম লক্ষ্য নির্ণয় করেছেন—'জন্মনি জন্মনি ভক্তিরহৈতুকীং ত্বয়ি'। এই শেষ কথা।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে পৌনে নয়টা পর্য্যন্ত প্রভুর সিদ্ধান্তনির্ণয় বিচার-প্রবাহ চলিতে লাগিল। এক একবার বেশ উদ্দীপিত হইয়া

কথা বলেন। মাঝে মাঝে শ্লোক ভুলিয়া গেলে, সমীপবর্তী ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা তাহা উদ্ধার করিতেছেন।

একটি শ্লোক বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রভু—এটি শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্লোক। ভাবার্থ এই—ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে সংসারে থাক। আর সৎসঙ্গ কর। তাঁর কৃপা হলে তিনি বিষয় থেকে মন তুলে নেবেন।

প্রভু প্রবোধানন্দের আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

প্রভু—এই দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীপ্রবোধানন্দ বলছেন, যে ব্যক্তি—জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ আর কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ—একই মনে করে সে ব্যক্তি এখনও ভক্তির অধিকারী নয়। এখনও সে অজ্ঞানে।

যেমন এক পিতার দুই পুত্র। একজন চোর বলে জেল খাটছে। আর একজন ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত। এই দুইজনের ভিতর যে তফাৎ দেখে না, ভক্ত ছেলে ও অভক্ত ছেলেকে যে এক দেখে, যে গিল্টি করা সোনা আর খাঁটি সোনাতে পার্থক্য আছে বলে বুঝতে পারে না, যে বাইরের চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হয়, তার কখনও কৃষ্ণভক্তি হয় নাই—বুঝতে হবে।

শ্রীম (সবিনয়ে যুক্তকরে)—আজ অনেকক্ষণ ধরে বলে বলে ক্লান্ত হয়েছেন। আজ বিদায় দিন।

কথাস্রোত বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু জপ করিতেছেন। জপের একটি উত্তম ফল দেখা যাইতেছে। অতি উত্তেজনাপূর্ণ কথাতেও প্রভুর মুখমণ্ডলে স্বাভাবিক ভাব বিদ্যমান।

শ্রীম ও ভক্তগণ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। রিস্ট-ওয়াচওয়ালা গৃহস্থ ভক্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্রীমর সহিত কথা কহিতেছেন।

ভক্ত (শ্রীমর প্রতি)—আসবেন মাঝে মাঝে। তা' হলে বুঝতে পারবেন। আলোচনা না হলে কি করে বোঝা যায়।

শ্রীম—লেকচারে কি হয়? আপনাদের দর্শনেই চৈতন্য হয়ে যায়।

অপর শিষ্য—আলোচনার দরকার নাই? তা' নইলে ঠিকমত বোঝা যাবে না যে।

প্রভু—চৈতন্যদেব বলেছেন, সর্বদা কৃষ্ণকথা আলোচনা করবে।

শ্রীম—হাঁ। আপনাদের দর্শনেই এই, শুনলে না জানি কত।

প্রভু (ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া)—এখানে বলা হয়েছে, যে ঐ পথের লোক, যে সর্বদাই ঐ নিয়ে আছে তার মুখে শুনলে ভাল। অন্যের নিকট শুনলে বিষয়ের কথা নিয়ে আসবে।

শ্রীম—এই আশীর্বাদ করুন যেন শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ হয়।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে নিচে নামিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিতেছেন। বাহিরের ঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মেঝেতে বসিয়া একজন সাধু ভাগবত পাঠ করিতেছেন। বয়স ২৭।২৮, গৌরবর্ণ, বি. এ. পাশ। সামনে বসিয়া আর সব সাধুরা পাঠ শুনিতেছেন। কাহারও পরনে গৈরিক, কেহ শুভ্র বস্ত্র পরিহিত। সকলেই মুণ্ডিতশীর্ষ শিখা সূত্রধারী। হাতে মালার আধারী। ঠোঁট নড়িতেছে। ভাগবত শ্রবণ ও নাম জপ একসঙ্গে চলিতেছে। বেশ উদ্দীপক।

শ্রীম বাহিরে আসিয়াছেন। মঠবাসী কয়েকজন সাধু ও ভক্ত শ্রীমর সহিত বাহিরে আসিয়া বিদায় দিতেছেন।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে মোটরে বসিয়াছেন। পুনরায় যুক্তকরে সাধু ভক্তদের নমস্কার করিতেছেন।

মোটর চলিতেছে। শ্রীম খুব অস্বস্তিবোধ করিতেছেন। বৃদ্ধ শরীর। উন্মুক্ত বায়ুতে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিতেছেন, বাবা কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গেছে। পণ্ডিতরা বুঝি এই রকম করে? এই সাধ ছিল দেখা হয়ে গেল। সব কি আর মিলে? যেখানে যতটুকু মধু মিলে সেটুকু নেওয়া। আহা, এঁদের দেখে চৈতন্যদেবের উদ্দীপন হ'ল—পুরীতে ভক্তসঙ্গে হরিনামে বিভোর। এইটি প্রধান লাভ।

মোটর চলিতেছে। একটি ভক্তের মনও চলিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে দেখেছিলেন চৈতন্য সংকীর্তনে এই সাদা চোখে। আবার চৈতন্যভাগবত পাঠ শুনিয়া বলিয়াছেন,

গাহিলেন। তারপর শ্রীম তিনটি গান গাহিলেন। সবই ঠাকুরের গান।

গান। ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। ইত্যাদি

গান। কবে হবো সমাধি মগন। ইত্যাদি

গান। রাধার নামে। ইত্যাদি

এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সমাধি মানে হলো, আর দরকার নাই এটার (সংসারের)। সমাধি না হলে এটা ছাড়া যায় না। যতক্ষণ life (জীবন) ততক্ষণ জগৎ। সমাধির অর্থ এটা ছেড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তখন আর জগৎ নাই। একটু নিচে থাকলেই জগৎ মানতে হবে। জগৎ মানলেই এদিককার সবই মানা হয়ে গেল। তখন এ কিছু নয় বলার যো নাই।

সমাধি, এ কি ভাবে হয় ? তাঁর কৃপা হলেই ইহা সম্ভব হয়। কেবল পুরুষকারের দ্বারা সমাধি হয় না। তাই কৃপা চাই। তবে পুরুষকার থাকলেই sincere (সত্যিকার) চেষ্টা হয়। তবেই কৃপা হওয়ার সম্ভাবনা। কৃপা হবেই, এ কথা বলা চলে না। কে বলবে এ কথা ? তিনি কি জগতের মালিক ? যদি তা' না হয় তবে আর কি করে বলবেন ? এই মাত্র বলা এই পথে ঋষিগণ, অবতারগণ গিয়েছেন, তাই আমাদেরও উহা অনুসরণ করা উচিত।

সমাধি তো হচ্ছে না। এখন কি নিয়ে থাকা ? জগতের সব রকম forces (শক্তিসমূহ) কাজ করছে। কতক ভাল কতক মন্দ ঠাকুর বলেছেন, ভালটা নিয়ে থাক। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, তাঁর নামগুণ কীর্তন এসব নিয়ে থাক। তাই বলেছিলেন, এক হাতে ঈশ্বরকে ধর, অন্য হাতে সংসার কর। সময় হলে দুই হাতে তাঁকে ধরতে পারবে। এই সাধুসঙ্গাদি সাধনই ঈশ্বরকে এক হাতে ধরা। তাঁর কৃপা না হলে জগৎ ছাড়ার যো নাই, সমাধি হবে না। সেই অবস্থায় সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য নিয়ে থাকা। ভক্তি ভক্ত সাধুসঙ্গ জপ ধ্যান পূজা পাঠ এইসব।

ঠাকুর ভক্তদের পথ আরও সোজা করে দিয়েছেন। বলেছেন, আমায় ধর। আমার চিন্তা কর। আমি কে, আর তোমরা কে, এটা

জানলেই হবে। অত শত করতে হবে না। অর্থাৎ আমি ঈশ্বর, অবতার হয়ে এসেছি আর তোমরা আমার আশ্রিত সন্তান। তা'হলে অত শত ভাবতে হবে না। এটা যেন অকুল সংসার-সমুদ্রে ভেলা।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি)—এই যে চৈতন্য, এটা দু'টো জিনিস মিলে হচ্ছে। একটা বাইরের একটা ভিতরের। কোন্‌টা বাদ দিবে? এ দু'টো নিয়ে life (জীবন)।

বর্ষা আসিয়াছে। কথাও বন্ধ হইয়াছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট জলে ডুবিয়া গিয়াছে। শ্রীমর ভাবনা, কি করিয়া অভয়বাবুকে গৃহে পাঠান যায় সুকিয়া স্ট্রীটে। ঠিক হইল রিক্সাতে পাঠান। এখন রিক্সা পাওয়া কঠিন। একজন ভক্ত বাহির হইয়া গেলেন। জলে ভিজিয়া হ্যারিসন রোড হইতে দুইটি রিক্সা লইয়া আসিলেন। একটিতে গেলেন অভয়বাবু, সঙ্গে ছোট রমেশ। শ্রীম ছোট রমেশকে বলিয়া দিলেন অভয়বাবুকে বাড়ীর ভিতর রেখে, তারপর তুমি বাড়ী যাবে। অন্য রিক্সাতে গেলেন জিতেনবাবু। প্রভাস জগবন্ধুর সঙ্গে সম্মুখের মেসে খাইয়া রাত্রিতে মর্টন স্কুলেই রহিয়া গেল।

২

মির্জাপুর পার্ক। অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটা। শ্রীম আজও খদ্দর প্রদর্শনী দেখিতেছেন। এই আন্দোলনটি শ্রীমর প্রিয়। গতকালও আসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আসিয়াছেন সাহস করিয়া পায়ে হাঁটিয়া—সঙ্গে অন্তেবাসী। অতি নিবিষ্ট মনে সব দেখিতেছেন। বাংলার নানা স্থান হইতে নানা রকমের খদ্দর আসিয়াছে—সূতা, বস্ত্রাদি। নানা রং।

শ্রীমর ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, কৌতুহলের পশ্চাতে কি যেন একটা প্রাচীন গভীর ভাবের উন্মেষ হইয়াছে এই প্রদর্শনী দেখিয়া। তিনি প্রাচীন ভারতের রূপ চিন্তা করিতে ভালবাসেন—ঋষিদের ভারত। কখনও তাঁহার কল্পনাপ্রিয় মন পৌরাণিক ভারতে ভ্রমণ করে। কালিদাসের বর্ণিত কণ্বমুনির আশ্রম শ্রীমর একটি অতি প্রিয় ও পবিত্র বিশ্রাম-ভূমিকা। কত রঙ্গে, কত রসে রসায়িত করিয়া উহার বর্ণনা-

মাধুর্য নিজে উপভোগ করেন, আবার ভক্তগণকেও পরিবেশন করেন। যজ্ঞধূমাকীর্ণ তপোবনে তিনি প্রায়ই 'মনো'রথে যাতায়াত করেন। কখনও তপোবনের প্রশান্ত বাতাবরণে বসিয়া ধ্যানমগ্ন বনস্পতিদের সহিত ধ্যানমগ্ন হন। তাঁহার এই অতিমানবীয় কল্পনাশক্তি দিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরাধামে লইয়া আসিয়াছেন বেদব্যাসের ন্যায় অমর গ্রন্থ কথামৃত রচনা করিতে। আবার নারদের ন্যায় অহর্নিশ হরিগুণগান করিতে। তাঁহার রচিত কথামৃতরূপ গঙ্গায় আজ ভারতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত—তথা জগতে। অনেক সময় শ্রীম বলিয়া থাকেন—ভাব তো প্রাচীন ভারতের এই চিত্রটি। ঋষিগণ সর্বত্র ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন। জীবনধারণের জন্য বনজাত ফলমূল। আবার জনসাধারণ ও ঋষিদের জীবন্ত শিক্ষান্তে গৃহে থাকিয়াও প্রায় সন্ন্যাসী। রাজন্যবর্গ ঋষিদের সেবক, আজ্ঞাবহ দাস। তাঁহারা সব রাজর্ষি। ঋষিরূপে ভারতের সনাতন আদর্শ ঈশ্বরলাভ—মানুষ জীবনের সর্ব-শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করাইতেছেন। আবার রাজা-রূপে শিষ্টের পালন অশিষ্টের শাসন করিতেছেন। জনসাধারণ কৃষির সহায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। সমাজের প্রতি স্তরে দৈবী সম্পদের ছড়াছড়ি—

'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥'

শ্রীমর কল্পিত প্রশান্ত ভারত এখন অশান্ত। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বিদ্যা নাই, বাসগৃহ নাই। মহাত্মা গান্ধী ঐ প্রশান্ত ভারতকে নবভাবে ফিরাইয়া আনিতে ব্রতী। তাঁহার এই শুভ সংকল্পে ভারতের সকল মনীষী মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ সমর্থক। তাই গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত এই খদ্দর চরকা মহাযজ্ঞে শ্রীম বার বার আসিতেছেন আশা ভরসা ও প্রার্থনার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া। এই চরকা-প্রদর্শনী শ্রীমর নিকট প্রাচীন ও নবীন ভারতের ত্রিবেণীসঙ্গম। বার্দ্ধক্যবশতঃ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া আজও আসিয়াছেন এই ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করিতে। অনেকগুলি মানুষ এক সঙ্গে চরকা কাটিতেছেন

নীরবে। শ্রীমও নীরবেই দর্শন করিতেছেন এই মহাযজ্ঞ। কল্পনা ও বাস্তব, এই দুই ভাবই শ্রীমর নয়ন ও মুখমণ্ডলে প্রতিভাত।

পায়ে হাঁটিয়াই ফিরিয়া চলিলেন শ্রীম, আমহার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাথ ধরিয়া। হ্যারিসন রোডের মোড়ে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন, রাস্তা পার হইবেন। একজন লোক ফুটপাথে বসিয়া মাসিক বসুমতী বিক্রয় করিতেছে। অন্তেবাসী বলিলেন, এই যে বসুমতী। শ্রীম বলিলেন, হাঁ, এতেই বের হয়েছে আমাদের লেখা। বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? অন্তেবাসী কহিলেন, ইনি কথামৃতকার শ্রীম। সে যুক্ত-করে প্রণাম করিল। এই সংখ্যায় বাহির হইয়াছে—শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব আর স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নোংরা পথ—স্বামীজীর প্রতি এই উপদেশ।

মর্টন স্কুলের অঙ্গন। শ্রীম বেঞ্চে পশ্চিমাস্য বসিয়া আছেন। তিন দিকে ভক্তগণ বসা। এখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। ভক্তগণ পূর্ব হইতে এখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীম মির্জাপুর পার্কে গেলেন খদ্দরের প্রদর্শনীতে। ডাক্তার বক্সী মোটর লইয়া আসিয়াছেন। আজও তাঁহার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। বলিতেছেন, একবার বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গেলে হয়।

শ্রীম প্রায়ই বলিয়া থাকেন, এই কলকাতা সহরে কে কোথায় ভগবানকে নিয়ে কি করছে, কতভাবে ডাকছে—এক সঙ্গে সব সিনটা দেখতে আমার ইচ্ছা হয়।

শ্রীম আজও মোটরে বাহির হইলেন সঙ্গে ডাক্তার ও জগবন্ধু। সর্বাগ্রে ঠনঠনিয়ার মা কালীকে প্রণাম করিলেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে মোটর পশ্চিম ফুটপাথে। শ্রীম গাড়ীতে উঠিতেছেন, একজন মধ্য-বর্ষীয় ভদ্রলোক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। অতি দীন হীন ভাব। শ্রীম ও ভক্তরা কেহই তাঁহাকে চিনেন না।

বিবেকানন্দ সোসাইটি বাহাত্তর নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে অবস্থিত, পূর্ব ফুটপাথে। শ্রীম দোতলায় আরোহণ করিয়া সোজা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ

স্বামী রামানন্দ সংবাদ পাইয়া শ্রীমকে লইয়া গিয়া বৈঠকে ঢালা বিছানায় বসাইলেন। আদর আপ্যায়ন কতই করিতেছেন।

শ্রীম পশ্চিমের দরজার কাছে পূর্বাস্য বসিয়া আছেন। ভক্ত বিশ্বেশ্বর মুখার্জী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, সামনেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। শ্রীম লাইব্রেরী দেখিলেন। ঠাকুরঘর পার হইয়া আবার উত্তর দিকের বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যেই ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হইল। শ্রীম ঐ ঘরে বসিয়াই আরতি দর্শন করিতেছেন। উহা শেষ হইলে প্রসাদ লইয়া বিদায় নিলেন। এখানে আধ ঘণ্টা মাত্র ছিলেন।

গাড়ী কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতেছে। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের উত্তরে ডাণ্ডাস্ হোস্টেলের সামনে গাড়ী আসিলে শ্রীম বলিলেন, আবার গৌড়ীয় মঠে গেলে হয়, চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ শোনা যায়। (একটু ভাবিয়া) আমরা কি সব ছাড়তে পেরেছি ? ব্রাহ্মদেরও কি ছাড়তে পারছি ? তবে এঁদের কেন ছাড়বো ? সকলকেই নিতে হবে। Angularities (পৃথক্ দৃষ্টি) একটু থাকবেই তা' বলে কি ছাড়তে হবে ? সকলেই তাঁকেই ডাকছে, একই ঈশ্বরকে।

গাড়ী বিডন স্ট্রীট দিয়া চলিতেছে। গৌড়ীয় মঠের সামনে গিয়া থামিল—দক্ষিণের চৌরাস্তায় পশ্চিম ফুটপাথে। শ্রীম পায়ে হাঁটিয়া গিয়া মঠে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী মঠের সামনে যাইতে মানা করিলেন কেন ? বুঝি, দীন হীন ভাবে ভগবৎদর্শনে, সাধুদর্শনে যাইতে হয়, এই ভাব ভক্তদের শিক্ষার জন্য। 'সকলকেই নিতে হয়, সকলেই তাঁকেই ডাকছে, একই ঈশ্বরকে,' হাতেনাতে এই শিক্ষাটি দিবার জন্যই কি তৃতীয়বার গৌড়ীয় মঠে আগমন ?

বসিবার ঘরে গিয়া আজও গতকালের ন্যায় শ্রীম একই স্থানে বসিলেন সতরঞ্জির উপর পূর্ব দেওয়ালের আলমারীর সামনে পশ্চিমাস্য। কিন্তু আজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ঘর গরম হইয়াছে। হাওয়া না থাকায় শ্রীমর অতিশয় কষ্ট হইতেছে। ঘরের উত্তর-পূর্ব দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার পাশে মেয়েদের বসাইয়াছেন। মাত্র পাঁচ মিনিট

থাকিয়া শ্রীম ভক্তসঙ্গে বাহির হইয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন আর একটু অপেক্ষা করিতে। মেয়েদের সঙ্গী লোকটি একজন দালাল। সে বলিল, মেয়েদের মধ্য দিয়ে কেন যেতে দিলেন? অপর একজন বলিল, আমরা তাই একটু অপেক্ষা করতে বললাম। বাইরে যাবার ঐ একটি দরজা। ঘরে আজ কীর্তন হইতেছে।

শ্রীম কালের ন্যায় আনন্দ পান নাই। গতকাল সব সাধুরা প্রথমে আরতি করেন। পরে বন্দনা করিয়া, সকলে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন। আজের সম্মিলন মিশ্রিত। তাই কালের ভাব আজ নাই। একে গরম তাহার উপর ভাববিপর্যয়, এই দুই কারণেই শ্রীম উঠিয়া আসিলেন।

শ্রীম বাহিরে আসিয়া মুক্ত হাওয়ায় দাঁড়াইয়াছেন। একটি লোক আসিয়া ডাক্তারকে বলিলেন, আজ শ্রীমর সঙ্গে আপনাদের দর্শন হইল, বড় আনন্দ হইল। কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। লোকটি এই আশ্রমের ভক্ত, ডাক্তারের পরিচিত।

শ্রীম চলিতে চলিতে একটি সাধুর সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। আশ্রমের প্রেসের কাছে আসিয়া দুইজনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কথা কহিলেন। সবই আশ্রমবিষয়ক। আশ্রমের দৈনিক কর্মসূচী, কি কি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, ইত্যাদি কথা। তাঁহারই নিকট শুনিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হইবে আরও দেরিতে। এই পাঠ শুনিবার জন্যই শ্রীম আজ আসিয়াছিলেন। কিন্তু দেরী দেখিয়া বিদায় লইলেন।

৩

মোটর মর্টন স্কুলের সামনে আসিয়া থামিল। শ্রীম ও অন্তেবাসী নামিয়া পড়িলেন। ডাক্তার চলিয়া গেলেন কাশীপুরের বাসায়। এখন প্রায় সাড়ে আটটা।

ভক্তগণ শ্রীমকে না পাইয়া নিম্ন অঙ্গনে বসিয়া আছেন তাঁহার অপেক্ষায়—বেঞ্চ দিয়া রচিত স্কোয়ারে। শ্রীম পূর্ব দিকের বেঞ্চে বসিয়াছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখে রাস্তা। ভক্তগণ শ্রীমর সম্মুখে বসা

তিন দিকে—বড় জিতেন, বলাই, ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, জগবন্ধু প্রভৃতি।

দেখিতে দেখিতে প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত শ্রীনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন। শ্রীম অতি আদরে তাঁহাকে পাশে বসাইলেন। তাঁহার বয়স আশীর উপর, শ্রীমর অপেক্ষা বৃদ্ধ কিন্তু শরীর শক্ত। ইনি কেশববাবুর সেবক ছিলেন। তাঁহার সহিত বহুবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন। তিনি বসামাত্রই কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীনাথ (শ্রীমর প্রতি)—আমার একটা নালিশ আছে। আমি মহেশ ভট্টাচার্যকে দেখতে গিছলাম বেলুড়ে। তিনি মঠের উত্তর দিকের বাড়ীটায় থাকতেন তখন। একজন সন্ন্যাসী এসে আমায় বললেন, ঠাকুরঘরে যান। দর্শন করে আসুন। আমি বললাম, কেন? ঠাকুরঘরে গিয়ে কি দেখবো? একটি ছবি পূজো করছেন তো? আর হয় আধুলি, না হয় টাকাটা দিয়ে নমস্কার কর—এইতো ?

(অতি আশ্চর্য ও উদ্বেগের সহিত)—ও মহেন্দ্রবাবু, তাঁরা আমাদের পরমহংস মশায়কে ঈশ্বর করে ফেলেছেন। আরে, তাঁর হাতের কত রসগোল্লা পেটে গেছে। কত ভালবাসা পেয়েছি। তা' কি ভোলা যায়? এখন দেখছি, তাঁরা তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে একটা বেদীর উপর বসিয়ে রেখেছে তাঁর ছবি। আরে, আমাদের পরমহংস মশায়কে শেষকালে এমনটা করে তুললে ?

শ্রীম (সপ্রেমে)—আপনি যেমন বললেন, আটখানা ছবি এক সঙ্গে রেখে দিয়েছেন ঘরে—বুদ্ধ, গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির। ওগুলি কেন রেখেছেন ? না, আপনার ভাল লাগে এঁদের দেখতে। তেমনি ঐ। তাঁরা ঐ ভাবে পূজো করেন তাঁকে। আপনি করছেন, এই ভাবে। ওঁদের ঐ ভাব।

আপনার মনে নাই, পরমহংসদেব বলতেন, সকলের পেটে পোলাউ সহ্য হয় না। আপনারা হলেন, পোলাউর লোক (নিরাকারের উপাসক)।

বৃদ্ধ শ্রীনাথবাবু খুব সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)—কে যায় বাপু ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে? ঠাকুরও এই ভাবে মুখ বন্ধ করে দিতেন, লোকের।

ঠাকুরের ভালবাসা ভুলতে পারেন নাই। তিনি সমান ভাবে ব্যবহার করতেন কিনা ওঁদের সঙ্গে। তাই এইরূপ বললেন। তাঁদের সখ্য ভাব। ঠাকুর বলতেন, যার যেমন ভাব তেমনি লাভ। ভালবাসাটি থাকলেই হলো। এইটে আসল। এক একবার ঠাকুর তাই বলতেন—কথাটা হচ্ছে, 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'।

ব্রাহ্মসমাজের এঁদের বিশেষ করে বলতেন, মিছরীর রুটি যে ভাবেই খাও, মিষ্টি লাগবেই—তা' সিধে করেই খাও, কি আড় করেই খাও। ঠাকুরের কত রকমের ভক্ত আছে। আরও হচ্ছে, আরও হবে। আমরা কি সকলের খবর জানি?

আহা, এঁরা ধন্য। তাঁকে কত দর্শন করেছেন। তাঁর কত ভালবাসা পেয়েছেন। তাঁরা হয়তো জানেন না তাঁকে, তিনি যে ঈশ্বর—ইদানীং মানুষ-শরীর ধারণ করে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু তিনি তো জানেন, তাঁরা আমায় ভালবেসেছেন। ঠাকুরেরই কথা—লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। এ-ও তেমনি। সকলে একভাবে নেয় না, নিতে পারে না। তিনি তাঁর যে ভাব যার কাছে প্রকাশ করেন সে সেই ভাবই নিতে পারে। ভাণ্ড যে নানা রকম। তবে তাঁর ইচ্ছায় ছোট ভাণ্ডও বড় হতে পারে।

আবার ভক্তও রকমারী আসে। দর্শক ভক্ত, বহিরঙ্গ ভক্ত, অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রভৃতি। অন্তরঙ্গরা ঈশ্বরভাবে নিয়েছেন—প্রকাশ্য ভাবে নিয়েছেন। সে কি তাঁদের choice (ইচ্ছা)? তিনি তাঁদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের শক্তি দিয়েছেন তাঁকে চিনতে। তবেই তাঁরা বলছেন, তিনি ঈশ্বর। মুক্তকণ্ঠে প্রচার করছেন—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মনের অতীত, বেদ যাঁর গুণগান গায়, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা, তিনিই ইদানীং সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে এসেছেন। কি করে চিনে বল? অত আবরণে ঢেকে এসেছেন এবার। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য এঁদের বাহ্য

লৌকিক ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু এবার খালি মাধুর্য। বাইরে, দীন ব্রাহ্মণ। ছয় টাকা বেতনের পুরোহিত। দরিদ্র, বাড়ীর লোক খেতে পায় না। ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। আবার কখনও পাগলের মত ন্যাংটা হয়ে ঘুরছেন। হাতে একটা লম্বা বাঁশ। আবার কাপড় দিয়ে ল্যাজ বানিয়ে হনুমানের ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছেন। অত আবরণের ভিতর কার সাধ্য তাঁকে চিনে?

তিনি নিজেই নিজেকে চিনেন। আর যাকে তিনি চিনান, তারা তাঁকে চিনে। এতে কারোও বাহাদুরী নাই। এমন যে গোপী, যাঁদের নামে ঠাকুর মাথা নুইয়ে প্রণাম করতেন আর বলতেন, গোপী-প্রেমের এক কণা পেলে মানুষ হেউঢেউ হয়ে যায়। তাঁরাও তাঁকে চিনতে পারেন নাই প্রথম। দ্বিতীয় বারও চিনতে পারেন নাই। তাঁরা জানতেন, কৃষ্ণ তাঁদের কান্ত beloved. প্রথম রাসে শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে পেয়ে মনে অহংকার হয়েছে যে, আমি সকল স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কৃষ্ণ আমার প্রিয়তম কান্ত। প্রত্যেক গোপীর গলসংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মজা এই, সকলেই মনে করছে কেবল আমিই কৃষ্ণকে পতিরূপে পেয়েছি, অন্যরা তা' পায় নাই। সেই অহংকারে অমনি কৃষ্ণের অন্তর্ধান। এবারে এঁদের জ্ঞান হলো শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমার পতি নন, তিনি জগৎপতি। তাঁর স্পর্শে এই জ্ঞান হল। পূর্বে তাঁরা চিনতে পারেন নাই। তারপর যখন কেঁদে কেঁদে এই অভিমান দূর হল তখন দর্শন দিলেন দ্বিতীয় রাসে। তাঁরা পূর্ণরূপে চিনলেন, মদ্‌পতি জগৎপতি। মন্নাথ জগন্নাথ।

এই ব্রাহ্ম ভক্তরা কি কম লোক! সশরীরে ভগবানকে দর্শন স্পর্শন আলাপন করেছেন। আমার সঙ্গে মিলল না বলে এঁরা কিছুই নয়, বলা যায় না। যার যা পেটে সয় মা তাকে তাই করে দিয়েছেন। এর বেশী সইবে না যে। পেটে দাও, পেট ফেটে যাবে। টান, ছিঁড়ে যাবে। অর্জুনের সইলো না অত উচ্চ অধিকারী হয়েও। 'বেপথুঃ' হয়ে গেল। মাথা ঘুরতে লাগলো। তখন 'সৌম্যবপুঃ' ধারণ করলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হলেন অর্জুন।

ঠাকুরও ভক্তদের যখন স্বরূপ দেখিয়েছিলেন ভক্তরা কাঁপতে লেগেছিল। আবার মানুষরূপ ধারণ করলেন। তখন পূজারী ব্রাহ্মণ। ভক্তরা ফাঁপড়ে পড়ে গেল।

যাঁরা তাঁর ভালবাসা পেয়েছেন, যাঁরা তাঁকে ভালবেসেছেন, দর্শন স্পর্শন আলাপন করেছেন, তাঁরা সব ধন্য। তাঁরা আমাদের নমস্য। এই ব্রাহ্ম ভক্তরাও আমাদের নমস্য। কারণ তাঁরা যে ঠাকুরকে ভালবেসেছেন, যেভাবেই হউক।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ
৩১শে ভাদ্র ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৬ দণ্ড। ৫৭ পল

বিংশ অধ্যায়

বিশ্বশান্তি—সায়েন্স ও ফিলজফির মিলনে

১

মর্টন স্কুল। রাত্রি আটটা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ তিন দিকে বসা বেঞ্চে, সম্মুখে।

আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ১লা আশ্বিন ১৩৩১ সাল, বুধবার কৃষ্ণা চতুর্থী ১৯ দণ্ড। ৫ পল।

কথামৃত ছাপা চলিতেছে। তাই শ্রীম খুব ক্লান্ত। একে বৃদ্ধ শরীর, তাহার উপর কর্মের দারুণ চাপ। তাই ক্লান্ত। কাছেই ভক্তগণ—ছোট নলিনী, ছোট জিতেন, ছোট রমেশ, বলাই, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু প্রভৃতি।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি এখনও হয় নাই। একটু পরই ডাক্তার বক্সী ও তাঁহার ভাই বিনয় আসিলেন। শারীরিক ক্লান্তি দূর করিবার জন্য শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে মন উপরে উঠে যায়। তখন দেহকষ্ট তত বোধ হয় না। কখনও দেহজ্ঞান লোপ হয়।

শ্রীম (ছোট নলিনীর প্রতি)—আপনারা গৌড়ীয় মঠে যান নাই? অত কাছে, যেতে হয়। ফস করে গেলেন, গৌরাঙ্গদর্শন করলেন, সাধুদের নমস্কার করলেন—তারপর চলে এলেন। ওঁরাও ভগবানের নাম করছেন কি না!

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—তুমিও একবার morning walk করতে করতে চলে যেও। ছ'টার সময় উঠে যেও। সকাল সকাল ফিরে এসে আবার না হয় ঘুমিও (সকলের উচ্চ হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে কি?

মোহন—আজ্ঞে না।

শ্রীম—এখন বুঝতে পারছেন (মানুষ) কত ছোট? কি করে আসে কর্তাগিরি? এই সব দেখতে হয় তবে নিজের কর্তাগিরি ঘুচে যায়। ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা, এ বোধ হয়ে গেলে বেঁচে গেল। মহামায়া তাঁকে দিয়ে আর খেলার কাজ করাবেন না বোঝা গেল তখন।

কিন্তু যেতে চায় না কর্তাগিরি। এমনি তাঁর মোহিনী শক্তি। হাজার বিচার কর, ঘুরে ফিরে আবার এসে যায় কর্তাগিরি। তাই ঠাকুর পথ দেখিয়ে গেছেন—'থাক্ শালার দাস-আমি হয়ে'। এখানেও বাইরের দিকে থাকে কর্তাগিরির ভড়ং, ভিতরে ফাঁক।

মোহন—চেষ্টা করলেই কি মানুষ দাস হয়ে থাকতে পারে?

শ্রীম—না। তাঁর ইচ্ছা না হলে পারে না। তাঁর ইচ্ছা মূলে। তবে যে প্রাণপণ চেষ্টা করে তার হয়ে যায়। কেঁদে কেঁদে বললে, মা পরদা অনেকটা সরিয়ে নেন। এক একবার ভিতরটা দেখতে পায়। তাতেই কাজ হয়ে যায়। চেষ্টা চাই। প্রথমে করবো বলে সঙ্কল্প। তারপর চেষ্টা।

এই problemটা solved (এই সমস্যাটার সমাধান) হয়ে গেলে, জগতে তার আর কোন serious problem (জটিল সমস্যা) নাই। তখন এই সুখদুঃখময় সংসারে থেকেও তার ভিতর সদা সুখ থাকে। Independent claim (স্বতন্ত্র দাবী) রাখলেই যত মুস্কিল। তাই ঠাকুর বলেছেন, 'সব তাঁর অণ্ডারে' (underএ)।

যতক্ষণ দেহ ততক্ষণ তাঁর এলাকায়। ততক্ষণ দাস হয়ে থাকা। 'আমি'টাকে তাঁর সঙ্গে graft (সংযুক্ত) করা আর কি!

শ্রীম অনেকক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যার যার আপন আপন জীবনের দিকে তাকালে অবাক্ হয়ে যায়। তাঁর হাত দেখতে পাওয়া যায়। কি অদ্ভুত পদার্থে এই শরীর মন হয়েছে। কি বিচিত্র বুদ্ধি এর পেছনে কাজ করছে, আর কি বিচিত্র শক্তি?

বাইরে জগৎ, আবার ভিতরে মন। আর মাঝে ইন্দ্রিয়গুলি। মনের আবার কত রকম, কত অবস্থা—memory (স্মৃতিশক্তি) তার একটি।

তখন আমার বয়স এক কি ডেড় (দেড়)। তখনকার একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল—ছেলেবেলার কথা। একদিন রান্নাঘরের কোণে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। মা-রা সব গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। Tabularasaতে (অলিখিত মনপটে) গিয়ে impression (ছাপ) পড়লো।

শ্রীম (আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া)—যোগীরা যেতে পারতেন ঐ সব লোকে। (দীর্ঘকাল নীরব দৃষ্টি আকাশে লগ্ন করিয়া)—সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে যেতেন। এ স্থূল শরীরটা এখানে পড়ে থাকতো। বেড়িয়ে এলেন আর কি, যেমন মানুষ রেলে যায়।

সে একটা বিদ্যা। তাতেই তো ঐ সব লোকের সংবাদ মনুষ্যলোকে এসেছে। এখন বুঝি তার তত চর্চা নাই। একবার যখন হয়েছে তখন পরেও হবে।

এক এক অবস্থায় মানুষের এক একটা ভাব হয়। আবার সমষ্টিরও তাই। সমষ্টি মানুষের অবস্থারও বদল হয়। তাই ঋষিরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সময়ের এই বিভাগ করেছেন। আবার কোন সময়ের কি লক্ষণ তারও বিবরণ দিয়েছেন—মোটামুটি ভাবে।

শুধু সায়েন্সে এর সমাধান হয় না—এ সব সংশয়ের। যোগীদের evidence (সাক্ষ্য) নিলে ঝট্ করে problem solved (সমস্যার সমাধান) হয়ে যায়।

অনেক সায়েন্টিস্ট যোগীদের পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। Physics (পদার্থ বিদ্যা) আর metaphysics (অধ্যাত্ম বিদ্যা), এ দু'টো মিলে গেলেই সব problems solved (সমস্যার মীমাংসা) হয়ে গেল। সায়েন্স ও ফিলজফির মিলনে বিশ্বশান্তি।

এ দেশে Physicsটাকে (পদার্থ বিদ্যাকে) তত আমল দেয় নাই। Metaphysics (অধ্যাত্ম বিদ্যা) নিয়ে উপরে চলে গেছেন ঋষিরা। ওয়েস্ট (west), Physics (পদার্থ বিদ্যা) নিয়ে Metaphysics-এর (অধ্যাত্ম বিদ্যার) কাছাকাছি এসে পড়েছে এখন। ও দেশে Physics (পদার্থ বিদ্যা) নিয়েছে। ওরা যতক্ষণ metaphysics (আধ্যাত্ম বিদ্যা) না নেবে ততক্ষণ এই সব গোলমাল চলবে, material civilisation-এ (জড় সভ্যতায়) যা সব হয়।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—কৈ (বড়) জিতেনবাবু আসেন নাই?

ভক্তগণ (সমস্বরে)—এই যে বসে।

শ্রীম—Concealed in darkness (অন্ধকারে লুকিয়ে আছেন)।

বড় জিতেন—পারি কৈ বকবকানি থামাতে। তাই আজ একটু চেষ্টা হল।

শ্রীম—না। আপনারা তাঁর কথাই বলেন। সংশয় প্রকাশ করলেই তাঁর কথা আসে সিদ্ধান্তে।

২

আজ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ মর্টন স্কুলের ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন মাদুরে দক্ষিণাস্য—অন্তেবাসীর কুটীরের সামনে। পাশে বসা প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী, ডাক্তার বিনয়, জগবন্ধু, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি। সিদ্ধেশ্বর নিয়োগী মর্টন স্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিক পড়ে। তাহার কাকা বেলুড় মঠের সাধু। সদ্ভাব আছে। মাঝে মাঝে শ্রীমর কাছে আসে। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সিদ্ধেশ্বরের প্রতি)—ভাল তো সব ?

সিদ্ধেশ্বর—আজ্ঞে না। আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আজকাল।

শ্রীম—এখানে আনাগোনা করলে কবে আমরা ভাল করে দিতুম। দেখ, তুমি খুব বেড়াবে। এই মির্জাপুর পার্কে যাবে। খালি বেড়িয়ে বেড়াবে। শ্রীম (নয়ন হাস্যে)—অসুখ ভাল করবার একটা উপায় আছে। (কল্পিত গাম্ভীর্যে) আপনারা সকলেই আপনার লোক। অতি গুহ্য কথা। (অতি ক্ষীণ কণ্ঠে) যার যার বাহ্যে পরীক্ষা করা, (সকলের হো হো করিয়া উচ্চহাসির রোল।)।

লজিকে (ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রে) Law of Difference (ব্যতিরেক বিধি) আছে। ঐ দিয়ে খাওয়া বদলে দেখলে অসুখ বন্ধ করা যায়। যেটা সইলো না পেটে, সেটা বোঝা যায় বাহ্যে দেখলে। সইছে না, বেশ ছেড়ে দিলুম। অসুখ সব হয় খাওয়ায়।

মোহন—External cause (বাইরের কারণ) থেকে হয় না ?

শ্রীম—সে তো exceptional (বিরল)। যেমন ছাদ থেকে পড়লো। অসুখ হবে না ?

শ্রীম (সিদ্ধেশ্বরের প্রতি)—মাথায় গোলমাল হবে তখন বেশী ধ্যান করতে নেই। তখন খুব তাঁর নাম করতে হয়। নাম শুনতে হয়। আর সাধুসঙ্গ করতে হয়। আর লীলা দেখে দেখে বেড়াতে হয়। (চোখের ইঙ্গিতে বাহ্য জগৎ দেখাইয়া) এইসব দেখলে তাঁরই কথা মনে হয়। বেড়াতে হয় আর ঘুমুতে হয়। তুমি খদ্দর মেলা দেখতে যাও নাই, মির্জাপুর পার্কে হচ্ছে ? যাও না দেখে এস একবার। মাথার যন্ত্রণা হলে, তখন মনকে অন্তর্মুখীন হতে দিতে নাই। এ সব তো তাঁরই ঐশ্বর্য। এ সব দেখ, বেড়াও, খাও আর ঘুমোও। আর মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসবে।

আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ৩রা আশ্বিন ১৩৩১ সাল, শুক্রবার। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম ডাক্তারের মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে জগবন্ধু, বিনয় ও ডাক্তার। মোটর আমহার্স্ট স্ট্রীট, মাণিকতলা রোড দিয়া কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে

গিয়া থামিল। শ্রীম ও সঙ্গীগণ গাড়ী হইতে নামিলেন। শ্রীম ডাক্তারকে কাশীপুরের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। আর তিনি কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে ঢুকিলেন বিনয় ও জগবন্ধুর সঙ্গে ঐ কোণের ফটক দিয়া। পূর্বমুখে চলিতেছেন। বিশ্রাম-ঘরের সামনে পুকুরের রেলিং ধরিয়া পুকুর দেখিতেছেন। তারপর দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। তারপর পশ্চিম কোণের ফটক দিয়া বাহির হইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পার হইয়া পশ্চিমের ফুটপাথে দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। মাণিকতলা রোড পার হইয়া, রাস্তার কোণে স্থাপিত খ্রীস্টান মিশনারিদের লেকচার হল দেখিতেছেন।

এখন সন্ধ্যা। কয়দিন পরই দুর্গাপূজা। দোকান সব নানা দ্রব্যে সাজান। বিজলী বাতির বহর। দোকানের দ্রব্যাদি সব চক্‌চক্ করিতেছে আলোর আভায়। মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীম বলিতেছেন, দেখ মা আসবেন বলে সব আনন্দময়। আনন্দময়ীর আগমনে সবই আনন্দময়। কেন তিনি এইসব উৎসবের আয়োজন করেছেন? সংসারের জ্বালায় লোক জর্জরিত। বেশী দুঃখে মানুষ একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। তাই মাঝে মাঝে এই উৎসবানন্দের ব্যবস্থা। তাতে লোক দুঃখ ভুলে মাকে নিয়ে আনন্দ করে। সংসারটি রক্ষার জন্য এইসব আনন্দ। এদিকে আবার বলছেন, সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য। কতকগুলিকে দিয়ে এই সংসারের রক্ষা করছেন।

একটি দোকান দেখাইয়া বলিলেন, দেখ এখানে কত লোক আর ঐখানে মানুষ নাই।

শ্রীম অগ্রসর হইতেছেন দক্ষিণ দিকে। শ্রীমানি বাজারের দক্ষিণে বড় রাস্তার খোলার ঘরের পিছনে একটি একতলা পুরান পাকাবাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, এখানে পড়তে আসতাম। পাঁচবছর তখন বয়স। গুরুমহাশয় বেশ লোক ছিলেন। কতদিন কোলে করে নিয়ে গিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অপর পারে বড় বাড়ীটি দেখাইয়া বলিলেন, চার বছর বয়সের সময় মায়ের সঙ্গে পাল্কি চড়ে এখানে এসেছিলাম

নেমতন্ন খেতে। তখন গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ী ছিল। শংকর ঘোষ লেনের বিপরীত দিকে একতলা বাড়ীটা দেখাইয়া বলিলেন, বছর আটেকের সময় এই বাড়ীতে পড়তাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে স্কুল কমিটির বিরোধ হওয়ায় স্কুল তখন এই বাড়ীতে চলে আসে। বছর দশেকের সময় বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখি প্রথম। চটর্ চটর্ করে হেঁটে যাচ্ছেন। সকলে বলছে, ঐ বিদ্যাসাগর।

এতক্ষণে শ্রীম আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন মা কালীর সামনে ঠনঠনিয়ায়। মাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া মর্টন স্কুলে ভক্তসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন রাত্রি প্রায় নয়টায়।

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ৪ঠা আশ্বিন ১৩৩১ সাল। শনিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী, ৩২ দণ্ড। ৪৮ পল।

মর্টন স্কুলের ছাদ। এখন অপরাহ্ণ দুইটা। শনিবারের ভক্তগণ অনেকে আসিয়াছেন—মোটা সুধীর, 'ভবরাণী' (ভোলানাথ), 'কালো' প্রভৃতি। তাঁহারা সপ্তাহে একদিন আসেন আফিসের ফেরৎ। অন্তেবাসী তাঁহার টিনের ঘরে সম্মুখের বেঞ্চে শুইয়া আছেন আর ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ, বিশ্রাম করিতেছেন।

পাঁচটার সময় শ্রীম বাহিরে আসিয়া ছাদে বসিয়া আছেন, চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর অন্তেবাসীর সঙ্গে প্রুফ দেখিতেছেন। কথামৃত ছাপা হইতেছে। অন্তেবাসী কপি ধরিয়াছেন আর শ্রীম সংশোধন করিতেছেন। অন্তেবাসীকে বলিলেন, জোরে পড়ুন, তা' হলে এঁরাও শুনতে পারবেন।

প্রায় ছয়টায় জিতেন মুখার্জী আসিলেন। বলিলেন, আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে দাঁড়াইয়া দুই চারিটা কথা বলিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীম পুনরায় আসিয়া ছাদে বসিয়াছেন। অন্তেবাসী একা একা প্রুফ দেখিতেছেন। তাঁহাকে বলিলেন, শিখিয়ে দিন এঁদের। তা'হলে আপনার কাজের সহায়তা হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কেন এসব আয়োজন? না, ভক্তরা তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনে সংসারের শোকতাপ ভুলবেন, তাই। মন এতেই সর্বদা চঞ্চল থাকে কিনা। সুখের সময় ঈশ্বরকে স্মরণ থাকে না—সাধারণ মানুষের। দুঃখ তাই রেখেছেন। এতে তাঁকে মনে পড়ে। তাঁকে মনে রাখলে শোকতাপে একেবারে তলিয়ে যায় না। সহ্য করার শক্তি হয়। ভক্তরা ভাবে, তিনিই দুঃখ দিয়েছেন, তাই সহ্য করতে হবে। তিনি মঙ্গলময়। এতে নিশ্চয় আমার ভাল হবে।

এই দুঃখকে sublimate (ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ) করতে পারলেই অনন্ত সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। কি করে এই কাজটি হতে পারে তারই উপায় ঠাকুর নিজ মুখের কথামৃতে জীবগণকে বলে গেছেন। বলেছিলেন কিনা, আমি অবতার। বলেছিলেন, মা এই মুখ দিয়ে কথা কন। তাঁর কথায় যাদের বিশ্বাস হয় তারা বেঁচে গেল।

দেখুন কেমন কাণ্ড! যিনি মায়া দিয়ে বদ্ধ করেছেন, তিনিই মানুষ হয়ে এসে, কি করে মায়ার হাত থেকে মুক্ত হতে পারা যায় তার উপায় বলে দিয়েছেন। বলেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে থাক—আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, এই সব ভাব। এই করে তাঁকে ভালবাসা হয়। তা' হলেই বেঁচে গেল।

এটা খুব সহজ পথ। Double personality create (দু'টো মানুষ সৃষ্টি) করা—একটা worldly (জাগতিক), আর একটা divine (ঈশ্বরীয়)। মানুষের যথার্থ স্বরূপ divine (ঈশ্বরীয়)। ঋষিরা বলেছেন—মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—ভগবানের সন্তান। এটা বুঝলেই কাজ হয়ে গেল।

পরের দিন সারাটা সন্ধ্যাই শ্রীম নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগদান করেন।

৩

মর্টন স্কুলের ছাদ। অপরাহ্ন দুইটা। টিনের ঘরের সামনে বেঞ্চে বসিয়া দুইটি যুবক কথামৃত পড়িতেছে, পরিশিষ্ট—'অবতারতত্ত্ব

ও বামাচার'। অন্তেবাসী যুবকদ্বয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া উহা পড়িতে দিয়াছেন। মাসিক বসুমতীতে উহা সম্প্রতি বাহির হইতেছে। ছেলে দুইটি কলেজে এফ. এ পড়ে—একজন বঙ্গবাসীতে ও অপর জন সাউথ সুবারবন কলেজে। তাহারা শ্রীমর দর্শনাভিলাষী।

চারিটার সময় শ্রীম ছাদে আসিলেন। ছেলেরা শ্রীমকে প্রণাম করিতেছে। একটি ছেলের মুখের ছবি বড় ভক্তিময়। বয়স আঠার। তাহার সহিত শ্রীম আনন্দে নানা কথা কহিতেছেন। এবার সঙ্গী ছেলেটির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ছেলের প্রতি)—লজিক পড়বে। একে বলে তর্কশাস্ত্র। এটা পড়লে নিজের বিচারের ত্রুটি ধরা পড়ে যায়। নিজের বিচারের ত্রুটি জেনে নিতে হয় আগে। নিজের বুদ্ধিতে কত প্যাঁচ লেগে থাকে, যেমন লাটায়ের সুতো।

বিচারশক্তি যার প্রখর সে নিজের ভুল ধরতে পারে সহজে। নইলে কাজ হয় না। মনে কর, একটা জমিতে তুমি ধান বুনবে। তার আগে, লাঙ্গল দিয়ে জমিটা খুঁড়ে যদি নিচের রাবিশ সব সরিয়ে নাও, তারপর আবার লাঙ্গল দিয়ে যদি বোনো, তবেই ফল হবে উত্তম।

উপর উপর লাঙ্গল দিলে কাজ হয় না। নিচে হয়তো তিন হাত গভীর ইট।

তেমনি মানুষের মন বুদ্ধি। বুদ্ধিটি সাফ করে যদি বীজ রাখ শত গুণ ফল ফলবে। নইলে, গাছ গজাবে, কিন্তু মরে যাবে।

এখন বুদ্ধি সাফ হয় কিসে? ঠাকুর বলেছেন, সাধুসঙ্গে। মানে, যাদের বুদ্ধি সাফ হয়েছে, বাসনা সব মিটে গেছে, তাদের সঙ্গ করলে তোমারও ঐরূপ হবে। মনের রাবিশ মানে, বাসনা—ভোগ বাসনা।

শ্রীম (উভয় যুবকের প্রতি)—যদি এক জনের মন সাধুসঙ্গে না যায়, বুঝতে হবে তার অনেক বাকী। তার সবে হয়তো মানুষজন্ম আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর সকলের ভিতর নারায়ণ দেখতেন। কিন্তু এইরূপ লোকের সঙ্গে থাকতে পারতেন না—দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হতো।

তাঁর কাছে যারা থাকতো তাদের সর্বদা ধ্যান জপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ—এসব নিয়ে থাকতে হতো।

তিনি কি ঘৃণা করতেন কাউকে ? তা' নয়। অত শুদ্ধ তাঁর মন ছিল যে নিচের জিনিসের সঙ্গে থাকতে পারতো না—শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ !

শ্রীম—বর্তমান সভ্যতার challenge (বিরুদ্ধে প্রতিবাদ) তাঁর শরীর মন। তবে তো ভক্তদের চৈতন্য হবে—আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তাঁর হাড়-চামড়াতক শুদ্ধ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—জ্ঞান ভক্তি দাও। স্বামী বিবেকানন্দ মা কালীর কাছে চেয়েছিলেন, আমায় জ্ঞান ভক্তি দাও। সংসারের জ্বালায় চাইতে গিছলেন অন্য জিনিস। কিন্তু চাইলেন, জ্ঞান ভক্তি। অন্য জিনিস চাইতে পারলেন না।

বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র—ঈশ্বরকে জ্ঞানভক্তির জন্য ডাকাও তো সকাম।

শ্রীম (সহাস্যে)—ইনি দেখছি একটু logical (যুক্তিবাদী)। Logic (ন্যায়শাস্ত্র) পড়া হয় বুঝি ? ঠাকুর বলেছিলেন, হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়। তেমনি ও-টি। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রেম সমাধি, এসব কামনা—কামনার মধ্যে নয়। কারণ এতে যে জীব মুক্ত হয়। অন্য বাসনাতে বদ্ধ হয়।

শ্রীম (যুবকদের প্রতি)—আচ্ছা, তোমরা অভেদানন্দ মহারাজকে দর্শন করেছ ? যাও না, একবার দর্শন করে এসো। প্রণাম করবে। আজ তাঁর জন্মতিথি। পঁচিশ বছর আমেরিকায় ছিলেন। প্রায় এক বছর ঠাকুরের সেবা করেছেন। কত বড় লোক। যাও এমন দিনে। এ সুযোগ আর হবে না। যাও দর্শন করে এসো।

ছেলেরা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া রওনা হইল অভেদানন্দ মহারাজকে দর্শন করিতে। ইনি এখন 'বেদান্ত সোসাইটি'তে থাকেন। ইহা এগার নম্বর ইডেন হস্‌পিটাল রোডে স্থাপিত—মেডিকেল কলেজের পিছনে।

সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। কিয়ৎকাল মধ্যে আসিলেন ডাক্তার বক্সী ও তাঁহার ভাই বিনয়। প্রায়

আটটার সময় শ্রীম ডাক্তার বক্সীর মোটরে বেদান্ত সোসাইটিতে রওনা হইলেন। ওখানে আজ তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার, বিনয়, ছোট রমেশ ও জগবন্ধু। গদাধর ও ছোট নলিনী যাইতে চাহিলেন। শ্রীম বলিলেন, না, তোমরা থাক। তোমাদের তো দিনে দর্শন হয়েছে। এখন আর না গেলে! ভক্তরা এলে বরং তাঁদের পাঠিয়ে দিও।

'বেদান্ত সোসাইটি' একটি বৃহৎ দ্বিতল ফ্ল্যাট। তাহার বক্তৃতাগৃহে শ্রীম ও স্বামী অভেদানন্দ বসিয়া আছেন মেঝেতে বিছানা পাতা। তাহার উপর একটি অয়েল ক্লথ। শ্রীম উত্তরাস্য আর অভেদানন্দ মহারাজ সম্মুখে দক্ষিণাস্য। অভেদানন্দ মহারাজের অনেক পীড়াপীড়িতেও শ্রীম চেয়ারে বসিলেন না। লোকশিক্ষার জন্য কি?

সাধু ও ভক্তগণ অনেকে তাঁহাদের চতুর্দিকে বসিয়াছেন। কেহ বা দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেই উৎসুক তাঁহাদিগের একত্র বসা দেখিতে, তাঁহারা কি কথা কহেন তাহা শুনিতে।

একটি যুবক অভেদানন্দ মহারাজের পিছনে বসিয়া বিস্ময়ান্বিত। তিনি ভাবিতেছেন, কি প্রেম গুরুভাইদের মধ্যে! দুই জনই মহাপুরুষ, অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। একজন সন্ন্যাসী আর একজন গৃহাশ্রমী। কিন্তু উভয়ের ভিতর উভয়ে দেখিতেছেন তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে। সাধু ভক্তগণ সকলে দর্শন করিতেছেন এই দুই দেব-মানবের দিব্য প্রেমময় পুণ্য সম্মিলন, আর শুনিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রগাঢ় ও অলৌকিক প্রীতিপূর্ণ প্রেম সম্ভাষণ।

স্বামী অভেদানন্দ—মাস্টার মশায়, একটু ঠাকুরের কথা বলুন। আপনি আসবেন বলে এরা সব অনেকক্ষণ থেকে ব্যাকুল হয়ে বসে আছে। আপনাকে তো ঠাকুর নিজেই তাঁর জীবিতাবস্থাতেই তাঁর কথামৃত কীর্তনে লাগিয়ে গেছেন।

শ্রীম—সুবোধ মহারাজ পুরীতে একটি উকীলকে বলেছিলেন, তোমরা ভগবানলাভের কথা বল, ডাকো কি তাঁকে? তারকেশ্বরের মত হত্যা দাও কি? খালি মুখে মুখে বললে কি হয়? তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে, তবে হয়।

ঠাকুরের এই একটি মহাবাক্য—'ব্যাকুলতার পরই তাঁর দর্শন, যেমন অরুণোদয়ের পর সূর্যোদয়। অবতার আসেনই এই ব্যাকুলতা শিখাতে। (ভক্তদের প্রতি) কেমন এ-টি ভাল না ?

একদিন কাশীপুর বাগানে ছোট নরেন কি সব অন্য কথা বলছে। ঠাকুর শুনে বললেন, বাবা এখানে অন্য কথা ক'য়ো না। আমার এ সব ভাল লাগে না। ঈশ্বরের কথা কও।

(ভক্তদের প্রতি) কেমন এ-টি, ভাল না ? তাঁর কথার শেষ নাই। তাঁর সব কথা এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—সাধুসঙ্গ কর। (অভেদানন্দ মহারাজকে দেখাইয়া) এই এঁরা তাঁর কথার মূর্ত রূপ।

শ্রীম এইবার উঠিয়া আশ্রমের সব ঘর দর্শন করিতেছেন। লাইব্রেরী, বেতের কাজের ঘর, শুইবার ঘর প্রভৃতি দেখিয়া পুনরায় ঠাকুরঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি তিন বৎসর বয়স্কা বালিকা দাঁড়াইয়া আছে।

স্বামী অভেদানন্দ সহাস্য বদনে বলিতেছেন, প্রণাম কর, প্রণাম কর, সাক্ষাৎ নারদ মুনি। যাত্রাতে দেখিস্ নাই নারদ মুনি ? এই সত্যিকার নারদ মুনি।

শ্রীমর পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র লংক্লথের জামা গায়ে। স্কন্ধে শুভ্র চাদর। মাথার কেশর কেশবিরল, তাহাও শুভ্র। শুভ্র আবক্ষ বিলম্বিত শ্মশ্রু। কণ্ঠে সদা শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।

এখন উভয় গুরুভ্রাতা গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। এখন বিদায়। শ্রীমর হাতে প্রসাদ।

দেড় ঘণ্টা পর শ্রীম মর্টন স্কুলে ফিরিয়াছেন। রাত্রি দশটা। নিত্যকার ভক্তগণ ছাদে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম আসিয়া চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। বলিতেছেন, ওখানে বড় ভাল লেগেছিল। আমার আসতে ইচ্ছা হয় নাই। ডাক্তারবাবুর দেরী হয়ে যাবে বলে চলে এলাম।

মর্টন স্কুল কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
৬ই আশ্বিন, ১৩৩১ সাল, সোমবার, কৃষ্ণা নবমী ৪২ দণ্ড। ৪৮ পল।

একবিংশ অধ্যায়

সেবকদের দিলেই ঈশ্বরকে দেওয়া হয়

মর্টন স্কুল। চারি তলের শ্রীমর কক্ষ। শ্রীম ক্লান্ত, বিছানায় শুইয়া আছেন। ভক্তগণ একে একে সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। ডাক্তার বক্সী, সুখেন্দু, যতীন, মোটা সুধীর, বড় অমূল্য, বলাই, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট নলিনী, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন, 'ফুলদা' প্রভৃতি আসিয়াছেন।

শ্রীম আসিয়া বসিলেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। বলিলেন, একটু ভাগবত পাঠ হউক। একজন ভক্ত শ্রীমর ঘরে গিয়া টেবিল হইতে ভাগবতখানা লইয়া আসিলেন।

শ্রীম বলিলেন, ইনি পাঠ করুন। মোটা সুধীর পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীমর নির্দেশে প্রথম হইতে পাঠ চলিতেছে। এখন রাত্রি আটটা।

প্রথম শুকদেবের কথা পাঠ হইল। তারপর কলিকাল বর্ণনা চলিতেছে।

শ্রীম—আহা, আবার পড়ুন তো কলিকাল-বর্ণন।

পাঠক পড়িতেছেন—দুস্তর কলিকাল, মানুষের তেজ-বীর্য-হরণকারী কলি। এতে মনের সব শক্তি ক্ষয় হয় বিষয়ভোগে। ইচ্ছাশক্তি হীন হইয়া যায়। ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায় মানুষ, ইত্যাদি।

শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঠ শুনিতেছেন। তাঁহার হাত কোলের উপর অঞ্জলিবদ্ধ, মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর। আধ ঘণ্টা পর তিনতলায় খাইতে গেলেন। পাঠ শেষ হইয়া গেল। শ্রীম এখন ফিরিয়া আসিয়াছেন পনর মিনিট পর। এই বার তিনি নিজ চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গত শনিবার একটা adventure (দুঃসাহসের কাজ) করা গেল। একাই দক্ষিণেশ্বর রওনা হয়ে গেলাম।

রবিবার ঠাকুরের জন্মদিন। মনটা বড় বিচলিত হল দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য।

কত স্মৃতি তাঁর দক্ষিণেশ্বরে। ওসব কথা মনে হলে ভুলে যাই, শরীরটা বৃদ্ধ। আমরা প্রথম যৌবনেই তাঁকে পেয়েছিলাম কিনা। তাই মনে হয় আমি এখনও সেই যুবক। অত প্রবল দাগ পড়েছে মনের উপর।

মন তৈরী ঐভাবে। মন শেষে বিদেহ হয়ে যায়। তাঁর স্মৃতিই জীবন। তাই অমৃত। তাই আনন্দ, তাই শান্তি, তাই সুখ।

আলমবাজার পর্যন্ত বাসে গেলাম। তারপর হেঁটে। আলম-বাজার গিয়ে একটু nervous (ভয়ে থতমত) হয়ে পড়লুম।

নটবর পাঁজার রেড়ির কল দেখলুম। তারপর যুগলের ঠাকুরবাড়ী। তারপর সাঁকো, শম্ভু মল্লিকের বাড়ী। তারপর এল এঁড়েদহর রাস্তা, মসজিদ, যদু মল্লিকের বাড়ী। এবার বড় ফটক, গাজীতলা। তারপর আনন্দনিকেতন ঠাকুরের ঘর।

মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় বড্ড nervous (থতমত) হয়ে গিছলুম। একজন ফ্রেণ্ড সাইকেলে যাচ্ছিলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে লোক আছে তো?

তারপর যেই যদু মল্লিকের বাগান, মন্দিরের সিংহ-দরজা দেখলুম অমনি আবার সাহস হলো। মনের ভিতর থেকে কে যেন বের হয়ে এলো। প্রাচীন স্মৃতি সব জেগে উঠলো। আমি সেই প্রাচীন যুবক। মন তখন বিদেহ। সবই দেখছি মনে।

ঐ স্থানগুলি old landmarks (প্রাচীন নিশানা) কিনা! আগে যখন আসতুম তখন এইগুলি মনে করতুম আর একটার পর একটা ছাড়িয়ে শেষে ঠাকুরের চরণতলে গিয়ে দাঁড়াতুম।

আজকাল কত সুবিধা। আগে কত কষ্ট করে যেতাম। আবার যৌবন যদি ফিরে আসতো, তা'হলে দেখাতাম কি করে যেতে হয়।

(চিন্তার পর) একদিন গেছি। খুব ঘেমেছি। দারুণ গ্রীষ্ম, দেখে মণি মল্লিক বললেন, খুব ঘেমেছো যে! ঠাকুর হেসে বললেন, তাইতো,

যে-কালে 'ইংলিশম্যানরা' সব আসছে, তাতেই মনে হয়, যা সব বলছি কিছু আছে তাতে (হাস্য)।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—গেলুম তো সেদিন। আর আসতে সাহস হয় না। বেলা অনেক হয়ে গেছে। নকুল বললে, থাকুন। আমি বললুম, আচ্ছা, রাধাকান্তর ঘরের প্রসাদ খাওয়া যাবে। অমনি দেখতে পেলাম একটা রিক্সা। যোগেনবাবুর ছেলেকে বললুম, করে দিতে পার ? আমায় দিয়ে আসবে। যোগেনবাবু কালীবাড়ীর খাতাঞ্জি।

বাবুরা দু'জন গেছে বেলঘরে থেকে। না, না, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ কোন্‌ বাগানে গিছলেন ? (তৎক্ষণে মনে করে) হাঁ হাঁ, বেলগেছে, বেলগেছে।

বলতেই বাবুরা বল্‌লে, তা' কেমন করে হয় ? আমাদেরই দেরী হয়ে গেছে।

ড্রাইভার (পুলার) নিমরাজী ছিল। কিন্তু এদের কথা শুনে বললে, না, যাওয়া হবে না। কি করি! নকুলকে বললুম, রিক্সা করে দিতে পার ? ও বুঝিয়ে বললে। ওমা! অমনি কত ক্ষমা চাইলো। কত কি বলতে লাগলো।

যেই ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিলে, অমনি ক্ষমা চাইতে লাগলো। কত কথা বলতে লাগলো আমাদের পাপ হয়েছে। আমরা জানি না। আমাদের মহা অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে আর ঠাকুরের কাছে। রিক্সাওয়ালাকে বললো, খবরদার, একটা পয়সাও নিতে পারবি না। একেবারে গেট পর্যন্ত এলো সঙ্গে সঙ্গে।

যতক্ষণ না ঠাকুরের পরিচয় দিচ্ছিল, ততক্ষণ হলো না। যেই দিল, অমনি কত আদর। তাঁর পরিচয় দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যে কেউ ঘুরে আসতে পারে অনায়াসে। একটুও কষ্ট হবে না।

ঐদিন প্রথমটা nervous (থতমত) হয়ে গিছলুম। তা' ভালই হলো। Experience (অভিজ্ঞতা) পাওয়া গেল।

(একটু ভাবনার পর) দক্ষিণেশ্বর বেশ হয়েছে। কিরণবাবুও ভক্ত, খাতাঞ্জিও ভক্ত।

চাকর বাকরদের বুঝি যার যা প্রাপ্য দিতে হয়—directly (সামনাসামনি) হউক বা indirectly (অন্যভাবে) হউক।

পুরীতে মন্দিরে আলো হাতে নিয়ে থাকে পাণ্ডারা, আলো দেখিয়ে মন্দিরের ভিতর নেয়, অন্ধকার কিনা ভিতরে। একটা পয়সা দেব বলে হাত দিলুম পকেটে। একটা আধুলি বের হল। এমনি instinct (অভ্যাস), হাত বাড়ালুম ও-টা আনতে। ও কেন আর দেবে? দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করলুম, ও আধুলিটা ঠাকুর সেবায় লাগবে? পাণ্ডা বললে, নাই বা লাগলো। আমরা তাঁর সেবা করি। আমাদের দিলে তাঁকেই দেওয়া হয়। অমনি মনে হল—'সখী গো সখী, যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি'—ঠাকুরের এই মহাবাক্য। শিক্ষার আর শেষ হলো না। আসবার দিন একটি টাকা দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে এলুম।

(বড় জিতেনের প্রতি) Love me, love my dog! (আমাকে ভালবাসার পরিচয় আমার কুকুরকেও ভালবাসা)।

আমার মনে হয়, কাঙ্গালদের, সেবকদের খাওয়ালেই হয়। জগন্নাথ না খাওয়ালেও হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তাই আছে, তীর্থে গেলে ভিখারীদের খাওয়াতে হয়। বাবুরা বুঝি তা' করে না। না করার হলে কত ছুতোই বের হয়। Out of love, ভালবাসা থেকে দেওয়া, আলাদা জিনিস।

My dear (বাবু) লোকেরা কি করে? সমুদ্রের পাড় দিয়ে হাওয়া খাবে। অত সব সেবক, ভিখারী দাঁড়িয়ে। তা' আবার কেমন, একটি পাই পয়সা দিলে—(জনৈকের প্রতি) কয় পাইয়ে এক পয়সা? (একজন বললো, তিন পাইয়ে) হাঁ, তিন পাইয়ে—তাতেই কত খুশি। কত satisfied (সন্তুষ্ট)। ও না করে জগন্নাথের ওখানে টং করে একটু ফেলে দিলে, আর মনে করলে, সব হয়ে গেল।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—তাই বলেছিলেন, যখন গুহকের বাড়ীতে যেতে বললে। গুহক বলছে, আমার বাড়ী চল। তোমার

সেবা করি। এতদিন থেকে তোমায় ডেকেছি। রাম বললেন, ভাই আমার যাবার যো নেই। আমি বনবাসী। তবে এক কাজ কর। আমার ঘোড়া দু'টো বড় পরিশ্রান্ত। এদের খাইয়ে দাও। তা' হলেই আমার খাওয়া হবে। ঘোড়া ওঁকে টেনে নিয়েছে কিনা।

বাবুরা নানা রকম বলে। পাণ্ডারা কত উৎপাত করে, তারা ভাল নয়, অত্যাচার করে, কত কি। না হয় করলোই একটু। তারা কত করে। একেবারে অচেনা জায়গায় গিয়ে পড়লে। কারো সঙ্গে জানা নাই। আর কত আদর যত্ন করে। আর কত হুকুম—ওহে আজ অমুক প্রসাদ চাই। ওমনি মাথায় করে এনে দিল। আবার সব দেখানো, কত যত্নের সহিত। তারা না হয় একটু করলেই বা উৎপাত।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—পুরীতে একজন জমিদার সাধুদের খাইয়েছিল। একজনের পাতে বুঝি একটু কম পড়েছে। অমনি বললে, উঠে যাব। নেহি খাওঙ্গা। এৎনা কমতি দিয়া (হাস্য)। অমনি কয়জন এসে বললে, হে হে দিচ্ছে, আরও দিচ্ছে। এই বলে ঠাণ্ডা করে।

হাঁ, তা' করবে না একটু অভিমান ভক্তের প্রতি ? তবে কোথায় করবে ? ওরা তো খেতে পায় না সব।

দেখ, কেউ আছে রেগে তাড়িয়ে দেয়। ওরা আবার কয়জন এসে ঠাণ্ডা করলে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পুরীতে আর একটি সিন্ হয়েছিল। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সমুদ্রের ধারে টেণ্ট খাটিয়ে সব জপ তপ করছিল। যত সব কুমারী পূজা করলো একদিন। কাতারে কাতারে সব কুমারীরা যাচ্ছে। একটি মেয়েকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে একটি কাপড় আর একটি টাকা দিল। ওরা সদ্বংশ কিনা তাই। অনেক করেছে। আর যাদের সবে আরম্ভ তারাই অন্য কথা বলে।

তীর্থ থেকে একটু দূরে থাকা ভাল। তবে কষ্ট করে গেলে মনে থাকে। আমরা পুরীতে যেখানে (শশী নিকেতনে) ছিলাম সেখান থেকে একটু দূর আছে মন্দির।

বড় অমূল্য—বর্ধমানের রাজাও দানটান করে।

শ্রীম—খুব ভাল।

বড় অমূল্য—তবে একটু সাহেবীয়ানা হয়েছে।

শ্রীম—তা' হলোই বা। অন্য দোষ তো নাই। তাদের কত ঠাকুরপূজা—কালনা, বর্ধমান, কত সব স্থানে পূজা।

বড় অমূল্য—নিজে কিছু করে নাই। বাপ যা করে গেছে তাই করছে।

শ্রীম—তা' হলেই তো বোঝা গেল ভাল লোক। যখন ওসব করতে allow (অনুমোদন) করছে, কেমন করে ভাল নয় ?

এদিকে রাজকার্য শিখেছে। Poet (কবি), আবার Philosopher (দার্শনিক)। তা' সময়ে সব হবে।

বলরামবাবুকে একজন ভক্ত কৃপণ বলায় ঠাকুর তেড়ে বললেন—'হাঁ, কি বলিস্ ? কত দেবসেবা এদের।' নিজে মাঝে মাঝে একটু খোঁচা দিতেন (হাস্য)। অন্যে কিছু বললে, অমনি তাকে শুনিয়ে দিতেন উলটে।

আজ শ্রীমর একটু প্রসন্ন ভাব, লীলা-চঞ্চল। ধর্মের বাহ্য আচরণের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। এই সব আচরণে ত্রুটি থাকিলেও পালনীয়। এইসব আচরণ প্রথম অবস্থায় প্রয়োজন। না করলে ভিতরে সার বাঁধবে না। এসব যেন ধানের তুষ। পেকে গেলে ফেলে দাও, ক্ষতি হবে না। কাঁচা অবস্থায় ফেলে দিলে চাল পাবে না।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ খ্রীঃ।
৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩২ সাল। মঙ্গলবার, শুক্লা চতুর্থী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ঘরের ছেলে ঘরেই যাবে

১

মর্টন স্কুল। চারিতলের ছাদ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। শ্রীম ভক্তদের মজলিসে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। গায়ে ধূসর রংএর গরম পাঞ্জাবী, মাথায় বাঁধা কম্ফোর্টার। চারিদিকে বেঞ্চে ভক্তগণ। ডাক্তার, সুখেন্দু ও মাণিক পশ্চিমে। শুকলাল, বলাই, যতীন ও বিনয় বসা দক্ষিণে। জগবন্ধু, ছোট জিতেন ও কৃষ্ণ পূর্বে। আর উত্তর দিকে বসা বড় জিতেন ও একটি নূতন বাবু।

বিনয় ও সুখেন্দু বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। শ্রীম তাহাদের নিকট হইতে মঠের সকল কথা শুনিতেছেন। মঠের মাহাত্ম্য মাঝে মাঝে কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম—মঠের সাধুদের যাদের ভাল লাগে, বুঝতে হবে, তারাও সাধু, কেহ ব্যক্ত কেহ গুপ্ত। কিন্তু তারাও সাধু ঘরে থাকলেও। কেন এই ভালবাসা ? তাদের ত্যাগের জন্য। গৃহ পরিজন, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, সব ছেড়ে তারা এসেছে। কেন না, ঠাকুরের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে পিতামাতাদির ভালবাসাও ফিকে বোধ করেছে।

ঠাকুরকে ভালবাসা মানে ভগবানকে ভালবাসা। ঠাকুর নিজে বলেছিলেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীরে এসেছে। বলেছিলেন, একদিন দেখলুম সচ্চিদানন্দ ভিতর থেকে বের হয়ে বলছেন, আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

দেখ, কেমন করে অবতার-লীলা প্রকাশ হচ্ছে। স্পষ্ট করে বলেছেন, তবুও লোকের বিশ্বাস হয় না। এমনি কঠিন আবরণ তাঁর মায়ার। তিনি উহা না সরালে ভেদ করা অসাধ্য। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তিনি শোনেন, ঠাকুর বলতেন। সব ছেড়ে কাঁদা। অত সোজা পথ বলে গেছেন তবুও যেতে চায় না তাঁর কাছে। সংস্কার রুখে দাঁড়ায়।

একটি বাবু—শাহ্ সাহেবের ঘরে ঠাকুরের ছবি আছে।

শ্রীম—তাতে আর আশ্চর্য কি? একই ভগবানকে ডাকছে সকলে। তাঁর নাম রূপ ভিন্ন। বস্তুত একই। ঠাকুর বলেছিলেন, যারা আন্তরিক তাঁকে ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে। আর মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মা যারা আন্তরিক এখানে আসবে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করো। যদি কেউ আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে চায় তবে তার কাছে ঠাকুরের ভাব নিশ্চয় পৌঁছাবে। তাই শাহ্ সাহেবের ঘরে ঠাকুরের ছবি। শুনেছি, পাওহারী বাবার ঘরেও ঠাকুরের ছবি ছিল।

একজন ভক্ত—রামকে কেন তবে সকল ঋষিরা চিনতে পারেন নাই? বললেন, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলেন। কিন্তু আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপাসক। তাঁরা কি আন্তরিক তাঁকে ডাকেন নাই?

শ্রীম—সকলেরই তো এক অবস্থা নয়। আন্তরিকতারও আবার ডিগ্রী আছে। আর সকল ঋষিরাই যে তখন ঈশ্বরদর্শন করেছিলেন, তারও কোন প্রমাণ নাই। কেহ হয়তো পরে করেছেন। তখন হয়তো বুঝেছেন, রাম পরমব্রহ্ম। ঋষি তো একটা সাধারণ নাম—যেমন সাধু। সাধুর ভিতর সিদ্ধ পুরুষও আছে, আবার অসিদ্ধও আছে। সকলকেই সাধু বলা হয়। তেমনি ঋষি শব্দ।

শোনা যায়, তোতাপুরী দেবাদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেন লৌকিক মর্যাদা রক্ষার জন্য। তাঁরই হাতে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিলাভ হয়। কিন্তু তোতাপুরী ঠাকুরকে অবতার বলে চিনতে পারেন নাই। ঠাকুর কিন্তু তাঁকে চিনেছিলেন। পরে তিনি ঠাকুরের কৃপায় বুঝতে পারলেন, ঠাকুর অবতার। শুধু তাঁর বেদান্ত শিক্ষার শিষ্য নন। তাই তো অত চেষ্টা করেও দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যেতে পারলেন না যতক্ষণ না ঠাকুর তাঁকে যেতে দিলেন। তাই এগারো মাস ছিলেন। তিন দিনের বেশী কোথাও থাকতেন না।

তা' ছাড়া তাঁর ইচ্ছা। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, এরা আমার

অবতাররূপ জানবে না, তা' হলে, কি করে জানবে ? দেখ না, ব্রহ্মা, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন নাই প্রথম। ধরে নিয়েছিলেন কোনও শক্তিশালী সিদ্ধ পুরুষ, যোগ-বিভূতিসম্পন্ন। কিন্তু পরে ধ্যানে জানতে পেরেছিলেন কৃষ্ণ অবতার, পরমব্রহ্ম।

একজন ভক্ত—ঠাকুর ঋষিদের ভয়তরাসে কেন বললেন ?

শ্রীম—এঁরা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—অহং ব্রহ্মাস্মি—এই ভাবনাতে সিদ্ধ হয়েছেন। তাঁর দর্শন পেয়েছেন। জগৎ মহামায়ার ক্রীড়াভূমি। পাছে ঐতে ফেলে দেন তাই সদা ভয়। মহামায়ার কাছে মুনি ঋষিরাও থ', মানে ভয়ে জড়সড়। এই ভাবটা আরোপ করেই তো ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতেন, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। মানুষের শিক্ষার জন্য তাঁর এই প্রার্থনা।

আবার দেখ বলছেন, যিনি পরমব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই আবার নামরূপে জীবজগৎ হয়ে আছেন। মা-ই তো জগৎ—জগতের সব। তবে কাকে ভয় ? আমার মা-ই ব্রহ্ম, মা-ই জগৎ। আর আমি মায়ের ছেলে। তবে কাকে ভয় করব ? নানা অবস্থার কথা নানা ভাবে।

এবার শ্রীমর ইচ্ছায় কথামৃত পাঠ হইতেছে। ডাক্তার বক্সী পাঠ করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, সচ্চিদানন্দ তাঁহার ভিতরে আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখ, তিনি নিজে বলেছেন, আমি অবতার। পাঁচজন মানুষ মিলে তাঁকে অবতার বানান নাই। গীতায় অর্জুনও বলছেন এ কথা—'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে'—নিজে বলছো তুমি অবতার। অসিত, দেবল, ব্যাস এঁরাও বলছেন, তুমি অবতার। কিন্তু তুমি যে নিজে বলছো অবতার। তাই তুমি অবতার। তেমনি ঠাকুর। তিনিই ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অবতার, তিনি 'মা', তিনিই ছেলে। আবার তিনিই ভক্তদের গুরু, জগৎগুরু।

একজন ভক্ত—ব্রহ্মা কেন বৃন্দাবনের একজন মানুষ হয়ে থাকতে চাইলেন ? বেদব্যাস তো এই কথা লিখেছেন।

শ্রীম—অবতার-লীলার মাধুর্য উপভোগ করতে। শুদ্ধা ভক্তি

প্রেমা ভক্তি আস্বাদন করতে। ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞ বটে, কিন্তু তাঁরা সব ভগবানের ঐশ্বর্যের উপাসক। মধুর রস নাই সেখানে।

ঠাকুর না এলে এ সময় ঐ সব কথা কেহ বুঝতে পারতো না। ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ সেই রস আস্বাদনে তৃপ্ত। তাই তাঁরা উহা বুঝতে পেরেছেন তাঁর কৃপায়। মানুষ-শরীর নিয়ে মানুষ-ভগবানের সহিত বাস করা, ভাল বাসা, মানুষের মত মান অভিমান করা, এটা একটা উচ্চ ভাব। মানুষ যে ভাব নিয়ে সংসারে থাকে সেই ভাব নিয়ে—মানুষ-শরীরধারী ভগবানের সঙ্গে থাকা। এই জন্য ব্রহ্মা বৃন্দাবনে ব্রজবাসী হয়ে থাকতে ইচ্ছা করেছিলেন। অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের অবতার হয়ে ভক্তসঙ্গে প্রেমাস্বাদ, এ-ও একটা ভাব।

শ্রীম (সকলের প্রতি, লক্ষ্য কুমার ব্রহ্মচারীগণ)—যারা বিয়ে করে নাই তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। এই মহাপুরুষ রয়েছেন। বেশী বুদ্ধি যারা খরচ করবে তারা ঠকে যাবে। এখনই দীক্ষা নেওয়া উচিত। এই জন্মোৎসব তিথি চলে গেল। প্রথমে দীক্ষা নিলে একটা link (সংযোগ) হল। তারপর ব্রহ্মচর্য কেরমে (ক্রমে) চাইবার একটা claim (অধিকার) হলো।

২

শ্রীম ইচ্ছা করেন অন্তেবাসী, বিনয় প্রভৃতি ব্রহ্মচারীগণ এখন বেলুড় মঠে গিয়া বরাবর থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছা শ্রীমর কাছে থাকা যাবৎ তাঁহার শরীর আছে। তাঁহারা সব শ্রীমর আশ্রিত, শ্রীমর হাতে গড়া। তাই তাঁহারা নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন। শ্রীম কিছুই শুনিবেন না। তিনি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য সদা ভাবিত। তিনি তাঁহাদের ধর্মজীবনের ধ্যান জপ পাঠ, সেবা তপস্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নিজে কোনও দল করেন নাই। একই দল তিনি স্বীকার করেন—বেলুড় মঠের দল। বলেন, প্রথম প্রথম দলে থাকা ভাল, উন্নতি হয় শীঘ্র। তাই সেবকদের সকল আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন।

শ্রীম (সেবকদের প্রতি)—Excuse (ওজর) দেখালে কত আছে—'আমার অসুখ', 'বাড়ী দেখবে কে?' কত কি। কি বলে—He is never in want of an excuse (তার ওজরের অভাব নাই), whatever is the subject (যে কোন বিষয়ই হোক)।

ঠাকুর বলতেন কিনা, বাড়ীতে একটা লাঙ্গল আর হেলে গরু ক'টা আছে। এর নাম বাড়ী। খ্রীস্টানরা বলে, আর বাইবেলেও আছে, আমার নূতন পরিবার, কি করে তাকে ছেড়ে যাই (হাস্য)। কত কি ওজর আপত্তি।

অত দেখছে শুনছে তবুও চৈতন্য হচ্ছে না। এমনি সংস্কার! এখন যদি না হয় তবে বুঝতে হবে কর্ম বাকী আছে। আর কোন জন্মেও হবে না। কত আয়োজন এখন। অবতার এসেছেন যে এখন! দুধকে দই পেতে মাখন তুলে হাতে রেখে বলছেন, বাবা, এই নাও খাও। অত আদর অত অয়োজন। বাবুরা তবুও খেতে রাজী নন। এখনও তাঁর লীলা-সহচরগণ রয়েছেন। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর হবে না। বেশী বুদ্ধি খরচ করলে ঠকে যাবে।

হ্যাঁ, তাঁরা—মঠের লোক বলেন, তোমার অসুখ, এখন কি করে হয়। হলোই বা অসুখ। শরীর থাকলেই অসুখও আছে। আবার ভাল হয়ে যায়। মঠে মণীন্দ্রের সন্ন্যাস হলো। কয়দিন ধরে জ্বর। আবার পায়ে ঘা। তবুও সন্ন্যাস নিলে। নেবে না, চাইবে না! এমন দিন আর পাওয়া যায়? ওঁরা antecedent (সব সংবাদ) জানেন। তাই সন্ন্যাস চাইতেই দিয়ে দিলেন।

আর আগেই যদি বল (অসুখ), তাঁরাও বুঝবেন (ব্যাকুলতা নেই), বলবেন, হাঁ (অসুখ)। যদি বল, না, আমার চাই-ই। তখন তাঁরাও দিবেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, সামান্য একটা লাইন। এর এদিকে স্বর্গ। আর ঐদিকে নরক। একটু সামান্য line of demarcation (সীমান্ত রেখা)।

সেই লাইনটি কি? সেটি হচ্ছে ত্যাগ—renunciation, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। কামিনীকাঞ্চন ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান।

Vantage ground (সুবিধাজনক স্থান) ঐটে। ওখান থেকে পথ সোজা—straight road.

শ্রীম (ব্রহ্মচারীদের প্রতি, ইঙ্গিতে)—আর দেখছে চোখের সামনে যে, যারা ঘুরে ঘুরে বেড়াত, যাদের বাড়ীর লোক, দেশের লোক বলতো, কখনও কিছু হবে না, তারা সেই (মঠে) join (যোগদান) করেছে, অমনি একেবারে God (দেবতা)। সেই মানুষ আর নাই।

আর এ-ও দেখছে, বিয়ে করলে সংসারে কত কষ্ট। আমার এক একটা বিপদ হতো, ঠাকুর ওদের (নরেন্দ্রদের) দেখিয়ে বলতেন, এর কেন এই বিপদ হচ্ছে ? তোদের শিক্ষার জন্য। বলতেন, দেখ, সংসার কি ভীষণ স্থান! এর ভিতর থাকলে এ হবেই হবে—হাজার সেয়ানা হও তবুও। এমনি ভয়ানক স্থান এই সংসার। তাই বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল।

শ্রীম—কেহ কেহ বলে, ওখানে (মঠে) নানা রকমারী কাজ। তাতে সব সময় চলে যায়। সাধনভজন হয় না। নিজের অনুকুল কাজ পাওয়া যায় না। রিলিফ, হাসপাতাল, স্কুলকলেজ, খবরের কাগজ—এ সব কাজে মন চঞ্চল হয়।

তা' একটু কাজ করলেই বা। ঘরের ছেলে ঘরে তো যাবেই। না হয় একটু কাজ করলে। তা-ও আবার গুরুর আদেশে করা ঠাকুরের কাজ। তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় নিষ্কাম সেবায়। নিষ্কাম সেবা না করলে জ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীদের প্রতি)—এ-ও দেখছে, ও-ও দেখছে। তবুও নড়তে চায় না। ঠকে যাবে। বলে, কাক বড় শ্যায়না। কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে।

(ক্ষণকাল চিন্তার পর) সংসারীদের problem (সমস্যা) শক্ত হলেই বা। তাই তো অবতার। এই মাত্র এসেছেন ঠাকুর। সংসারী ভক্তদের জন্যই ভাবনা তাঁর বেশী। তারা বড় জড়িয়ে পড়ে—complicated case (জটিল অবস্থা)। এখন অবতার এসেছেন। ভাবনা কি ?

বড় জিতেন (সহাস্যে)—ভাই সব সাবধান। ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত)—ঠাকুর কৃষ্ণধনকে এক ধমক দিছলেন। বলেছিলেন, তোমার এ কথাতেও রহস্য ? Life and death-এর (জীবন মৃত্যুর) question (প্রশ্ন)। Solemn moment of life (জীবনের অতি গম্ভীর সময়)। এখনও রহস্য। একেবারে এক ধমকে ঠাণ্ডা !

সভাশুদ্ধ সকলে নীরব। ধমক খাইয়া ভক্তগণ নিজ নিজ মনের ভিতর নামিয়া নিজেদের দুরবস্থা দেখিতেছেন। আর তাই নির্বাক, চিন্তামগ্ন।

শ্রীম আহার করিতে তিন তলায় নামিয়া গেলেন। আজ আর অন্য দিনের মত কথামৃত বা ভাগবতপাঠে ভক্তদের নিরত করিলেন না। সদ্যপ্রাপ্ত তাঁহার কথামৃতের প্রতিক্রিয়ায় সকলেরই মন পূর্ণ।

পনর মিনিটের মধ্যে শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন। এখন সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। বাহিরে ঠাণ্ডা।

মোটা সুধীর প্রতি বুধবারে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় যোগদান করেন। এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আদি সমাজে ঠাকুর গিয়াছিলেন, তাই উহা শ্রীমর নিকট পবিত্র। ওখানকার বৈদিক সুরে বেদপাঠ শ্রীমর প্রিয়। আবার বেদের ভাঙ্গা গানগুলিও শ্রীমর মন হরণ করে। তাই আদি সমাজের কথা শুনিতে ভালবাসেন।

সুধীর—আজ আমাকে আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা ঠাকুরের ছবি পূজো করেন কেন ?

শ্রীম (সহাস্যে)—হাঁ, তাঁরা অবতার মানেন না। তাই একথা জিজ্ঞাসা করলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, কুল খেতে গেলে, কাঁটাও আছে। বেদপাঠ ও বেদগান শুনে চলে আসা। তুমি লেকচার দিলেও শুনবে না। চলে আসা।

কাশীপুর উদ্যানে ডাক্তারবাবু লেকচার দিতে গিছলেন। উল্টো উৎপত্তি হল।*

---

*কাশীপুর উদ্যানে তখন আরমেনিয়ান্ খ্রীস্টান পরিবার বাস করিতেন। ডাক্তার কার্তিক বক্সীর রোগী তাঁহারা। তাঁহাদের বলিয়া ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি রাখাইয়াছিলেন। পাদ্রী আসিয়া বাহির করিয়া দেন।

সংস্কার, বিশ্বাস, customs (আচার ব্যবহার)—এসব বদলাতে অবতারকে আসতে হয়। অদ্বৈত ডেকেছিলেন, প্রভো তুমি এস। তাই চৈতন্যদেব এলেন। পরে বলতেন ভাবে, এক এক বার, তুই তো আমায় ডেকে এনেছিস। কারো যদি ইচ্ছা হয় এসব বদলাতে, তা' হলে তাঁকে ডাকুক।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় পূর্বকথিত ত্যাগ বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—From the sublime to the ludicrous (শ্রেষ্ঠ থেকে নিকৃষ্ট)—এসব আমাদের rhetoric-এ (অলংকার শাস্ত্রে) বলে pathos। গৃহস্থগুলো কি নিয়ে রয়েছে? তাঁকে ভুলে বিষয়ভোগে মগ্ন। এর মধ্যে কেউ কেউ সব করছে, তার মধ্যে একটু ফাঁক করে তাঁকে ডাকে। আহার, বিবাহ, দেহসুখ, পুরোপুরি চলেছে। খেতে বসে বলছে, এ লিয়াও, ও লিয়াও। এটা রাঁধলে না কেন? ওটা রাঁধলে না কেন? আবার সকাল বিকাল constitutional walk (স্বাস্থ্যপ্রদ আমিরী ভ্রমণ), আবার বিকালে পান চিবুতে চিবুতে ছড়ি নিয়ে হাওয়া খাওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে একটু চোখ বোঁজা।

আর ওরা, মনে কর সাধুরা, সব ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন রাত তাঁকে ডাকছে, যেমন শোকার্ত মা। পুত্র মরে গেছে। তার আর কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। তেমনি, তাঁকে না পেলে স্বস্তি নাই। এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে—তীর্থে তীর্থে খুঁজছে। হিমালয়ে গভীর অরণ্যে বসে কাঁদছে তাঁর জন্য। বিদ্যা বুদ্ধি মান সব ছিল, সব ছেড়ে দিয়েছে তাঁর জন্য। কি না ছিল, কিন্তু সব ছেড়েছে তাঁর জন্য। চাতকের মত কেবল ফটিক জল চাইছে। ভোগ নেবে না। গৃহস্থরা যার পেছনে পেছনে ছুটছে, এরা এসব কাকবিষ্ঠার মত ছেড়ে দিয়েছে। এরা wholetime man (জীবনব্রতী)। আর গৃহস্থরা part-time man (সাময়িক ব্রতী)।

কোথায় যাবে কোথায় থাকবে তার ঠিক নাই। রোগে কে

দেখবে তার ঠিক নাই। সাধুদের ঔষধ গঙ্গাজল, আর ডাক্তার স্বয়ং ভগবান। 'ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্যঃ নারায়ণঃ হরিঃ।' কি ব্যাকুল ভগবানের জন্য! Religion in seriousness (তীব্র ব্যাকুলতাময় ধর্ম)! Religion in practice (হাতে নাতে ধর্ম)! তার জন্যই তো কেউ কেউ অত ভাবছে। সব ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াতে 'কিন্তু' করছে। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, যে তাঁর জন্য এক পা এগুবে তিনি হাজার পা এগিয়ে এসে নিয়ে যাবেন। 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।' অমৃতত্ব লাভ হয়, কামিনীকাঞ্চন ছাড়লে। ভয় কি, এগিয়ে চল। তিনি অপেক্ষা করছেন। হাত ধরে তুলে নেবেন।

যতক্ষণ না আশ্রিত ব্রহ্মচারিগণ সর্বস্বত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন আনুষ্ঠানিকভাবে, ততক্ষণ শ্রীম নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তেমনি, গৃহস্থ ভক্তগণ যতক্ষণ না দাসীবৎ সংসারধর্ম পালন করিতেছেন ততক্ষণ শ্রীম চিন্তাশূন্য হইতে পারেন না। কেন এই মহাপুরুষের এই ভাবনা? ইহাই কি অহেতুকী কৃপা?

যে ভগবান জীবকে মায়াতে বদ্ধ করেন তাঁর জগৎলীলার জন্য, তিনি আবার কতকগুলিকে মুক্তির সন্ধান বলিয়া দেন, মুক্ত করেন। অমৃতত্বস্বরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া অকাতরে অমৃতত্ব বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিহ্নিত সন্তান শ্রীমও অকারণে জীবগণকে অমৃতত্ব বিলাইয়া দিতেছেন অত ব্যাকুল হইয়া। অশান্ত জগতে কতকগুলিকে শান্তির দৌত্যকার্যে ব্রতী করিয়াছেন। তাই বুঝি শ্রীমর ভক্তদের জন্য অত ভাবনা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ।
৫ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল। বুধবার, অশ্বিনী নক্ষত্র, শুক্লা পঞ্চমী ১৭ দণ্ড। ৩৩ পল।

6.7 Hex/৫

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' 'মাষ্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্তা—যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে—লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা, এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা, ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীমর অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলেন,—একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।···এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন—শ্রীমর লেখা যেন সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন—কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবন-চরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী—কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে, আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর—'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' 'শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।'

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীমর সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধুভক্তদের সঙ্গে শ্রীমর যে সব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কি ভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পনর ভাগে লিখিত। এই কার্য বিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রম ও তপস্যার ফল—হিমালয়ে ঋষিকেশে গঙ্গাতীরে।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয়-বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

বেদান্তকেশরী (মাদ্রাজ)—শ্রীম-দর্শন কথামৃতেরই উত্তর প্রবাহ।

প্রবুদ্ধ ভারত—শ্রীম-দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—ঈশ্বরান্বেষী শ্রীম-দর্শন পড়িয়া আনন্দে আত্মহারা হইবেন।

বিশ্ববাণী—রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনা-মাধুর্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

বিশ্বজ্যোতি (পাঞ্জাব)—শ্রীম-দর্শন কথামৃতেরই পরিপূরক।

ভবন জারনেল (বম্বে)—প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা—শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের…জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।